বাংলাদেশে রাজনীতি ও ধর্ম (১৯৭১-২০০৮) : একটি বিশ্লেষণ
[Politics and Religion in Bangladesh (1971-2008) : An Analysis]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক

এস. এম. মফিজুর রহমান

সহযোগী অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মো. আখতারুজ্জামান

অধ্যাপক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জানুয়ারি-২০১৯

বাংলাদেশে রাজনীতি ও ধর্ম (১৯৭১-২০০৮) : একটি বিশ্লেষণ
[Politics and Religion in Bangladesh (1971-2008) : An Analysis]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গবেষক
এস. এম. মফিজুর রহমান
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ : ১১৫/২০০৮-২০০৯
পুনঃরেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ : ৮৩/২০১৪-২০১৫
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. মো. আখতারুজ্জামান
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জানুয়ারি-২০১৯

ঘোষণাপত্র

আমি এস. এম. মফিজুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের **পিএইচ ডি** ডিগ্রির জন্য জমাদানকৃত *বাংলাদেশের রাজনীতি ও ধর্ম (১৯৭১-২০০৮) : একটি বিশ্লেষণ* শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এ অভিসন্দর্ভ বা অভিসন্দর্ভের কোন অংশ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে **পিএইচ ডি** ডিগ্রি বা প্রকাশের জন্য জমা প্রদান করিনি। আমার জানা মতে এ শিরোনামে ইতোপূর্বে অন্য কোথাও পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

আমি আরো ঘোষণা করছি যে, কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীকে হেয় প্রতিপন্ন করা বা অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করিনি। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার প্রসঙ্গটি অনুধাবনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এ অভিসন্দর্ভটি রচিত হয়েছে।

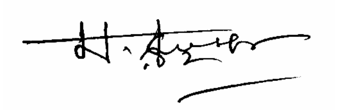

এস. এম. মফিজুর রহমান
রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ : ১১৫/২০০৮-২০০৯
পুনঃরেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ : ৮৩/২০১৪-২০১৫
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	i-ii
ভূমিকা	১-১৩
প্রথম অধ্যায়	১৪-৫৭
স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহ : চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি	
দ্বিতীয় অধ্যায়	৫৮-১০৮
মহান মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের ভূমিকা	
তৃতীয় অধ্যায়	১০৯-১৪২
স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল এবং জোট : উত্থান ও বিকাশ	
চতুর্থ অধ্যায়	১৪৩-১৭৪
বাংলাদেশে সামরিক শাসন ও রাজনীতি : প্রসঙ্গ ধর্মের ব্যবহার	
পঞ্চম অধ্যায়	১৭৫-২০৯
বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ধর্ম ব্যবহারের পদ্ধতি ও কৌশল	
ষষ্ঠ অধ্যায়	২১০-২৫৫
বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রপন্থী রাজনৈতিক শক্তির উত্থান	
উপসংহার	২৫৬-২৬৫
পরিশিষ্ট	২৬৬-২৯৩
গ্রন্থপঞ্জি	২৯৪-৩০৩

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার **পিএইচ ডি** অভিসন্দর্ভের শিরোনাম *বাংলাদেশের রাজনীতি ও ধর্ম (১৯৭১-২০০৮) : একটি বিশ্লেষণ*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান মাননীয় উপাচার্য, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের স্বনামধন্য অধ্যাপক, উপমহাদেশের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের তত্ত্বাবধানে আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করেছি। অভিসন্দর্ভটির সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে তাঁর সুচিন্তিত পরামর্শ ও নির্দেশনা আমার গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে সার্বিকভাবে সহায়তা করেছে। এছাড়া তিনি আমাকে আন্তরিক অনুপ্রেরণা ও সস্নেহ উপদেশ দিয়ে আমার কাজকে সর্বদা গতিশীল রেখেছেন। এজন্য আমি তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বহু ব্যস্ততার মাঝেও অধ্যাপক ড. আখতারুজ্জামান স্যার আমাকে অনেক সময় দিয়েছেন। এটিও আমার জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি। এজন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী। তাঁর নিকট থেকে আমার যে শিক্ষা লাভ সেটি ভবিষ্যতে আমার চলার পাথেয় হয়ে থাকবে।

গবেষণাকালে নানা পর্যায়ে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন জাতীয় অধ্যাপক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিরেটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শান্তনু মজুমদার, বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম। তাঁদের সবার পরামর্শ ও অন্যান্য সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। বিশেষ করে অধ্যাপক ড. শান্তনু মজুমদারের পরামর্শ ও আন্তরিক সহযোগিতায় আমি বেশ উপকৃত হয়েছি। এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে তিনি আমাকে বিভিন্ন তথ্যের সন্ধান ও অনুপ্রেরণা দিয়ে সহায়তা করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের **পিএইচ ডি** গবেষণার নীতিমালা অনুযায়ী আমি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের একাডেমিক কমিটির সভায় “বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহারের পদ্ধতি, কৌশল ও যথার্থতা বিচার” এবং “বাংলাদেশে সামরিক সরকার ও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার” শীর্ষক দুটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছি। উপস্থাপিত উক্ত দুটি প্রবন্ধের উপর গুরুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক পরামর্শ প্রদান করেছেন আমার শিক্ষকমণ্ডলি ও প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ। তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

গবেষণাকর্মটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে গিয়ে আমি যেসকল প্রাজ্ঞ লেখক ও গবেষকের লেখালেখি ব্যবহার করেছি তাঁদের প্রতি আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা।

গবেষণাকর্মটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে গিয়ে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, জাতীয় গণগ্রন্থগার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি বিশেষভাবে ব্যবহার করেছি। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ ও ইতিহাস বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল লাইব্রেরি এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভস লাইব্রেরিতে আমি কাজ করেছি। দেশের বাইরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতাস্থ ন্যাশনাল লাইব্রেরি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি থেকেও তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। এসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এ প্রসঙ্গে আমি আরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার বিভাগের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে। তারা আমাকে নানাসময়ে নানাভাবে সহায়তা করেছেন।

বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার সহধর্মিনী মোছা: শামছুন্নাহার বেগমকে। সময় সাপেক্ষে এ কাজে তিনি আমাকে নানাভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন ও পড়াশোনার সময়-সুযোগ করে দিয়েছেন। গবেষণা কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য আমার একমাত্র পুত্র এস. এম. সাইফুল্লাহ অনেক সময় আমার সাহচার্য লাভ করতে পারেনি। তার জন্য আমার অনেক ভালোবাসা।

অভিসন্দর্ভটি কম্পিউটার কম্পোজ করে আমাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন ঘাসফুল কম্পিউটার-এর স্বত্বাধিকারী জনাব সাহেব আলী। তাকেও আমি বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে আমার সকল গবেষণা-শুভানুধ্যায়ী ও অনুপ্রেরণা দানকারীদের ধন্যবাদ জানাই।

এস. এম. মফিজুর রহমান
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জানুয়ারি-২০১৯

১৫ জানুয়ারি ২০১৯

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক জনাব এস. এম. মফিজুর রহমান কর্তৃক **পিএইচ ডি** ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত ***বাংলাদেশে রাজনীতি ও ধর্ম (১৯৭১-২০০৮) : একটি বিশ্লেষণ*** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন করা হয়েছে। আমি অভিসন্দর্ভটি পাঠ করেছি। আমি মনে করি, এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। এতে ব্যবহৃত উৎসসমূহ নির্ভরযোগ্য। আমার জানা মতে এ অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন ডিগ্রি বা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করেননি।

পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা প্রদানের জন্য গবেষক জনাব এস. এম. মফিজুর রহমানকে অনুমতি প্রদান করা হলো।

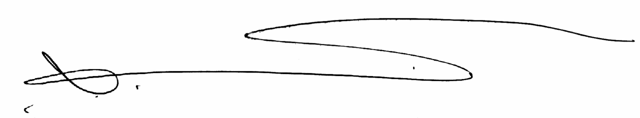

(অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান)

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

‘রাজনীতি’ ও ‘ধর্ম’ মানব সভ্যতার ইতিহাসে বহুল আলোচিত দু’টি বিষয়। আর এ বিষয় দু’টি সর্বদাই পাশাপাশি আলোচিত হয়ে আসছে। একটিকে পাশ কাটিয়ে আরেকটিকে আলোচনা করার যেন কোন উপায়ই নেই। ইতিহাস অধ্যয়ন করলে এ বিষয়টি সহজে বুঝা যায় যে, পৃথিবীর নানা দেশে নানা যুগে ধর্মপন্থী রাজনীতি এবং ধর্মনিরপেক্ষ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারা বহুকাল থেকেই চলে আসছে। তবে রাজনীতির ধারা দু’রকমের হলেও সবার ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্ম ব্যবহারের প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এ বিষয় দু’টির ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রয়েছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেও পূর্ববাংলায় ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড চালু ছিল। আবার ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ডেও ধর্মের প্রভাব ছিল। নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও চড়াই-উৎরাই এর মধ্য দিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭২ সালে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এ চারটি মূল বিষয়কে নির্ধারিত করে এদেশের সংবিধান রচিত হয়। এসময় ধর্মপন্থী দলগুলো পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক ও পশ্চাদমুখী দ্বি-জাতিতত্ত্ব পরিত্যাগ করে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ অবলম্বনে বাঙালিদের নতুন রাষ্ট্র নির্মাণের সংগ্রামে শামিল হতে ব্যর্থ হয়। উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে এ শক্তিটি ইসলাম ধর্ম রক্ষার ভ্রান্ত অজুহাত দেখিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়ে নিজ জনগণের বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, দেশে-বিদেশে তথ্যবিকৃতি ও মিথ্যাপ্রচারণাসহ নানাবিধ অপরাধমূলক তৎপরতায় জড়িত ছিল। এসব নেতিবাচক অভিজ্ঞতা বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ধর্মীয় সংগঠন নিষিদ্ধ করা হয়। সংবিধানে একই সাথে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য যে কোন ধর্ম গ্রহণ, পালন ও প্রসারের সুযোগ উন্মুক্ত থাকবে। সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্রে নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যেও আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক কতগুলো পরিবর্তন দৃষ্ট হতে শুরু করে। কিন্তু দ্বি-জাতিতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীতে উদার গণতান্ত্রিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের এ ধারাটি খুব বেশি দিন অব্যাহত থাকতে পারেনি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অভিযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, এ হত্যাকাণ্ডের পিছনে দেশি-বিদেশী বিভিন্ন শক্তি ও এজেন্ট নানাভাবে জড়িত ছিল। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হয় এবং দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়। প্রথম সামরিক

Dhaka University Institutional Repository

শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রবলভাবে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করেন। দ্বিতীয় সামরিক শাসক জেনারেল এইচ.এম. এরশাদ তার পূর্বসূরীর পদাঙ্কই অনুসরণ করেন। ১৯৭৬ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তিনি ক্ষমতায় এসেই রাজনীতিতে ধর্মের বৈধতা প্রদান করেন। এসময় ১৯৭২ সালের সংবিধানের 'ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক কোন সমিতি বা সংগঠন করার অধিকার কোন নাগরিকের থাকবে না' এ শর্তটি- পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে বিলুপ্ত করা হয়। এছাড়া ৫ম সংশোধনীতে সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম' সংযোজন করা হয়। ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বা ধর্মীয় রাজনীতির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। ক্রমান্বয়ে ধর্মকেন্দ্রিক তথা ধর্মপন্থী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পুনরুত্থান ঘটে এবং ধর্মপন্থী কিছু নতুন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। যেমন, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল), জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, মুসলিম লীগ (কাদের), মুসলিম লীগ (মতিন), মুসলিম লীগ (ইউসুফ), মুসলিম লীগ (জমির আলী), জাতীয় খেলাফত পার্টি, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (মুফতি আমিনী), বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (আজিজুল হক), বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন প্রভৃতি। ক্ষমতাসীনদের আনুকূল্যে এ দলগুলো প্রকাশ্যে তাদের নিজ মতাদর্শের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে থাকে। শুরু হয় রাজনীতির নতুন মেরুকরণ। মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম এবং ক্ষমতা ভাগাভাগির রাজনীতিতে অংশগ্রহণের ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রে ধর্মপন্থী দলগুলোর পরিচিতি ও গুরুত্ব বাড়তে থাকে। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, ধীরে ধীরে এ বিষয়গুলো বাংলাদেশের রাজনীতি ও জনগণের জীবনের সঙ্গে নানাভাবে জড়িয়ে পড়ে। ধর্মপন্থী রাজনীতি নিয়ে ২০০৮ সাল পর্যন্ত যেসকল ঘটনা ঘটে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ব্যাপক সংখ্যক ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের উত্থান, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি, সংখ্যালঘু নির্যাতন ও ক্ষেত্রবিশেষে তাদেরকে দেশত্যাগে বাধ্য করা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ধর্মের ব্যবহার, ধর্মীয় উগ্রবাদ তথা জঙ্গিবাদের উত্থান প্রভৃতি। এ বিষয়গুলো নিয়ে বর্তমানে নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্কও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি এ সম্পর্কে দিক-নির্দেশনামূলক বৃহৎ কোন গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। অথচ বিষয়টি উচ্চতর গবেষণার দাবি রাখে। এজন্য এ বিষয়টিকে আমি আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভ রচনার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছি।

বর্তমান গবেষণাকর্মের পরিধি ১৯৭১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। আমি এ কারণে উল্লিখিত সময়সীমাটি বেছে নিয়েছি যে, ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা লাভ করে। এটি হলো বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় অর্জন। স্বাধীন দেশে জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক নতুন জাগরণের সৃষ্টি হয়। এসময় থেকে নির্মাণ হতে থাকে বাঙালির নতুন ইতিহাস। অন্যদিকে ২০০৮ সালকে গবেষণার শেষ সীমারূপে চিহ্নিত করার কারণ হলো এ সময়কালের মধ্যে বাংলাদেশের ইতিহাসে ধর্মপন্থী রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি নিয়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। স্বাধীনতা থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সময়কালে ধর্মনিরপেক্ষতা ও ধর্মপন্থী রাজনীতির প্রবল সংঘাতে সময়ে সময়ে বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ পরিবর্তনগুলো অনুধাবনের জন্য উক্ত সময়কালের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ বিশেষভাবে জরুরি। আর ২০০৮ সাল আরেক দিক থেকে প্রণিধানযোগ্য, সেটি হলো এ বছরের শেষলগ্নে ২৯ ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদানকারী প্রধান রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৬২টি আসনে জয়লাভ করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর এটি এ দেশের ইতিহাসে নজীরবিহীন ঘটনা। আর এর মাধ্যমে অবসান ঘটে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দীর্ঘ দু'বছরব্যাপী অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার, মুক্তি ঘটে প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার। ২০০৮ সালের নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি ও জন-জীবনে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। সমাজে অনেক নতুন আশাবাদ জাগ্রত হয়। এর মধ্যে সংবিধানের মূল চেতনায় ফিরে যাওয়া, যুদ্ধাপরাধের বিচার, ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধকরণ, জঙ্গিবাদ দমনে সুস্পষ্ট কঠোর ভূমিকা গ্রহণ অন্যতম। জনগণের এসকল আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপায়িত হলে ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও এর ফলাফল জাতির ইতিহাসে সবসময় বিশেষ দিকপরিবর্তনকারী ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ২০০৮ সাল আরো গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনেই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন আবশ্যক ছিল। এসময় নির্বাচন কমিশন 'জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের' সংশোধনীর মাধ্যমে ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রধান ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলটি (জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ) তাদের দলের নাম আংশিক পরিবর্তন করে (বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী) নতুন গঠনতন্ত্র নির্বাচন কমিশনে জমা প্রদান করে।

আমার বর্তমান গবেষণা কর্মের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো কোন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছিল, সে সম্পর্কে জানা এবং

Dhaka University Institutional Repository

তাদের কর্মপরিধি অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করা। সামরিক শাসনামলে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের সরূপ অনুসন্ধান করা, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের ফলে নতুন যে রাজনৈতিক মেরুকরণ হয় সে বিষয়ে তথ্য উদ্ঘাটন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ধর্ম ব্যবহারের পদ্ধতি, কৌশল ও যথার্থতা যাচাই করা, পাশাপাশি বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রপন্থী রাজনৈতিক শক্তি তথা জঙ্গিবাদের উত্থান ও বিকাশ সম্পর্কে জানা, সেগুলোর নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা। এছাড়া ১৯৭১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সময়কালের রাজনীতি ও ধর্ম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়াধির বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ একটি বিশ্লেষণ করাও আমার গবেষণাকর্মের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের রাজনীতি ও ধর্ম বিষয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন রচনাবলি ও অন্যান্য উৎসসমূহ অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ১৯৭১ সাল থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের 'রাজনীতি ও ধর্ম' বিষয়ে সমন্বিত আলোচনা কোন একক গবেষণাকর্মে সম্পাদিত হয়নি। তাই আমি মনে করি যে, বাংলাদেশের রাজনীতি ও ধর্ম বিষয়ে দেশে-বিদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন বই, পত্র-পত্রিকা, সরকারি-বেসরকারি সংস্থার রিপোর্ট এবং অন্যান্য তথ্য উদ্ঘাটন ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এ বিষয়ে একটি বৃহৎ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ও সুযোগ রয়েছে।

উল্লিখিত বিষয়ে ইতোমধ্যে ইংরেজি ভাষায় যেসকল উল্লেখযোগ্য গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে সেগুলোর বিষয়বস্তু নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

Rounaq Jahan-এর *Bangladesh Politics : Problems and Issues* (1980) গ্রন্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, ১৯৭২ সালে নতুন সরকার গঠন, বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন, বঙ্গবন্ধুর সরকার পরিচালনা, ১৯৭৩ সালের নির্বাচন, '৭৫ সালের সামরিক ক্যু, জিয়াউর রহমানের শাসনামল, সংবিধান সংশোধন, নতুন দল সৃষ্টি, রাজনীতির বিভিন্ন মেরুকরণ, ১৯৭৯ সালের নির্বাচন ও প্রশাসনিক বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

Rafiuddin Ahmed (ed.)-এর *Religion, Nationalism and Politics in Bangladesh* (1990) গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় হলোঃ বাংলাদেশের ধর্ম, ভাষা ও জাতীয়তাবাদের ইতিহাস, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষ ধারা ও ইসলামি ধারা, জামায়াতে ইসলামীর ধর্মের রাজনীতি, নির্বাচনী রাজনীতি, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ইসলামি মৌলবাদ প্রভৃতি।

David Abecasis- এর *Identity, Islam and Human Development in Rural Bangladesh* (1990) গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের পরিচিতি, গ্রামীণ জন-জীবনে ইসলাম ধর্মের প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Talukder Maniruzzaman-এর *Radical Politics And The Emergence of Bangladesh* (2003) গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপঃ স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পরিচয় ও কর্মকাণ্ড, ৬ দফা, ১১ দফা, '৭০-এর নির্বাচন, স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা প্রভৃতি।

Mufleh R Osmany & Mohammad Humayun Kabir (ed.) -এর *Global War on Terror : Bangladesh Perspective* (2007) গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়গুলো হলো : বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, মডারেট মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের পরিচিতি সন্ধান, বাংলাদেশে উগ্রবাদী গোষ্ঠীর কার্যক্রমের বর্ণনা, মাদ্রাসা শিক্ষা প্রভৃতি।

Shamsul I. Khan, S. Aminul Islam, M. Imdadul Haque-এর *Political Culture, Political Parties and the Democratic Transition in Bangladesh* (2008) গ্রন্থটিতে স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলসমূহের পরিচয় ও কর্মসূচি, ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর পরিচয়, কর্মসূচি, দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি, বিভিন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন, বিশেষত ১৯৯১ সালের নির্বাচন, দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

Imtiaz Ahmed (ed.)-এর *Terrorism in the 21st Century Perspective from Bangladesh* (2009) গ্রন্থটিতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে– বাঙালি-বাংলাদেশী পরিচিতি, '৭২ সালের সংবিধান, জিয়া ও এরশাদ আমলে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার সংক্রান্ত ঘটনাবলী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ধর্মকেন্দ্রিকতা, বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিবাদের উদ্ভব, জঙ্গি দলগুলোর পরিচয়, তাদের কর্মকাণ্ড প্রভৃতি।

Shantanu Majumder-এর *Secularism and the Awami League : A Study of the Main Liberal Political Party in Bangladesh* (2012) শীর্ষক অপ্রকাশিত পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভে

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার এবং এর ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত নানাবিধ বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Ali Riaz (ed.)- এর *Religion and Politics in South Asia* (2010) গ্রন্থে ধর্ম ও রাজনীতির বন্ধন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইসলামীকরণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

Ali Riaz-এর *Bangladesh A political History since Independence* (2016) গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ: স্বাধীনতা পূর্বকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, আওয়ামী লীগের ভূমিকা, '৭৫ পরবর্তী সময়ে সামরিক শাসন, ধর্মীয় রাজনীতির পুনরুত্থান, সংবিধান পরিবর্তন, ধর্মকেন্দ্রিক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের উদ্ভব, বিভিন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলসমূহের গৃহীত পদ্ধতি, বিভিন্ন নির্বাচনী জোট, অন্যান্য দলগুলোর ধর্মকেন্দ্রিকতা, বাম রাজনীতির দুর্বলতা, বিভিন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফল প্রভৃতি।

এছাড়াও বাংলা ভাষায় এ বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়েছে। নিম্নে সেগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

হাসান-উজ্জামান-এর *বাংলাদেশে ধর্ম ব্যবসার রাজনীতি : স্বরূপ উন্মোচন* (১৯৮৭) গ্রন্থটিতে বাংলাদেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা, '৭১ পরবর্তীতে জামায়াতে ইসলামীর অবস্থা, '৭৫ পরবর্তীতে জামায়াতে ইসলামী দলটির পুনরুত্থান, স্বাধীনতার পর ধর্ম ব্যবসায়ের রাজনীতির স্বরূপ, জেনারেল জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এইচ.এম. এরশাদের সামরিক সরকারের কর্মকাণ্ড প্রভৃতি বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বদরুদ্দীন উমর-এর *বাঙলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার* (১৯৮৯) গ্রন্থটির মূল আলোচ্য বিষয় হলো : মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, সামরিক শাসন ও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও রাষ্ট্রধর্ম, বিভিন্ন দলের ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বর্তমান সাম্প্রদায়িকতা, জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক তৎপরতা প্রভৃতি।

মুহাম্মদ আবদুল কাদির-এর *ধর্মের নামে রাজনীতি* (১৯৮৯) গ্রন্থে ধর্ম কী, ধর্মের উদ্দেশ্য, ধর্মের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক, ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক, মুসলমান হয়েও ইসলামি রাজনীতির বিরোধিতা, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও ইসলাম, রাজনীতিতে ধর্মের গুরুত্ব প্রভৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আলী রীয়াজ (সম্পাদিত)-এর *সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ* (১৯৯৫) গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হলো: মৌলবাদ, ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি, ফতোয়া, সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতির উত্থান ও পুনরুত্থানের কারণ, এসব থেকে মুক্তির উপায় প্রভৃতি।

আমজাদ হোসেন-এর *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল* (১৯৯৬) গ্রন্থে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর পরিচয়, কর্মসূচি, জোট গঠন, ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর পরিচয়, তাদের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি, বিভিন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

কঙ্কর সিংহ-এর *রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়* (১৯৯৯) গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় নিম্নরূপ: রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ধর্মনিরপেক্ষতা, জিয়া ও এরশাদ সরকারের সংবিধান সাম্প্রদায়িকীকরণ, ধর্মীয় উৎসব, সাম্প্রদায়িকতামুক্ত বাংলাদেশ প্রভৃতি।

শিউলী বেগম-এর *বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান : একটি পর্যালোচনা* (১৯৯৯) শীর্ষক অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভে সাম্প্রদায়িকতা কী, বাংলাদেশে সম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ, ধর্ম ও সম্প্রদায়ভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও জোটের পরিচয় ও তাদের কর্মকাণ্ড প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সা'দ উল্লাহ্-এর *ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা* (২০০০) গ্রন্থটিতে ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি, সংবিধান সংশোধন, রাষ্ট্রধর্ম, জঙ্গিবাদ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে বিশেষ করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে জেনারেল জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এইচ.এম. এরশাদের ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতির বিষয়গুলো।

বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর-এর *বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদ ও মৌলবাদ* (২০০০) শীর্ষক গ্রন্থে বাংলাদেশের সিভিল সমাজ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি, জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, মৌলবাদের স্বরূপ, মৌলবাদী সমাজ ও রাষ্ট্রের অবস্থা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

রানা দাশ গুপ্ত (নির্বাহী সম্পাদক)-এর *নির্যাতিত সংখ্যালঘু বিপন্ন জাতি* (২০০২) গ্রন্থে ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর বিশেষত হিন্দু সম্প্রদায়ের জনগণের উপর নির্মম অত্যাচার- নির্যাতনের বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন-*এর বাংলাদেশের রাজনীতি* (২০০৩) গ্রন্থে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতি, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল, ১৯৯৬ সালে জাতীয় নির্বাচন, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

শাহেদ ইকবাল মো. মাহবুব-উর-রহমান-এর *বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি : সমস্যা ও সম্ভাবনা* (২০০৫) শীর্ষক অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভের আলোচিত বিষয়গুলো হলোঃ বাংলাদেশের ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর পরিচিতি, উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি, বাংলাদেশের সংবিধান ও ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি, ধর্মপন্থী রাজনীতির বিকাশ, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবাদ, বিভিন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও ধর্মপন্থী দলগুলোর অবস্থান, বাংলাদেশে ধর্মপন্থী রাজনীতির সম্ভাবনা প্রভৃতি।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন-*এর বাংলাদেশ রাষ্ট্র, রাজনীতি, গণতন্ত্র ও সুশাসন* (২০০৬) গ্রন্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা, মুক্তিযুদ্ধ, ’৭৫ পরবর্তী রাজনীতি, ধর্মভিত্তিক রাজনীতির স্বরূপ, জঙ্গিবাদ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

কবীর চৌধুরী-এর *বাংলাদেশে মৌলবাদ এবং আমাদের আকাঙ্ক্ষিত সমাজ* (২০০৮) গ্রন্থে মৌলবাদ, বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে ও ধর্মে মৌলবাদের উত্থান ও স্বরূপ, ’৭৫ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে ইসলামি মৌলবাদের উত্থান ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (সম্পাদিত)-এর *বাংলাদেশের রাজনীতি: যুদ্ধাপরাধী জামায়াত এবং জঙ্গি প্রসঙ্গ প্রথম খণ্ড* (২০০৮) এবং *দ্বিতীয় খণ্ড* (২০০৯) গ্রন্থ দু’টিতে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ ও যুদ্ধাপরাধের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রন্থ দু’টি মূলত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিদগ্ধ পণ্ডিতজনের বিভিন্ন লেখনীর সমন্বয়ে সংকলিত।

নূহ-উল-আলম লেনিন-এর *নির্বাচিত প্রবন্ধ* (২০০৯) গ্রন্থটিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের উত্থানের প্রেক্ষাপট, জঙ্গিবাদ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

মো. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী-এর *বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির তিন দশক (১৯৭১-২০০০)* (২০১৪) গ্রন্থে বাংলাদেশের ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। বিশেষ করে তার আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে ধর্মপন্থী দলগুলোর পরিচয়, গঠনতন্ত্র, উদ্দেশ্য, কর্মসূচি, বিভিন্ন জোট গঠন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনসমূহে অংশগ্রহণ প্রভৃতি বিষয়।

Dhaka University Institutional Repository

আনিসুজ্জামান-এর *আত্মপরিচয় ভাষা-আন্দোলন স্বাধীনতা* (২০১৫) গ্রন্থটিতে বাঙালি সংস্কৃতি, ভাষা আন্দোলন, মুক্তিসংগ্রাম, সংবিধান, ধর্ম-রাজনীতি ও রাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

আবুল বারকাত-এর *বাংলাদেশে মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির* (২০১৮) গ্রন্থটিতে ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ প্রভৃতি উদ্ভবের কারণ, এসবের অর্থনৈতিক উৎস ও ভিত্তি, মাদ্রাসা শিক্ষা, জঙ্গিবাদী সংগঠনগুলোর পরিচয় ও তাদের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের বিবরণ প্রভৃতি বিষয় স্থান পেয়েছে।

উল্লিখিত রচনাবলি অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এসব রচনার মূল বিষয়বস্তু হলো: বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল, গণতন্ত্র, সামরিক শাসন, ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি, রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা, নির্বাচন, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ প্রভৃতি।

উপরিউক্ত গবেষণাকর্মগুলোর ধারাবাহিকতাতেই বর্তমান গবেষণাকর্মটিতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের প্রসঙ্গটিকে বিচার-বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণাকর্মটি সম্পাদনে সমসাময়িককালে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, নিবন্ধ/প্রবন্ধ, জার্নাল, দেশি-বিদেশী বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার রিপোর্ট এবং প্রতিবেদন প্রভৃতি প্রাথমিক উৎস (Primary Source) হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আর এসকল উৎসের সাহায্য নিয়ে যারা পরবর্তীতে গবেষণামূলক লেখালেখি করেছেন দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Source) হিসেবে তাদের সে লেখাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার প্রসঙ্গটি যথাযথভাবে অনুধাবনের জন্য বাংলাদেশের প্রথিতযশা বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং ধর্ম ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের সঙ্গে এ বিষয়ে অনানুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা করেছি।

আমার এ গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে যেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, জাতীয় গণগ্রন্থাগার, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভস্ লাইব্রেরি, ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমি লাইব্রেরি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি বিশেষভাবে ব্যবহার করেছি। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি, ইতিহাস বিভাগের সেমিনার লাইব্রেরি ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল লাইব্রেরি থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। দেশের বাইরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতাস্থ ন্যাশনাল লাইব্রেরি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি থেকেও

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন গবেষণাভিত্তিক এবং তথ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

'বাংলাদেশে রাজনীতি ও ধর্ম (১৯৭১-২০০৮) : একটি বিশ্লেষণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটিতে রাজনীতি ও ধর্ম সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়গুলোকে মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছয়টি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত রূপ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলোঃ

প্রথম অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলোঃ **'স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহ : চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি'**। এখানে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পূর্বকালীন সময় থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যেসকল দল পূর্ববাংলায় (পরবর্তীতে বাংলাদেশ) তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছিল সেসব দলের পরিচয়, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- মুসলিম লীগ, মুসলিম লীগের উপদল কনভেনশন মুসলিম লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও কাইয়ুম মুসলিম লীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ (পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর), পূর্ববাংলা সাম্যবাদী দল (হক-তোয়াহা), ইস্ট পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মতিন-আলাউদ্দিন), কমিউনিস্ট পার্টি (মনি সিং), কৃষক-প্রজা পার্টি, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, গণতন্ত্রী পার্টি ও যুবলীগ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হলোঃ **'মহান মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের ভূমিকা'**। এ অধ্যায়টি দু'টি অংশে বিভক্ত। এ অধ্যায়ের প্রথম অংশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা এবং দ্বিতীয় অংশে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম অংশে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষের রাজনৈতিক দলসমূহের ভূমিকা বিশেষত পূর্ববাংলার প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের ভূমিকা, বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ, ২৫ মার্চের গণহত্যা, ২৬ মার্চে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা, বিপ্লবী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠন, ৯ মাসের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি এবং ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ধর্মপন্থী দল, যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল এবং যুদ্ধকালীন সময়ে হত্যা, ধর্ষণ, জোরপূর্বক

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মান্তরকরণ, লুটতরাজ প্রভৃতি মানবতা যেসকল অপরাধ সংঘটিত করেছিল সেগুলোর বিবরণ দেয়া হয়েছে।

আর দ্বিতীয় অংশে আলোচনা করা হয়েছে তৎকালীন পূর্ববাংলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের কার্যাবলি নিয়ে। এ অংশে মুসলিম সাহিত্য সমাজ, প্রগতি লেখক সংঘ, সংস্কৃতি সংসদ, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, ধূমকেতু শিল্পী সংঘ, ছায়ানট, উদীচী প্রভৃতি সংগঠনের নানামুখী কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। সর্বোপরি ভাষা আন্দোলন সম্পর্কেও এখানে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। সাংস্কৃতিক কর্মীরা তাদের গান, নাটক, কবিতা প্রভৃতির মাধ্যমে কীভাবে প্রগতিশীলতা তথা রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির বাণী প্রচার করে বাংলার তরুণ সম্প্রদায়কে মুক্তির সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করেছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ অংশে দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের যোগসাজশ কীভাবে ঘটেছিল তা এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের শিরোনাম হলোঃ **‘স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল ও জোটের উত্থান ও বিকাশ’**। এ অধ্যায়ে আমি আলোচনা করেছি ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো কীভাবে **১৯৭৫** সালের পরবর্তী সময়ে পুনরুত্থানের সুযোগ পেল এবং কীভাবে বহুসংখ্যক নতুন ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল ও জোট গড়ে উঠলো, এসব দল ও জোটগুলোর পরিচয়, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচি, বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ, সফলতা, ব্যর্থতা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে।

‘বাংলাদেশে সামরিক শাসন ও রাজনীতি : প্রসঙ্গ ধর্মের ব্যবহার’ বিষয়টি হলো চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম। এ অধ্যায়ে স্বাধীন বাংলাদেশে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার পটভূমি, জেনারেল জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা গ্রহণ, সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী ও জিয়াউর রহমান কর্তৃক ধর্মভিত্তিক রাজনীতির দ্বার উন্মোচন করা, রাজনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে জিয়াউর রহমানের ধর্মনির্ভরতা, জাগ দল গঠন ও পরবর্তীতে বিএনপি (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) গঠন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর পরে আলোচনা করা হয়েছে সামরিক শাসক জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের ক্ষমতাগ্রহণ, ধর্মকেন্দ্রিক বিভিন্ন কর্মসূচিতে তার অংশগ্রহণ ও উদ্বুদ্ধকরণ, সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী ও ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা, জাতীয় পার্টি গঠন ও তার অন্যান্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে। সর্বশেষ

Dhaka University Institutional Repository

সামরিক শাসকদের ধর্মকেন্দ্রিক এ ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের শিরোনাম হলোঃ **'বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ধর্ম ব্যবহারের পদ্ধতি ও কৌশল'**। এ অধ্যায়ের আলোচনা আমার গবেষণাকর্মের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ অধ্যায়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বিরোধী রাজনৈতিক দলসমূহ ও রাজনীতিতে নানামাত্রায় ধর্ম ব্যবহারকারী দলসমূহ। আর বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল যেমন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (বর্তমানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী) কীভাবে **১৯৭১** সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার করেছে এবং এর ফলাফল কী হয়েছে, সে বিষয়গুলো এ অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়াও এ অধ্যায়ে আরো আলোচনা করেছি বিভিন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে এ দলগুলো যে জোট গঠন করেছে তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, জোট গঠনে ধর্মকেন্দ্রিক রাজনৈতিক দলগুলোর গুরুত্ব, নির্বাচনের ফলাফল, জন-জীবনে এর প্রভাব প্রভৃতি বিষয়ে।

ষষ্ঠ এবং সর্বশেষ অধ্যায়ে আমি আলোচনা করেছি **'বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রপন্থী রাজনৈতিক শক্তির উত্থান'** সম্পর্কে। এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যয়ন। কারণ, বর্তমানে ধর্মীয় উগ্রবাদ তথা জঙ্গিবাদ সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি মারাত্মক সমস্যা। বাংলাদেশে কোন প্রেক্ষাপটে ধর্মীয় উগ্রবাদ তথা জঙ্গিবাদের উত্থান হলো, জঙ্গি সংগঠনগুলোর পরিচয়, তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী, তাদের কার্যক্রমের ধরন, তাদের অর্থের উৎস, বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, প্রধান প্রধান জঙ্গি সংগঠনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের বিবরণ, ধর্মীয় জঙ্গিবাদের আন্তর্জাতিক কারণ, জঙ্গিবাদের দেশি-বিদেশী পৃষ্ঠপোষক কারা, জঙ্গিবাদ দমনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকা প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ধর্মীয় জঙ্গিবাদ নিরসনের জন্য এ অধ্যায়ের শেষে একটি সুপারিশমালা প্রদান করেছি।

উপরিউক্ত অধ্যায়সমূহের বিষয়বস্তু আলোচনার পর সেগুলোর মূল বক্তব্য বিশ্লেষণ করে উপসংহারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এরপর সংযোজন করা হয়েছে নয়টি পরিশিষ্ট। সর্বশেষ এ অভিসন্দর্ভটি রচনায় ব্যবহৃত গ্রন্থপঞ্জি ও অন্যান্য উৎসের একটি তালিকা সংযোজন করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য গবেষণাকর্মটি অধ্যয়ন করে ইতিহাস অনুসন্ধানী ব্যক্তিবর্গ, রাজনীতিবিদগণ ও সাধারণ পাঠকগণ বাংলাদেশে ধর্মপন্থী রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ও বিকাশ, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও এর ফলাফল, উগ্রপন্থী ধর্মীয় রাজনীতি তথা জঙ্গিবাদের উত্থান ও এর সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য প্রভৃতি বিষয়ে একটি নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস অতি সহজেই জানতে পারবেন। সর্বোপরি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের রাজনীতি ও ধর্মের সম্পর্ক, আবশ্যকতা ও যৌক্তিকতা নির্ধারণ করতে এ গবেষণাটিকর্মটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।

বর্তমান গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে যেয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি ও ধর্ম বিষয়ে যেসকল তথ্য-উপাত্ত পেয়েছি, তাতে রাজনীতি ও ধর্ম বিষয়ের বহুবিধ দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কিন্তু আমি মূলত ১৯৭১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সময়সীমায় বাংলাদেশে ধর্মপন্থী রাজনীতির উত্থান, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার, রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারকারী ও ব্যবহারের ধরণ, ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর জোট গঠন, নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলের গুরুত্ব, রাজনীতিতে ধর্মপন্থী দলগুলোর সফলতা, ব্যর্থতা, এদেশে ধর্মীয় উগ্রপন্থী রাজনীতি তথা জঙ্গিবাদের উত্থানের প্রেক্ষাপট, জঙ্গিবাদী সংগঠনগুলোর পরিচয়, তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম এবং জঙ্গিবাদ নির্মূলের উপায় সম্পর্কিত বিষয়ে আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি। গবেষণাকর্মটি সম্পাদনকালে ধর্মীয় উগ্রপন্থী রাজনৈতিক শক্তি তথা জঙ্গিবাদ সম্পর্কে বহু তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে সেগুলোর সবকিছুর বিচার-বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়নি। উল্লেখ্য যে, আমি আমার আলোচনা ২০০৮ সাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রেখেছি। এ সময়কালের মধ্যে ধর্মীয় উগ্রপন্থী রাজনৈতিক সংগঠনগুলো যেসকল কর্মকাণ্ড সংঘটিত করেছে, আলোচ্য অভিসন্দর্ভে সেসকল বিষয়ের স্থান দিয়েছি। কিন্তু ২০০৮ সালের পর বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রপন্থী রাজনৈতিক শক্তি তথা জঙ্গিবাদ নতুন রূপে দেখা দিয়েছে। অপরদিকে ২০০৮ সালের পর বাংলাদেশে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হয়েছে, ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের দাবি উঠেছে। এ বিষয়গুলোর সঙ্গে আমার গবেষণাকর্মের ঐতিহাসিক যোগসূত্রতা রয়েছে। কিন্তু আলোচ্য গবেষণাকর্মের নির্ধারিত সময়সীমার বাইরে থাকার কারণে এ বিষয়গুলো সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করতে পারিনি। এটি আমার গবেষণাকর্মের সীমাবদ্ধতা। তবে যারা ভবিষ্যতে এ বিষয়ে গবেষণা করবেন তারা বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবেন।

প্রথম অধ্যায়

স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহ : চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি

বর্তমান অধ্যায়ে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পূর্ববর্তী সময়কাল থেকে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত পূর্ববাংলায় (বাংলাদেশে) যেসকল রাজনৈতিক দল তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে, সেসকল রাজনৈতিক দলের পরিচয়, চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পূর্ব থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যেসকল রাজনৈতিক দল পূর্ববাংলায় (বাংলাদেশে) তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- মুসলিম লীগ, মুসলিম লীগের উপদল কনভেনশন মুসলিম লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও কাইয়ুম মুসলিম লীগ, আওয়ামী মুসলীম লীগ (পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর), পূর্ববাংলা সাম্যবাদী দল (হক-তোয়াহা), ইস্ট পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মতিন-আলাউদ্দিন), কমিউনিস্ট পার্টি (মনি সিং), কৃষক-প্রজা পার্টি, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, গণতন্ত্রী পার্টি, যুবলীগ প্রভৃতি।[১] নিম্নে এ সকল রাজনৈতিক দলের চরিত্র, বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

মুসলিম লীগ

মুসলিম লীগ ভারতের মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন। ১৮৮৫ সালে বৃটিশ ভারতে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক সংগঠন 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিভিন্ন কারণে কংগ্রেসে মুসলমানদের স্বার্থ উপেক্ষিত হতে দেখা যায়। এজন্য মুসলমানদের বেশিরভাগ নেতৃবৃন্দই কংগ্রেসে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। মুসলমানরা তাদের নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দাবি-দাওয়া উপস্থাপনের জন্য ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগ নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম জনগণের সপক্ষে জনসমর্থন তৈরিতে এবং সবশেষে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ দলটি মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

ভারতবর্ষে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আগে মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। মুসলিম শাসকবর্গ বহিরাগত ছিলেন। তাই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা দেশীয় অভিজাত শ্রেণির সঙ্গে এক ধরনের সখ্যতা গড়ে তোলেন। দেশীয় এ হিন্দু অভিজাত শ্রেণির নিয়ন্ত্রণে ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক, জমিদারি প্রভৃতি। আর মুসলমানরা মূলত প্রশাসনের সার্বিক বিষয়

Dhaka University Institutional Repository

নিয়ন্ত্রণ করতেন। কিন্তু ভারতে যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল, তখন হিন্দুরা সে শাসন ব্যবস্থা মেনে নেন। তাদের অনেকেই কোম্পানির কর্মচারীদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে ধন-সম্পদের মালিক হন এবং ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনে জমিদারি ক্রয় করে সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করেন। এছাড়া হিন্দুরা ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করে সরকারি অফিস-আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। আর অন্যদিকে মুসলমান জনগণ সাধারণ কৃষক-প্রজা রয়ে যায়। মুসলিম অভিজাতবর্গ ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ইংরেজদেরকে অসহযোগিতা করার নীতি অনুসরণ করেন। ফলে শাসক শ্রেণি হিসেবে তারা যেসকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন তা থেকে বঞ্চিত হন। আর ধর্মীয় ভুল ব্যাখ্যা ও কুসংস্কারের কারণে মুসলমানরা ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করে মক্তব-মাদ্রাসা ভিত্তিক শিক্ষার মধ্যে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ রাখেন। ১৮৩৭ সালে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজিকে সরকারি ভাষা করা হলে মুসলমানরা চাকরি, প্রশাসন, শিক্ষা, সাহিত্য সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েন। ইংরেজি আইন ও বিচার ব্যবস্থা চালু হলে মুসলমান আইনজীবীরা অযোগ্য বলে বিবেচিত হন।[২] এভাবে মুসলমানরা শিক্ষা, চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে হিন্দুদের থেকে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে থাকেন।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে কয়েকজন মুসলিম মনীষী মুসলমানদেরকে এ দুরাবস্থা থেকে মুক্তির জন্য এগিয়ে আসেন। তারা মুসলমানদেরকে আধুনিক ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করেন। এদের মধ্যে নবাব আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমির আলী ও স্যার সৈয়দ আহমদ খানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নবাব আবদুল লতিফ মনে করতেন ইংরেজি শিক্ষা ছাড়া মুসলমানদের উন্নতি সম্ভব নয়। এ লক্ষ্যে তিনি ১৮৬৩ সালে কলকাতায় 'মোহামেডান লিটারারি সোসাইটি' নামে একটি সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এর উদ্দেশ্যে ছিল মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক জ্ঞান, চিন্তা ও রাজনীতি প্রচার করা। নবাব আবদুল লতিফের সহযোগী সৈয়দ আমির আলী ছিলেন মুসলিম আধুনিকতার প্রবক্তা। তিনি ১৮৭৭ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'সেন্ট্রাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি। তার উদ্দেশ্যে ছিল মুসলমানদেরকে আধুনিক যুগের দায়িত্বশীলতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।[৩] আর সৈয়দ আহম্মদ খান ছিলেন ভারতীয় মুসলিম সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ নেতা ও মুসলিম জনমনে সচেতনতা সৃষ্টির প্রধান উদ্যোক্তা। বৃটিশ সরকার ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের দায়ে মুসলমানদের দোষারোপ করলে তিনি ইংরেজ ও মুসলমানদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সচেষ্ট হন। তিনি মনে করেন বৃটিশ রাজের সঙ্গে সহযোগিতার মধ্য দিয়েই কেবল মুসলমানদের উন্নতি লাভ করা সম্ভব হবে। তিনি মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের জন্য ১৮৭৭ সালে

Dhaka University Institutional Repository

আলীগড়ে 'মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে তিনি যেসকল কাজ করেছেন এ কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা তার মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।[৪] মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইংরেজি শিক্ষা জনপ্রিয় করে গড়ে তোলার জন্য তিনি তার অনুসারীদের সর্বশক্তি নিয়োগের আদেশ দেন। এ উপলব্ধি ও অনুবর্তী সক্রিয়তা আলীগড় আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে। এছাড়া তিনি ১৮৮৮ সালে 'ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান প্রেট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। এ সংগঠনগুলো রাজনীতির চেয়েও সামাজিক পুনঃজাগরণমূলক কাজে ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা (বিশেষ করে ইংরেজি শিক্ষা) সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সচেতন করার ক্ষেত্রে অধিকতর সক্রিয় ছিল।[৫] সৈয়দ আহমদ খান ভারতের মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে বেশ সজাগ ছিলেন এবং মুসলমানদেরকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান না করার জন্য পরামর্শ দেন। ১৮৮৭ সালে লক্ষ্মৌতে এবং ১৮৮৮ সালে মিরাটে সৈয়দ আহমদ খান দু'টি ঐতিহাসিক বক্তৃতা প্রদান করেন। এ দু'টি বক্তৃতায় তিনি যুক্তি দেখান যে, মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ দেওয়া আত্মহত্যার সমান হবে।[৬] তার যুক্তি ছিল ভারতে মুসলমানরা সংখ্যালঘু এবং পশ্চাদপদ বিধায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে তাদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে না। তাদের উচিত সর্বাগ্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সামাজিক অগ্রগতি লাভ করা।[৭]

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, হিন্দুরা ইংরেজ শাসন মেনে নেন, ফলে ইংরেজরা হিন্দুদেরকেই পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করেন। ১৮৮৫ সালে ভারতে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও ইংরেজরা তাদেরকে সহযোগিতা প্রদান করেন। কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্রমবর্ধমান প্রত্যশা ও দাবি-দাওয়া বৃটিশ স্বার্থের প্রতি হুমকি স্বরূপ বিবেচিত হয়। ইংরেজ শাসকবর্গ তখন 'ভাগ কর' এবং 'শাসন কর' নীতি অবলম্বন করে হিন্দুদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার পরিবর্তে মুসলমানদের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতার নীতি গ্রহণ করে।[৮]

সিপাহী বিদ্রোহ এবং এর পরবর্তী পরিস্থিতিতে ১৮৬১ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে ভারতীয়দের সরকার পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখার জন্য বৃটিশ সরকার কর্তৃক সর্বপ্রথম পদক্ষেপ নেয়া হয়। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার অংশ হিসেবে পৌরসভা, জেলা বোর্ড, লোকাল বোর্ড ইত্যাদি প্রবর্তন করা হয়। ১৮৯২ সালের ভারত শাসন আইনে আইনসভার প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে আরো পরিবর্তন এনে তা সম্প্রসারিত করা হয়। কিন্তু এসকল সংস্থার প্রতিনিধি নির্বাচনে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায়

Dhaka University Institutional Repository

বৃটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি আরো বৃদ্ধির চিন্তা ভাবনা এবং ভারত সচিব জন মর্লির এ সংক্রান্ত ঘোষণা (১৯০৬ সালের ২০ জুলাই) মুসলমানদের মধ্যে ভীষণভাবে চিন্তার উদ্বেগ সৃষ্টি করে।[৯] আর ১৯০৫ সালে বৃটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের যে নীতি ঘোষণা করেন তাতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যাই থাকুক না কেন পাশাপাশি এতে বাংলা অঞ্চলের মুসলমানদের বিভিন্ন স্বার্থ সুরক্ষা ও উন্নতির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কংগ্রেস বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। সঙ্গত কারণেই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে মুসলমানরা তাদের স্বার্থ বিরোধী বলে মনে করেন।[১০]

এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি মুসলিম জনপ্রতিনিধি দল তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড মিন্টোর সঙ্গে সিমলায় সাক্ষাৎ করেন। তারা আইন পরিষদসহ বিভিন্ন সংস্থায় অধিকতর মুসলিম প্রতিনিধিত্ব এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি জানান। সিমলা ডেপুটেশনের সদস্যবৃন্দ লর্ড মিন্টোর নিকট থেকে তাদের দাবি পূরণের আশ্বাসও লাভ করেন। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালের ২৭-৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলন শেষে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ৩০ ডিসেম্বর (১৯০৬ সালে) ঢাকার শাহবাগে একটি রাজনৈতিক সভায় মিলিত হন। নবাব ভিকার-উল-মূলক ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি সে সভায় মুসলমানদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করে একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। সবশেষে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর প্রস্তাবে এবং হাকিম আজমল খানের সমর্থনে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' নামে মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়।[১১]

মুসলিম লীগ ছিল ধর্মীয় চেতনাবোধ সম্পন্ন একটি রক্ষণশীল পার্টি। আদর্শগতভাবে এ দলটি দ্বি-জাতিতত্ত্বে বিশ্বাসী ছিল। এজন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও মুসলিম লীগ হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য 'পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা' বহাল রাখার পক্ষে ছিল।[১২] মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ছিল- ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধির জন্য কাজ করে যাওয়া ও ভারতীয় মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা, সরকারের কাছে তাদের প্রয়োজনীয় দাবি-দাওয়া ও আশা-আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে পেশ করা এবং মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে কোন বিরূপ মনোভাবের সঞ্চার হলে তা প্রতিহত করা।[১৩]

Dhaka University Institutional Repository

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলেও এর পরবর্তী তিন দশক পর্যন্ত এ সংগঠনটির কার্যক্রম ছিল অত্যন্ত সীমিত। কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিল- বৃটিশ উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন-সংগ্রাম নয় বরং আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের দাবি-দাওয়া পূরণ করা। এছাড়া এ দলের নেতৃত্ব ছিল অভিজাত শ্রেণির হাতে।[১৪] ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে এ দলের কার্যক্রম দ্রুত বিকাশ লাভ করেনি। ১৯১০-এর দশকে মুসলিম লীগ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদলে একটি নিজস্ব রাজনৈতিক মতাদর্শ গ্রহণ করে। লক্ষ্মৌ চুক্তি (১৯১৬) এবং খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের উন্নতি ঘটলে মুসলিম লীগ জড় ও স্থবির অবস্থায় পড়ে। ১৯২০-১৯২২ সাল পর্যন্ত খেলাফত সংগঠনই মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার সকল কাজ পরিচালনা করে এবং মূলত মুসলিম লীগের সেসময় করণীয় প্রায় কিছুই ছিল না। ১৯৩৫ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত সংগঠনটি রাজনৈতিকভাবে অর্থবহ ছিল না। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের অধীনে অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাখাসমূহ পুনর্গঠিত করে নতুন কাঠামো প্রদান করেন। তিনি নতুন কমিটিসমূহকে জনসংযোগ এবং আসন্ন নির্বাচনী রাজনীতির জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে নির্দেশ প্রদান করেন।[১৫]

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে বাংলায় মুসলিম লীগ বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করে। মোট ৯টি প্রদেশে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৪৮২টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ১০৪টি আসন পায়। মোট প্রাপ্ত আসনের এক তৃতীয়াংশেরও অধিক (৩৬টি) শুধু বাংলাতেই অর্জিত হয়েছিল। মুসলিম লীগ আইন সভায় কংগ্রেসের পর দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। মনে করা হয় যে, বাংলায় মুসলীম লীগের বিজয় ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমান পেশাদার ও মুসলমান ভূমি মালিক সম্প্রদায়ের যৌথ সমর্থনের ফল। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এ.কে. ফজলুল হক ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগে যোগদান করেন এবং এর ফলে তার মন্ত্রীসভা কার্যত মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভায় পরিণত হয়। ফজলুল হকের ব্যাপক জনপ্রিয়তাকে ব্যবহার করে বাংলাকে মুসলিম লীগের দুর্গে পরিণত করা হয়। বাংলার মুসলমানদের নেতা হিসেবে ফজলুল হক মুসলিম লীগের মঞ্চ থেকে উপ-মহাদেশের মুসলমানদের জন্য স্বাধীন আবাসভূমি দাবি করে ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[১৬] লাহোর প্রস্তাবের মূল কথা ছিল- ভারতবর্ষকে বিভক্ত করে উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত ভৌগোলিকভাবে সংলগ্ন মুসলিম প্রধান এলাকাসমূহ নিয়ে পৃথক পৃথক রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। আর সেখানে অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলো পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে।[১৭]

Dhaka University Institutional Repository

১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে মুসলিম লীগ একটি যথার্থ জাতীয় সংগঠনে পরিণত হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম-এর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ এতই জনপ্রিয় হয়ে উঠে যে, ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলার মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ১১৭টি আসনের মধ্যে দলটি ১১০টি আসন লাভ করে। ফলে প্রমাণিত হয় যে, মুসলিম লীগই বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের একক সংগঠন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের সাফল্য দলের নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে ভারতীয় মুসলমানদের অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত করে। ফলে বৃটিশ সরকার কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ক সকল আলোচনা ও চুক্তিতে মুসলিম সম্প্রদায় সম্পর্কিত সকল বিষয়ে জিন্নাহর মতামত গ্রহণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। লাহোর প্রস্তাবের ছয় বছর পরে এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দী আইন সভায় মুসলমান সদস্যদের দিল্লী কনভেনশনে ‘একটি মুসলমান’ রাষ্ট্রের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীনতা অর্জিত হলে মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের প্রায় সকলের সংগঠনে পরিণত হয়।[১৮] এ প্রসঙ্গে বলা হয় যে, মুসলমান উচ্চবিত্ত শ্রেণির রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা করা হলেও কালক্রমে এটি ভারতের সকল শ্রেণির মুসলমানদের সংগঠনে পরিণত হয়।[১৯]

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর ঐ বছরেরই ডিসেম্বর মাসে করাচিতে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রথম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কাউন্সিলে দলের নাম পরিবর্তন করে ‘পাকিস্তান মুসলিম লীগ’ করা হয়। উক্ত কাউন্সিলে সোহরাওয়ার্দী মুসলিম লীগকে অসাম্প্রদায়িক দলে পরিণত করার প্রস্তাব দিলে সে প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। এ কাউন্সিলে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানকে আহবায়ক করে পাকিস্তান মুসলিম লীগের গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক প্রণীত গঠনতন্ত্র ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে অনুমোদন করা হয়। নতুন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মন্ত্রীদের দলের সাংগঠনিক পদে থাকার বিষয়টি নিষিদ্ধ করা হয়। এ অধিবেশনে চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে দলের আহবায়ক নিযুক্ত করা হয়। ১৯৪৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ৩য় কাউন্সিলে চৌধুরী খালিকুজ্জামানকে দলের প্রথম সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। আর ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে মওলানা আকরাম খাঁকে সভাপতি ও ইউসুফ আলী চৌধুরী মোহন মিয়াকে সেক্রেটারী করে ‘পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগ’ গঠন করা হয়। জিন্নাহ জীবিত থাকাকালীন সময়ে মুসলিম লীগ তার নিয়ন্ত্রণে ছিল। জিন্নাহর মৃত্যুর পর দলের নিয়ন্ত্রণ লিয়াকত আলী খানের হাতে চলে যায়। অর্থাৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টিলগ্ন থেকে মুসলিম লীগ দলটির নিয়ন্ত্রণ পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের হাতে ছিল। দলের কাউন্সিলরদের সর্বমোট ৪৬৫ জন সদস্যের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারিত হয় মাত্র ১৮০ জন। সর্বোপরি জিন্নাহর সময় মুসলিম লীগে নতুন সদস্যভুক্তির বিষয়টি স্থগিত ছিল। দলীয় নেতাদের এরকম স্বেচ্ছাচারিতার কারণে দলের প্রগতিশীল নেতা-কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তা সত্ত্বেও ১৯৫০ সালের ৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে দলের গঠনতন্ত্র সংশোধনক্রমে প্রধানমন্ত্রীকে পদাধিকার বলে দলের সভাপতি করার নতুন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সংশোধনীর ফলে দলের সভাপতির পদ প্রধানমন্ত্রীর হাতে চলে যায়। খাজা নাজিমউদ্দীন, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী এরা সকলেই দলের সভাপতি ছিলেন। এর ফলে দলে গণতান্ত্রিক চর্চার ধারা বাঁধাগ্রস্ত হয়। দল যেখানে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করবে তার বদলে সরকারই দলকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে এবং দল সম্পূর্ণভাবে সরকারে অনুগ্রহ ও ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। [২০]

উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে দলের বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা দল থেকে বের হয়ে নতুন দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পূর্ববাংলায় মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ (২৩ জুন ১৯৪৯) এবং এর পূর্বে পশ্চিম পাকিস্তানে মানকী শরীফের পীরের নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ (মে, ১৯৪৯) গঠিত হয়। এভাবে মুসলিম লীগ দলের অবক্ষয় সূচিত হতে থাকে। ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রবীন নেতা খুররম খান পন্নী আওয়ামী মুসলিম লীগের তরুন নেতা সোহরাওয়ার্দী-হাশিম সমর্থিত শামসুল হকের নিকট বিপুল ভোটে পরাজিত হন। এতে পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের দুর্বলতা সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদ বলেন যে, এর ফলে পূর্ববাংলার সরকার ও মুসলিম লীগ ঘরের কোনে আশ্রয় নেয়।[২১] এ পরাজয়ে শাসকগোষ্ঠী এত বেশি শঙ্কাগ্রস্ত হন যে তারা পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের অন্য ৩৪টি আসনের উপনির্বাচন স্থগিত রাখেন। আর প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও তারা তা ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত স্থগিত রাখেন।

মুসলিম লীগ শাসকগোষ্ঠীর এ স্বৈরাচারী মনোভাব দলের মধ্যে এত বেশি ক্ষোভের সৃষ্টি করে যে অনেক বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মী মুসলিম লীগ ত্যাগ করে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগদান করে। পরীক্ষিত পুরাতন নেতা-কর্মীদের এরূপ দলত্যাগে দলের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়ে। এসময় দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দলও বাড়তে থাকে। নুরুল আমিন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে হামিদুল হক চৌধুরী একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সমর্থক গোষ্ঠী তৈরি করেন। দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আকরম খাঁ ১৯৫১ সালের জানুয়ারি মাসে পদত্যাগ করেন। মওলানা আকরম খাঁর পদত্যাগের পর ১৯৫২ সালের ২৩ আগস্ট পূর্ববাংলা মুসলিম লীগের প্রথম কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয় এবং এ কাউন্সিলে নুরুল আমিন পূর্ববাংলা মুসলিম লীগের সভাপতি

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত হন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি পূর্ববাংলায় বিতর্কিত হওয়ায় তার পক্ষে মুসলিম লীগকে এখানে শক্তিশালী করা সম্ভব হয়নি। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগ পূর্ববাংলার জনপ্রিয়তা হারায়। ১৯৫৪ সালের পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে এর প্রভাব পড়ে। প্রাদেশিক পরিষদের এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়।

নির্বাচনের পর ১৯৫৫ সালের ৩ জানুয়ারি নুরুল আমিন পূর্ববাংলা মুসলিম লীগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। দলের কর্মীরা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে, তিনি প্রদেশে খাদ্য সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে, বিহারি-মোহাজের পুনর্বাসন করতে এবং রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তার পদত্যাগের পর ১৯৫৫ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি দলের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কাউন্সিলে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের আরো শোচনীয় অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। নুরুল আমিনের সঙ্গে আরো পদত্যাগ করেন দলের সহ-সভাপতি খাজা হাবিবুল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ এম.এ. সলিম, যুগ্ম-সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমান ও মঈনুদ্দীন চৌধুরী এবং প্রচার সম্পাদক সবুর খান। দলের মুখপাত্র হিসেবে প্রকাশিত পত্রিকা 'দৈনিক সংবাদ' দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয় এবং ১৯৫৫ সালে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে দলের নেতৃবৃন্দের পদত্যাগের ফলে পূর্ববাংলার রাজনীতি থেকে মুসলিম লীগের বিদায় ঘটে।

অপরদিকে মুসলিম লীগের কেন্দ্রেও এসময় নানারকম কোন্দল পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয় গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় মুসলিম লীগ কৃষক-শ্রমিক পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন করতে বাধ্য হয়। এ অবস্থায় ১৯৫৬ সালের ২৮-২৯ জানুয়ারি পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয় এবং এ কাউন্সিলে আবদুর রব নিশতার সভাপতি নির্বাচিত হন। এসময় পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ডা. খান সাহেবের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব-সংঘাত শুরু হয়। এ সুযোগে প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মীর্জা তার অনুগত একটি দল গঠনের জন্য মুসলিম লীগ থেকে গণপরিষদের কিছু সদস্যদের নিয়ে 'রিপাবলিকান পার্টি' (মে, ১৯৫৬) গঠন করেন। ফলে পাকিস্তান মুসলিম লীগ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ২২ জন গণপরিষদ সদস্য মুসলিম লীগ থেকে রিপাবলিকান পার্টিতে যোগদান করেন। এর ফলে চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর কোয়ালিশন মন্ত্রীসভাকে পদত্যাগ করতে হয় (১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬)। ১৯৪৭ সালের পর এই প্রথম মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত হয়। এরপর ১৯৫৭ সালে আই.আই. চুন্দ্রীগড়ের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ আরেকবার মাত্র দুই মাসের জন্য পাকিস্তানে সরকার গঠন করতে সক্ষম হলেও ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত এদল আর ক্ষমতায় আসতে পারেনি।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

এরপর ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক সরকার ক্ষমতায় আসে। সামরিক শাসন চলাকালীন সময় (১৯৫৮-১৯৬২) সকল রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৬২ সালে সামরিক আইন তুলে নিলে দেশে পুনরায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়। আইয়ুব খান নিজেও একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা মনে করেন। তার নির্দেশে চৌধুরী খালিকুজ্জামান ১৯৬২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর করাচিতে মুসলিম লীগের এক কনভেনশন আহবান করেন এবং 'কনভেনশন মুসলিম লীগ' গঠন করেন। আইয়ুব খান ১৯৬৩ সালে কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। পূর্ব পাকিস্তানে ফজলুল কাদের চৌধুরী, সবুর খান, মোনেম খান কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগ দেন। কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগদানের পুরস্কার স্বরূপ এরা প্রত্যেকেই মন্ত্রীত্ব পেয়েছিলেন। মন্ত্রীত্ব ছাড়াও ফজলুল কাদের চৌধুরী জাতীয় পরিষদের স্পীকার ও মোমেন খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর পদ লাভ করেন। আইয়ুব খানের একান্ত আজ্ঞাবহ ও অনুগতরাই মূলত কনভেনশন মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছিলেন। আইয়ুব খানকে ঘিরেই দলের সকল কর্মকাণ্ড ব্যাপৃত ছিল। ফলে সংগঠন হিসেবে কনভেনশন মুসলিম লীগের কার্যকরী শক্তি বাড়াবার কোন উদ্যোগ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করেননি।

১৯৬২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর কনভেনশন মুসলিম লীগ গঠনের পর মুসলিম লীগের প্রাক্তন নেতারা গঠন করেন 'কাউন্সিল মুসলিম লীগ'। ১৯৬২ সালের ২৭ নভেম্বর ঢাকায় আয়োজিত কাউন্সিলে এ দল গঠন করা হয়। খাজা নাজিমউদ্দীনকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। তার মৃত্যুর পর (১৯৬৪) মিয়া মমতাজ দৌলতানা কাউন্সিল মুসলিম লীগের সভাপতি নিযুক্ত হন। মূলত এ দলটি পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে এ দলের নেতা ছিলেন খাজা খয়েরউদ্দিন। কাউন্সিল মুসলিম লীগ আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলটি ফাতিমা জিন্নাহকে সমর্থন করেছিল। 'পিডিএম', 'ডাক' প্রভৃতি রাজনৈতিক জোট এ দলে যোগ দিয়েছিল। পূর্ববাংলায় ছয়দফা ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসনের প্রতি কাউন্সিল মুসলিম লীগের সমর্থন ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ বিঘ্নিত হোক তা এ দল কোনভাবেই চায়নি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে দলটি মাত্র একটি আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দলটি পাকিস্তানের সংহতি রক্ষার যুক্তি দেখিয়ে এ যুদ্ধের বিরোধিতা করে। এমনকি ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল গঠিত 'শান্তি কমিটির' আহবায়ক হয়েছিল কাউন্সিল মুসলিম লীগের পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান খাজা খয়েরউদ্দিন। ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের পতনের পর কনভেনশন মুসলিম লীগ দ্বি-খণ্ডিত হয়ে আবদুল কাইয়ুম খানের নেতৃত্বে একটি পৃথক মুসলিম লীগ গঠিত হয়। মুসলিম লীগের এ অংশ

Dhaka University Institutional Repository

'কাইয়ুম মুসলিম লীগ' নামে পরিচিত ছিল। এ দলটিও ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিল।[২৩]

মুসলিম লীগ দলটি যে তিনটি উপদলে বিভক্ত হয়েছিল, তার পিছনে কোন আদর্শিক দ্বন্দ্ব ছিল না, ছিল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। তিনটি উপদলই মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও পাকিস্তানের ঐক্য বজায় রাখার জন্য পূর্ববাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে কাউন্সিল মুসলিম লীগ, কনভেনশন মুসলিম লীগ ও কাইয়ুম মুসলিম লীগ পৃথক-পৃথক ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং যথাক্রমে ৭টি, ২টি ও ৯টি আসনে জয়লাভ করে। কিন্তু এর সবকয়টি আসনই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব পাকিস্তানে তারা মোট ৫.৪৮% ভোট পায়, তবে একটি আসনও লাভ করতে পারেনি। মুসলিম লীগের তিনটি উপদলই পাকিস্তানের অখণ্ডতায় বিশ্বাস করতো এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষ নেয়।[২৪] ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান প্রণয়নের সময় ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক দল গঠন ও তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তখন থেকে অন্যান্য ধর্মভিত্তিক দলগুলোর সঙ্গে মুসলিম লীগ ও তার উপদলগুলোর রাজনীতি বাংলাদেশে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের অন্যতম বড় ও পুরাতন রাজনৈতিক দল। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ প্রায় সকলেই পাকিস্তান মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন। মুসলিম লীগের সুনির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক কর্মসূচি ছিল না, বরং সেটি ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের রাজনৈতিক বাহন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর রাষ্ট্র পরিচালনার ভার মুসলিম লীগের উপর ন্যস্ত হয়। একটি নতুন রাষ্ট্রকে গড়ে তোলার উপযোগী কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পরিবর্তে অল্পকালের মধ্যেই মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের ঐক্য বজায় থাকলেও তার মৃত্যুর পর পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী নেতা মুসলিম লীগ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মানকী শরীফের পীর সাহেবকে মুসলিম লীগ হতে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৪৯ সালে পশ্চিম পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী মামদোতের খানকে পদচ্যুত করা হয়। তখন তিনি 'জিন্নাহ মুসলিম লীগ' নামে একটি নতুন দল গঠন করেন। এদিকে তদানীন্তন পূর্ববাংলার সরকার মুসলিম লীগকে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে। ফলে জনসাধারণ এ দল থেকে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে মুসলিম লীগের দৃষ্টিভঙ্গি, পূর্ববাংলার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে

পশ্চিম পাকিস্তানি আমলাদের প্রাধান্য এবং অন্যান্য কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার প্রতি মুসলিম লীগ সরকারের বিমাতাসুলভ মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠে।[২৫] এমতাবস্থায় ১৯৪৯ সালের জুন মাসে মুসলিম লীগের প্রগতিবাদী অংশের কিছু নেতা-কর্মী ঢাকায় মিলিত হয়ে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন।[২৬] মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি; আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান, সাখাওয়াত হোসেন, আলী আহম্মদ এবং আলী আমজাদ খান সহ-সভাপতি; শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক; শেখ মুজিবুর রহমান, রফিকুল ইসলাম ও খন্দকার মোশতাক আহমেদ যুগ্ম-সম্পাদক এবং ইয়ার মোহাম্মদ খান কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন।[২৭] আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকালে প্রথম যে দলীয় মেনিফেস্টো প্রকাশিত হয় তাতে বিনা খেসারতে জমিদারি ব্যবস্থা উচ্ছেদ; কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন; কৃষির উন্নতির জন্য সেচ, সার, উন্নত বীজ ও সহজে কৃষি ঋণের ব্যবস্থা করা; সমস্ত ভূমিকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা; শিল্প কারখানা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসা; পাট ও চা শিল্পকে জাতীয় সম্পদে পরিণত করা; শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগ বন্ধ করা প্রভৃতি বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল।[২৮] খুব অল্প সময়ের মধ্যেই উপর্যুক্ত নেতৃবৃন্দ তাদের দলকে সাধারণ মানুষের খুব কাছে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে এ দলের শাখা গঠিত হয় এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের আহবায়ক নিযুক্ত হন। তিনি আমৃত্যু এ দলের নেতৃত্ব দান করেন।[২৯] আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার এক বছরের মধ্যেই পাকিস্তান গণপরিষদে উত্থাপিত মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের বিরোধিতা করে পার্টিটি এক বড় ধরনের আন্দোলন গড়ে তোলে। এ আন্দোলনের ফলে মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট গণপরিষদ থেকে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়। এভাবে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আওয়ামী মুসলিম লীগ একটি আন্দোলনমুখী দলে পরিণত হয়। ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি যে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়েছিল, তার সভাপতি ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের মওলানা ভাসানী।[৩০] ভাষা আন্দোলনে সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে আওয়ামী মুসলিম লীগ ও ছাত্রলীগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারকে পরাজিত করার লক্ষ্যে যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে আওয়ামী মুসলিম লীগ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে। এ নির্বাচনে পরাজয়ের ফলে মুসলিম লীগ ক্ষমতা ও পূর্ববাংলার রাজনীতি দু'টো থেকেই নির্বাসিত হয়। ১৯৫৫ সালের ২১-২৩ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত দলের তৃতীয় কাউন্সিল অধিবেশনে দলের নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মুসলিম শব্দটি বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং সে মোতাবেক মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে দলের নতুন নামকরণ করা হয় 'আওয়ামী লীগ'। ফলে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য দলের সদস্য পদ লাভ উন্মুক্ত হয়ে যায়। আর এভাবেই তখন থেকে

দলটি একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিতি পায়।[৩১] এ প্রসঙ্গে হারুন-অর-রশিদ বলেন, প্রতিষ্ঠাকালে দলের নামের সঙ্গে মুসলিম শব্দ যুক্ত রাখা ছিল একটি রাজনৈতিক কৌশল।[৩২] তবে এসময় পূর্ব পাকিস্তানে ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং হিন্দু তফশিলি সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক দলগুলোর বিকাশ লাভের সুযোগ না থাকায় তারা অনেকে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ফলে এ দল পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র একক দল হিসেবে বিস্তৃতি লাভ করে। এছাড়া পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের পতন এবং আইয়ুব খানের আমলে তার দল কনভেনশন মুসলিম লীগ শক্তিশালী হতে না পারায় আওয়ামী লীগ একক বৃহত্তম ও শক্তিশালী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।[৩৩]

যদিও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে আওয়ামী লীগের শাখা ছিল, কিন্তু দলটি সেখানে কোন দিনই জনপ্রিয় সংগঠনরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। আওয়ামী লীগ ছিল মূলত পূর্ববাংলা ভিত্তিক রাজনৈতিক দল। আওয়ামী লীগের প্রথম ঘোষণাপত্রে যে ৪২ দফা কর্মসূচি প্রকাশ করা হয় তার মধ্যে লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববাংলাকে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের দাবি ছিল প্রধান। কেবল প্রতিরক্ষা, মুদ্রা ও পররাষ্ট্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে রেখে অন্য সকল বিষয় প্রাদেশিক সরকারের হাতে অর্পণ করার দাবি জানানো হয়। অন্য দাবিগুলোর মধ্যে ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান, সংসদীয় সরকার পদ্ধতি, বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ, উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টন, পাট ও চা শিল্প এবং ব্যবসা জাতীয়করণ, যৌথ ও সমবায় পদ্ধতির কৃষি-ব্যবস্থা প্রবর্তন, শ্রমিকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা দান, অবৈতনিক ও বাধ্যতামুলক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি।[৩৪]

আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্টের শরিক দল হিসেবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির মধ্যে আওয়ামী লীগের উপর্যুক্ত দাবিগুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের মূল প্রেরণা এ ২১ দফা প্রণয়ন করেন আবুল মনসুর আহমদ।[৩৫] এ নির্বাচনে ২৩৭টি মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট পায় ২২৩টি আসন (আওয়ামী লীগ ১৪৩টি আসন)। পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে আওয়ামী লীগ আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে প্রদেশে প্রায় ২ বছর (১৯৫৬-১৯৫৮) ক্ষমতাসীন ছিল এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে ১৩ মাস (১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৭ সালের ১১ অক্টোবর) কোয়ালিশন সরকারের প্রধান অংশীদার ছিল। বিভিন্ন প্রকারের চাপ ও অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এ সরকারগুলো বাঙালিদের ন্যায্য দাবি- দাওয়া পূরণের চেষ্টা

করেছিল। এগুলোর মধ্যে ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ও জাতীয় পরিষদে যুক্তনির্বাচন প্রবর্তনে (১৪ অক্টোবর, ১৯৫৬) সোহরাওয়ার্দীর সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[৩৬]

১৯৫৭ সালে পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ে মতপার্থক্যকে কেন্দ্র করে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ধরে। সোহরাওয়ার্দী পশ্চিমের বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জোরালো সম্পর্ক রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। আর মওলানা ভাসানী ছিলেন জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির সমর্থক। তাদের এ দ্বন্দ্বের ফলে আওয়ামী লীগে এক ধরনের সংকট দেখা দেয়। আওয়ামী লীগের কাগমারি সম্মেলনে (৭-৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭) দলের বিভক্তির বিষয়ে বিস্ফোরণ ঘটে এবং এ বিরোধের ফলে শেষ পর্যন্ত (২৫-২৬ জুলাই ১৯৫৭) মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়।[৩৭]

এরপর ১৯৬৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা হয় এবং তখন থেকেই এ দল পূর্ববাংলার (বাংলাদেশের) মানুষের স্বার্থে আপসহীন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর এক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচি উপস্থাপন করেন।[৩৮] এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল: প্রাপ্ত বয়স্কের সার্বজনীন ভোটাধিকারের সুযোগসহ কেন্দ্রে সংসদীয় ফেডারেল পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা, ফেডারেল ইউনিটগুলোর হাতে পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা ব্যতীত সকল ক্ষমতা অর্পণ, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পৃথক মুদ্রা প্রচলন, কর ও শুল্ক সংগ্রহের জন্য ইউনিটগুলোকে ক্ষমতা প্রদান, বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে ইউনিটগুলোর সরাসরি বাণিজ্যের অধিকার এবং ইউনিটগুলোকে তাদের নিজ নিজ প্রতিরক্ষার জন্য আধা-মিলিশিয়া বা আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা প্রদান।[৩৯] আইয়ুব সরকার এ কর্মসূচির প্রতিক্রিয়া হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৪ জনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলা (১৯৬৮) দায়ের করে।[৪০] ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলন শুরু হয় এবং আইয়ুব খানের পতন ঘটে।[৪১]

গণআন্দোলন ও আইয়ুব খানের পতনের পটভূমিতে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান হতে সকল আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। দলটি জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে। এ নির্বাচনকে আওয়ামী লীগ ৬ দফার উপর গণভোট বলে ঘোষণা করে। নির্বাচনে দলের প্রধান প্রচারনা ছিল স্বাধিকারের প্রশ্নে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগ দলটি

তার নির্বাচনী ইশতেহারে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনের জন্য নির্দিষ্ট কর্মসূচিও অন্তর্ভুক্ত করে। তাতে ব্যাংক, বীমা, পাট ও বস্ত্রশিল্পসহ প্রধান প্রধান শিল্প জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়।[৪২]

আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ব্যাপক বিজয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ববাংলার একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়ে উঠে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান জনগণের ভোটে নির্বাচিত দলকে সরকার গঠন করতে না দেওয়ায় পূর্ববাংলায় গণআন্দোলন শুরু হয়ে যায়। আওয়ামী লীগ ও দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ১৯৭১ থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলে জনগণ তাতে সর্বাত্মক অংশগ্রহণ করে। ৪ মার্চ থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন আধা বেলা হরতাল চলে। তিন দিনের এ হরতালে ঢাকাসহ সারাদেশে আন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দেন যে ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে এ ঘোষণা আকৃষ্ট করতে পারেনি। আর এদিকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে নতুন কর্মসূচির জন্য এক বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৮ মিনিটের এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণে তিনি বলেন,

> "সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, হত্যার তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখব, পরিষদে বসব কি বসব না। ..... ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ।... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"[৪৩]

এ ভাষণে তিনি কোর্ট-কাছারি, অফিস-আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অনির্দিষ্টকালে জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন এবং বলেন, এ দেশ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ থাকবে। তিনি সারা বাংলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার নির্দেশ, প্রতিরোধ সংগ্রাম শেষ অবধি মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়ার ইঙ্গিত, শত্রুর মোকাবেলায় গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন, যে কোন উস্কানির মুখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন।

মূলত ২ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সারা বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন চলে। এ অসহযোগ আন্দোলনের ফলে পূর্ববাংলায় পাকিস্তানি শাসনকার্য তখন অকার্যকর হয়ে পড়ে। ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দও ঐ সময় ঢাকায়

আসেন। ১৬-২৪ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ও তার সহযোগীদের সঙ্গে বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে তারা আলোচনা করেন। আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সমস্যা সমাধানের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। কিন্তু আলোচনা অসমাপ্ত রেখে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকা ত্যাগের পূর্বে তিনি পূর্ববাংলার জনগণের উপর সশস্ত্র আঘাত হানার নির্দেশ দিয়ে যান। ইয়াহিয়া খানের সে নির্দেশ মোতাবেক ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ রাতে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে নিরস্ত্র বাঙালি জনগণের উপর পাকিস্তানি সৈন্যরা আকস্মিক আক্রমণ করে। এর ফলে পাকিস্তানের অখণ্ডতা কার্যত চূড়ান্ত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে বিচারের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়। ইতোমধ্যেই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়। পরবর্তীতে ১০ এপ্রিল ১৯৭১-এ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত একটি প্রবাসী সরকার (মুজিবনগর সরকার) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করে এবং ৯ মাসের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের পর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।[৪৪] আর এ বিজয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে স্থান করে নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

প্রতিষ্ঠার ৭০ বছর পরেও দেশের সবচেয়ে পুরাতন ও সর্ববৃহৎ দল হিসেবে আওয়ামী লীগ নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে রেখেছে। তবে আওয়ামী লীগকে তার রাজনৈতিক পথ-পরিক্রমায় বহু সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনেক প্রবীণ নেতা এ দল ত্যাগ করে নতুন দল গঠন করেছেন। মওলানা ভাসানী আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) গঠন করেছেন। আতাউর রহমান খান ন্যাশনাল লীগ গঠন করেছেন। তারা অনেক নেতা-কর্মীসহ আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে গেছেন। কিন্তু দলটি অত্যন্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে সংকট মোকাবেলা করে দিন-দিন শক্তিশালী হয়েছে এবং পূর্ববাংলার মানুষের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি শক্তিশালী করেছে। আর ঐতিহাসিক সত্য হচ্ছে এই যে, দলটি আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ছয়দফা আন্দোলন ও ঊনসত্তরের গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে এবং পূর্ববাংলার মানুষের অধিকার আদায়ে সর্বোচ্চ সচেষ্ট থেকে অবশেষে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে।[৪৫]

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী)

বাংলাদেশের পুরাতন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অন্যতম দল হলো ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের (পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মওলানা ভাসানী ১৯৫৭ সালে এ নতুন রাজনৈতিক দলটি গঠন করেন। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই দেশের পররাষ্ট্র নীতি এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মতো বিষয়কে কেন্দ্র করে আওয়ামী লীগের দু'নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর

মধ্যে বিরোধ ক্ষমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। মওলানা ভাসানী এসময় এইচ. এস. সোহরাওয়ার্দীকে পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি সমর্থন দানের ক্ষেত্রে তার উদাসীনতা ও আমেরিকাপন্থী পররাষ্ট্র নীতির জন্য দায়ী করেন। এ মতবিরোধ অবশেষে আওয়ামী লীগের মধ্যে একটি ভাঙনের সৃষ্টি করে। ৭-৮ ফেব্রুয়ারি (১৯৫৭ সালে) টাঙ্গাইলের কাগমারীতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের কাউন্সিলে এ মতবিরোধ প্রকাশ্য রূপ নেয়। পার্টি সভাপতি মওলানা ভাসানী নির্বাহী কমিটির ৯ জন সদস্য নিয়ে পার্টি থেকে পদত্যাগ করেন। এরপর ভাসানী এপ্রিল মাসে পশ্চিম পাকিস্তানের বামধারার নেতাদের সঙ্গে নতুন দল গঠনের লক্ষ্যে আলাপ-আলোচনা করেন। সর্বশেষ ২৫-২৬ জুলাই (১৯৫৭ সালে) আওয়ামী লীগের পদত্যাগকারী নেতৃবৃন্দ ভাসানীর নেতৃত্বে ঢাকার রূপমহল সিনেমা হলে এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করেন। সম্মেলনে আওয়ামী লীগভুক্ত বামপন্থী নেতৃবৃন্দ, লুপ্ত হয়ে যাওয়া গণতন্ত্রী দলের সদস্যরা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক কমিউনিস্ট নেতা যোগ দেন। বলা হয়ে থাকে যে, সমগ্র দেশের বিভিন্ন গ্রুপের ৫০০ এর অধিক বাম নেতৃবৃন্দ ঢাকার ন্যাপ সম্মেলনের সূচনা সভায় যোগ দিয়েছিলেন।[৪৬] উল্লেখ্য যে, ১৯৫৩ সালে পূর্ববাংলার কিছু সংখ্যক কমিউনিস্ট কর্মীর উদ্যোগে হাজী মোহাম্মদ দানেশের নেতৃত্বে 'গণতন্ত্রী দল' নামে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছিল। ভাসানীর সম্মেলনে এ দলের নেতৃবৃন্দ যোগদান করেছিলেন। আর পশ্চিম পাকিস্তানে বামপন্থীরা 'ন্যাশনাল পার্টি' নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এ সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মিয়া ইফতেখার উদ্দিন, খান আবদুল গাফফার খান, জি.এম. সৈয়দ, খান আবদুস সামাদ আচাকজাঁই প্রমুখ ভাসানীর সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।[৪৭] এ সম্মেলনে ন্যাপ (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) নামক একটি নতুন রাজনৈতিক পার্টির জন্ম হয়। সর্বসম্মতিক্রমে মওলানা ভাসানী পার্টির সভাপতি (কেন্দ্রীয় ন্যাপ এবং পূর্ব পাকিস্তান শাখার) নির্বাচিত হন।[৪৮] আওয়ামী লীগের বহু বামপন্থী নেতা-কর্মী নতুন এ দলে যোগদান করেন। ন্যাপের অন্যান্য নেতাদের মধ্যে ছিলেন হাজী মুহাম্মদ দানেশ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, মহিউদ্দিন আহমদ, মশিউর রহমান (যদু মিয়া), পীর হাবিবুর রহমান, এস.এ. আহাদ, আব্দুল মতিন, আবদুল হক, আতাউর রহমান, মোহাম্মদ তোয়াহা এবং পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ছিলেন ওয়ালি খান, আবদুল মজিদ সিন্দী, মিয়া ইফতেখার প্রমুখ।[৪৯]

ন্যাপের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল- পাকিস্তানকে সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিকতা, সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণমুক্ত একটি শক্তিশালী জাতিতে সংগঠিতকরণ; জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সাধন;

নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও দেশের উভয় অংশের স্বায়ত্তশাসন কায়েম করার উদ্দেশ্যে সকল গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা।[৫০]

ন্যাপ গঠনের পর নিষিদ্ধ ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতা-কর্মী এ দলে যোগদান করেন। ফলশ্রুতিতে দলের শক্তি অনেক বেড়ে যায়। ন্যাপ গঠনের পর-পরই বামপন্থীরা, আওয়ামী লীগের সোহরাওয়ার্দী বিরোধী অংশ এবং বিপ্লবী মানসিকতায় বিশ্বাসীরা একে স্বাগত জানায়। পরবর্তী এক দশকের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতা ন্যাপের নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত হন। পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদের প্রায় ৩০ জন সদস্য আওয়ামী লীগ ছেড়ে ন্যাপে যোগ দেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে ন্যাপের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। ন্যাপ তার অঙ্গসংগঠন হিসেবে 'পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি' গঠন করে (ডিসেম্বর ১৯৫৭)। মওলানা ভাসানী এ সংগঠনের সভাপতি আর আবদুল হক সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এরপর কমিউনিস্ট ও ন্যাপ নেতাদের উদ্যোগে গঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান মজদুর ফেডারেশান' (ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৮)। মোহাম্মদ তোয়াহা এর সভাপতি নির্বাচিত হন।[৫১]

১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি হলে সকল রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়। অনেক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গ্রেফতার হন। মওলানা ভাসানীকেও গ্রেফতার করা হয়। ফলে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ন্যাপ সাংগঠনিকভাবে তেমন সফলতা অর্জন করতে পারেনি। ১৯৬২ সালে সামরিক আইন তুলে নিলে পুনরায় দেশে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু হয় এবং এসময় ন্যাপ একটি জনপ্রিয় রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। মওলানা ভাসানীর আহবানে 'সর্বদলীয় প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার সংগ্রাম পরিষদের' উদ্যোগে ১৯৬৪ সালের ১৮ মার্চ 'সার্বজনীন ভোটাধিকার দিবস' পালিত হয়। ১৯৬৫ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ন্যাপ সংযুক্ত বিরোধী দলের প্রার্থী হিসেবে ফাতেমা জিন্নাহর নির্বাচনী প্রচারণায় অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে ১৯৬৫ সালে মওলানা ভাসানী ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন করেছিলেন।[৫২] ১৯৬৭ সালের দিকে বিভিন্ন কারণে ন্যাপ নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। এসব কারণগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল- আইয়ুব সরকারের প্রতি ন্যাপের সুবিধাবাদী নমনীয় মনোভাব এবং বিরোধী দলীয় ঐক্য ও ছয় দফা আন্দোলনকে পাশ কাটানোর মনোভাব।

১৯৬৭ সালের ৩০ নভেম্বর রংপুরে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনের পর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রশ্নে ন্যাপ চীনপন্থী ও মস্কোপন্থী এ দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে যায়। চীনপন্থী ন্যাপের

সভাপতি হন মওলানা ভাসানী এবং মস্কোপন্থী ন্যাপের সভাপতি হন সীমান্ত প্রদেশের খান আবদুল ওয়ালী খান। পূর্ব পাকিস্তান ওয়ালী ন্যাপের সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। এ অংশ 'মোজাফফর ন্যাপ' নামে পরিচিত।[৫৩] ১৯৬৭ সালে মওলানা ভাসানী ন্যাপের কাউন্সিল ও কৃষক সমিতির অধিবেশন আহবান করেন। আর অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় রিকুইজিশন কাউন্সিল অধিবেশন। ১৯৬৮ সালে ন্যাপ সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী গণঅভ্যুত্থানের সূচনা করে। ১০ দফা দাবির ভিত্তিতে ৩ নভেম্বর 'দাবি দিবস' এবং ৬ ডিসেম্বর 'জুলুম প্রতিরোধ দিবস' পালিত হয। ঐদিন পল্টনের এক জনসভা শেষে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে জনগণ গভর্নর হাউজ ঘেরাও করে এবং ৭ ডিসেম্বর হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। ঢাকায় হরতালের দিন পুলিশের গুলিতে একজন নিহত হওয়ার প্রতিবাদে ৮ ও ১০ ডিসেম্বর সারা প্রদেশব্যাপী হরতাল আহবান করা হয়। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত যে গণআন্দোলন চলতে থাকে ন্যাপ ভাসানী তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে এ দলটি সর্বপ্রথম আওয়ামী লীগ সরকারের বিরোধিতা করে। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এ দলটি ১৩টি পৃথক-পৃথক দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। আর মস্কোপন্থী ন্যাপও অনুরূপভাবে ১৯৭০ এবং ১৯৮০ এর দশক জুড়ে একটি ভাঙন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কমপক্ষে ৫টি দল ও উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। [৫৪]

তবে সার্বিক বিচারে বলা যায় যে, ১৯৬২ সালের পর ন্যাপ দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাম রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। দলের নেতা মওলানা ভাসানী একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন এবং ১৯৬৯ এর গণআন্দোলনে তার দল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ন্যাপ (ভাসানী) ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তার নিজস্ব প্রার্থী মনোনীত করে, কিন্তু ভোট গ্রহণের কয়েকদিন পূর্বে নির্বাচন থেকে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেয়। স্বাধীনতা সংগ্রামকালে মওলানা ভাসানী বিপ্লবী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন।[৫৫]

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর)

১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে যেসকল নেতৃবৃন্দ 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি' গঠন করেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি পূর্ববাংলায় দ্রুত প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং একটি শক্তিশালী বাম রাজনৈতিক দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। কিন্তু ১৯৬৭ সালের দিকে বিভিন্ন কারণে ন্যাপ নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। এসবের মধ্যে ছিল প্রধানত আইয়ুব সরকারের প্রতি ন্যাপের নমনীয় মনোভাব এবং বিরোধী দলীয় ঐক্য ও ছয় দফা আন্দোলনকে পাশ কাটানোর মনোভাব। উল্লেখ্য যে,

এসময় দেশে-দেশে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের উপায়, পন্থা ও কৌশল হিসেবে সোভিয়েত কমিউটিস্ট পার্টি এবং চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। ১৯৬২-৬৩ সাল থেকে সেসকল ঘটনার প্রভাব বাংলাদেশের ন্যাপের উপরও পড়ে। ১৯৬৭ সালের ৩০ নভেম্বর রংপুরে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনের পর দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রশ্নে ন্যাপ চীনপন্থী ও মস্কোপন্থী এ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। চীনপন্থী ন্যাপের সভাপতি হন মওলানা ভাসানী এবং মস্কোপন্থী ন্যাপের সভাপতি হন সীমান্ত প্রদেশের খান আবদুল ওয়ালী খান। পূর্ব পাকিস্তানে ওয়ালী ন্যাপের সভাপতি হন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ। ন্যাপের এ অংশটি 'ন্যাপ মোজাফফর' নামে পরিচিত।[৫৬]

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, যখন ন্যাপ গঠিত হয়, তখন পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ছিল। ফলে কমিউনিস্ট পার্টির অনেক নেতা-কর্মী ন্যাপে যোগ দেয়। বস্তুত ন্যাপ ছিল আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট পার্টির সম্মুখ সংগঠন। ১৯৬২ সালের পর কমিউটিস্ট বিশ্বে যেসকল ঘটনা ঘটে, সে প্রভাব ন্যাপের উপরও পড়ে। সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি তার ২০তম কংগ্রেসে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা ঘোষণা করে যে, বিশ্বের দুই সমাজব্যবস্থার মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান এবং যুদ্ধ পরিহার, বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পন্থায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং কোন-কোন দেশে শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভব। ১৯৬৩ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষিত মূলনীতিগুলোর কঠোর সমালোচনা করে এবং সোভিয়েত নেতৃত্বকে 'সংশোধনবাদী' বলে ঘোষণা করে। চীনা কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে যে, 'একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।' মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ন্যাপের একটি অংশ চীন নির্দেশিত পথে 'জনগণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ভাসানী মনে করেন যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পাকিস্তানে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান বাঁধা। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত করতে না পারলে বিদেশি পুঁজি, দেশি শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও সামন্ত শ্রেণিকে উৎখাত করা সম্ভব নয়। অতএব, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই প্রধান কাজ। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের পর চীন পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে। আইয়ুব খানের গৃহীত পররাষ্ট্রনীতিকে মওলানা ভাসানী সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নীতি বলে মনে করেন এবং আইয়ুব সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি অবলম্বন করেন। তার মতে- স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামকে সার্বিক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম থেকে ভিন্নভাবে দেখার সুযোগ নেই। ভাসানী মনে করেন যে, আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচির মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী কোন বক্তব্য ছিল না এবং এ কারণে তিনি ছয় দফা আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেননি।[৫৭]

কিন্তু অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের নেতৃত্বে ন্যাপের অন্য অংশ উপর্যুক্ত বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাদের মতে- মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমাজতন্ত্রের প্রধান অন্তরায়। তাই আইয়ুব সরকারের নীতিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বলে মনে করার কোন কারণ নেই। আইয়ুব সরকার ও চীনের মধ্যে ভালো সম্পর্ক স্থাপিত হলেও আইয়ুব বিভিন্ন সামরিক জোট পরিত্যাগ করেননি এবং পাকিস্তানে মার্কিন প্রভাব তখনও অটুট ছিল। উপরন্তু আইয়ুব খানের একনায়কতন্ত্র পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা। এজন্য এখন প্রধান কাজ হলো- একটি নিম্নতম কর্মসূচির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুব সরকারকে উৎখাত করে দেশে একটি 'জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার' প্রতিষ্ঠা করা। এরূপ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে সংসদীয় পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সংসদীয় গণতন্ত্র ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ন্যাপের এ অংশ আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে প্রস্তুত ছিল। ন্যাপ (মোজাফফর) ১৯৬৮-৬৯ সালের গণআন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য বিরোধী দলের সমন্বয়ে গঠিত 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' DAC (Democratic Action Committee)- এর সঙ্গে একসাথে কাজ করে এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা কর্মসূচির প্রতি সমর্থন প্রদান করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এ দলটি অংশগ্রহণ করে। পূর্ববাংলা (বাংলাদেশ) থেকে তদানিন্তন পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে দলটি কোন আসন লাভ করতে না পারলেও, প্রাদেশিক পরিষদে দলের একজন প্রার্থী জয়লাভ করে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ন্যাপ (মোজাফফর) সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং পার্টি প্রধান অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বিপ্লবী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন।[৫৮]

কমিউনিস্ট পার্টি

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তানের কমিউনিস্ট কর্মীরা ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির অংশ হিসেবে কমিউনিস্ট আন্দোলনে নিজেদের ব্যাপৃত রাখেন। ১৯৪৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পাকিস্তানে পৃথক কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উক্ত সিদ্ধান্তানুযায়ী ১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ পাকিস্তানের উভয় অংশের কমিউনিস্টদের এক কংগ্রেসে ৯ সদস্য বিশিষ্ট পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয় এবং সাজ্জাদ জহিরকে পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।[৫৯] একই দিন পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট প্রতিনিধিগণ একটি পৃথক সম্মেলনে মিলিত হয়ে সুধীর রায়কে (ওরফে খোকা রায়) সাধারণ সম্পাদক করে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির একটি প্রাদেশিক কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন মনি সিং, বারীন দত্ত, নেপাল নাগ, মনসুর হাবিব, পুর্ণেন্দু দস্তিদার

প্রমুখ।[৬০] এ পার্টির মূল লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই সংগ্রাম অব্যাহত রাখা এবং সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করা।

কলকাতা সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতার নীতি পরিহার করে সহিংস সামাজিক বিপ্লবের নীতি গ্রহণ করে। নবগঠিত পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিও ঐ একই নীতি অনুসরণ করে।[৬১] কলকাতা অধিবেশনেই কমরেড ভালচন্দ্র ত্রিথুক বনদিভের (টি.ভি.বনদিভ) তত্ত্ব অনুযায়ী কমিউনিস্ট পার্টি সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদের মূলোচ্ছেদ, ইঙ্গ-মার্কিন সরকারদ্বয়ের দোসর ধনিক-বণিক, ভূস্বামী প্রতিভূ পাক-ভারত সরকারকে উচ্ছেদ করার প্রয়োজনে সমাজতান্ত্রিক সশস্ত্র বিপ্লবের আহবান জানায়।[৬২]

কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীদের উগ্র ও সন্ত্রাসবাদী কর্মতৎপরতার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই উভয় পাকিস্তানেই পার্টির অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। ১৯৫১ সালে 'রাওলাপিন্ডি ষড়যন্ত্র মামলায়' কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে সরকার উৎখাত করে পাকিস্তানে কমিউনিস্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয় এবং জেনারেল আকবর খানের সাথে সাজ্জাদ জহির, কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। নেতৃবৃন্দের প্রায় সবাইকে গ্রেফতার করা হয়। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে পার্টির কর্মতৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়।[৬৩] পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় বহু গুণ বেশি ছিল। এ কারণে পার্টির কর্মতৎপরতা পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে।[৬৪] এসময় পূর্ব পাকিস্তানের (পূর্ববাংলার) কমিউনিস্ট পার্টিও বিভিন্ন ধরনের উগ্রপন্থী ও সন্ত্রাসবাদী কর্মসূচি গ্রহণ করে।[৬৫] ১৯৪৮ সালের ৩০ জুন কমিউনিস্ট পার্টির আহুত জনসভা সরকারি দমন নীতির কারণে বিশেষ সফল হয়নি। বরং তারা সরকার ও সাধারণ জনগণের কাছে রাষ্ট্রদ্রোহী, ধর্মদ্রোহী ও নাস্তিক বলে অভিযুক্ত হয়। আর পার্টির কর্মীগণ ধীরে ধীরে প্রকাশ্য কর্মসূচি বর্জন করে গোপন সংগঠনের দিকে মনোনিবেশ করে।[৬৬]

তবে আত্মগোপন অবস্থায় কমরেড মনি সিংহ ময়মনসিংহের নেত্রকোনা মহকুমার অন্তর্গত দূর্গাপুরের অমুসলমান হাজং এলাকায়, কমরেড ইলা মিত্র রাজশাহী জেলার নবাবগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত অমুসলমান সাঁওতাল সম্প্রদায় অধ্যুষিত নাচোল এলাকায়, কমরেড সুব্রত পাল সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার থানার অন্তর্গত অমুসলমান, নমঃশুদ্র ও দাস সম্প্রদায় অধ্যুষিত থানেশ্বর এলাকায় সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান ঘটান। এছাড়া খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও অমুসলমান প্রধান ধানমুনিয়া এলাকায়,

যশোর জেলার সদর মহকুমায়, নড়াইলের বামপাড়া, জামদিয়া ও তুলারপুর প্রভৃতি এলাকায় কমিউনিস্ট কর্মীরা সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান ঘটায়। এভাবে অমুসলিম সম্প্রদায়ের স্বাভাবিক অন্ধ পাকিস্তান বিদ্বেষকে মূলধন করে পার্টি কমরেডগণ শ্রেণি সংগ্রামের কথা বলে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় সশ্রস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটাবার বহু চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ মুসলিম জনগণের বিন্দুমাত্র আস্থা অর্জন করতে পারেনি।[৬৭] তবে এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, সরকার সবসময়ই কমিউনিস্টদের এসকল বিদ্রোহকে কঠোর হস্তে দমন করেছে।

উল্লেখ্য যে, ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলন শুরু হলে কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীরা তাতে অংশ নেন। এছাড়া ১৯৫০ সালে মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যুবলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টি অংশগ্রহণ করে। এসকল কারণে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ববাংলার) কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে সবসময়ই বেশ সোচ্ছার ছিল। এমতাবস্থায় ১৯৫১ সালের পর পূর্ব পাকিস্তানে (পূর্ববাংলায়) কমিউনিস্ট পার্টি সহিংস বিপ্লবের পথ পরিহার করে সকল সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী শক্তির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে 'জনগণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার আহবান জানায়। এছাড়াও ঐ সময় কমিউনিস্ট পার্টির অধিকাংশ নেতা ছিলেন হিন্দু। যেকারণে মুসলিম জাতীয়তাবাদী জনগণ কমিউনিস্টদের সুনজরে দেখেনি। ফলে সার্বিক পরিবেশ এমন দাঁড়ায় যে, কমিউনিস্টদের প্রকাশ্য কাজ করার কোন উপায় ছিল না। তাই ১৯৫১-৫২ সালে পূর্ব পাকিস্তান (পূর্ববাংলার) কমিউনিস্ট পার্টি আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য জনপ্রিয় সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করার নীতি গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট নেতা-কর্মীরা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের মধ্যে থেকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনসহ বিভিন্ন সরকার বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। ১৯৫২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি কমিউনিস্ট পার্টি 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন' নামে একটি দীর্ঘ সার্কুলার প্রচার করে। এতে ২০ ফেব্রুয়ারি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদের সঙ্গে ধর্মঘট, হরতাল, সভা-সমাবেশে নেতা-কর্মীদের যোগ দেয়ার জন্য আহবান জানানো হয়। ১৯৫২ সালে কমিউনিস্ট কর্মীদের উদ্যোগেই মূলত 'ছাত্র ইউনিয়ন' প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬৮] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পার্টি সমমনাদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করে। উল্লেখ্য যে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির ১০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং তাদের মধ্যে ৪ জন জয়লাভ করেন।[৬৯]

১৯৫৪ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান সরকার কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে কমিউনিস্ট পার্টি একটি আত্মগোপনকারী দল হিসেবে বিবেচিত হয় এবং পরবর্তীতে তারা আওয়ামী লীগ, ১৯৫৭ সালে ন্যাপ প্রতিষ্ঠার পর ন্যাপ এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে তাদের পার্টির কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখে। কমিউনিস্ট সদস্যরা 'পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতি' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে, যার সভাপতি হন মাওলনা ভাসানী আর সম্পাদক হন আব্দুল হক। ১৯৫৮ সালে তারা শ্রমিকদের জন্য 'মজদুর ফেডারেশন' নামে আরেকটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এ সংগঠনটির সভাপতি নির্বাচিত হন মোহাম্মদ তোয়াহ।[৭০]

১৯৬০-এর দশকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, সে প্রভাবে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিও দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৬৬ সালে চীনপন্থী কমিউনিস্টগণ মূল দল ত্যাগ করে কমরেড তোয়াহা ও সুখেন্দু দস্তিদারের নেতৃত্বে 'পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি' (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) নামে একটি নতুন দল গঠন করে। আর রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নীতিকে সমর্থন করে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি হন কমরেড মনি সিংহ।[৭১] তখন থেকে এ দলটি পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মনি সিংহ) নামে পরিচিতি লাভ করে। এ দলটিই বাংলাদেশের আদি কমিউনিস্ট পার্টি। ১৯৭১ সালের পর এ দলটিই 'বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (মনি সিং)' নামে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে। মনি সিং প্রবীণতম কমিউনিস্ট নেতা। তিনি ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। প্রায় ১৬ বছর আত্মগোপনে থেকে তিনি পার্টির কাজ করেন। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সরকার তাকে আটক করে। স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে তিনি রাজশাহী জেল থেকে পালিয়ে যান এবং বিপ্লবী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদে অন্যতম সদস্য হিসেবে কাজ করেন। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি সহিংস বিপ্লবের নীতিতে বিশ্বাসী নয়। তারা মনে করে যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তারা আরো মনে করে যে, বন্দুকের নলে ক্ষমতা আসে না, ক্ষমতা আসে মেহনতী জনগণের বৈপ্লবিক চেতনা ও ঐক্য থেকে। আর কৃষক-শ্রমিকের সচেতনতা না আসা পর্যন্ত সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। নির্বাচনী প্রচারণা ও সংসদীয় রাজনীতির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে এ চেতনা জাগ্রত হতে পারে। তারা আরো মনে করে যে, একটি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জাতীয় গণতান্ত্রিক সরকার সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পূর্বশর্ত। বাংলাদেশের মূল সংবিধান (১৯৭২ সালের সংবিধান) সম্পর্কে দলটির অভিমত ছিল যে, সেটি সমাজতান্ত্রিক সংবিধান নয় এবং বিদ্যমান সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একটি সমাজতান্ত্রিক সংবিধান আশা করাও যায় না।

তবে সংবিধানে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রের মূল নীতি ও লক্ষ্য ঘোষণা হওয়ায় এ দল সন্তোষ প্রকাশ করে।[৭২]

এদিকে ১৯৭১ সালের মধ্যে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) কয়েকটি উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। ১৯৬৮ সালে সর্বপ্রথম এ পার্টিটি দ্বিধাবিভক্ত হয় এবং এর ফলে 'পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি' নামে একটি নতুন দলের সৃষ্টি হয়। অন্যান্য উপদল বা গ্রুপের মধ্যে বিপ্লবীদের পূর্ববাংলা সমন্বয় কমিটি, বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পাটি (হাতিয়ার গ্রুপ) এবং বাংলাদেশ কমিউনিস্ট সংহতি কেন্দ্র উল্লেখযোগ্য। এ উপদলগুলো সনাতনী গণতন্ত্র ও নির্বাচন পদ্ধতির বিরোধী এবং বিপ্লবের নীতিতে বিশ্বাস করতো।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিপ্লবী সরকার কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে কমিউনিস্টদের ভূমিকা নিয়ে নানা ধরনের বিতর্ক রয়েছে। তবে স্বাধীনতা উত্তরকালে কমিউনিস্ট উপদলগুলোকে একত্রিত করে 'প্রগতিবাদী শক্তির' সমন্বয়ে একটি একক কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ চেষ্টা সফল হয়নি। স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশে তিনটি কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে রাজনীতি করতে শুরু করে। সেগুলো হলো : (ক) কমরেড মনি সিং-এর নেতৃত্বে 'বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (মনি সিং)' (খ) অমল সেনের নেতৃত্বে 'বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী)' এবং (গ) দেবেন শিকদারের নেতৃত্বে 'বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি'। শেষ দল দু'টির মধ্যে আদর্শগত বিষয়ে কোন মৌলিক বিরোধ ছিল না। উভয় দলই মনে করতো যে, একমাত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কিন্তু বিপ্লবী রণনীতি বা কৌশল সম্পর্কে দু'দলের মধ্যে পার্থক্য ছিল। বিভিন্ন কারণে বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি ১৯৭৩ সালে আত্মগোপনে চলে যায় এবং শেষ পর্যন্ত বিলীন হয়ে যায়। আর লেনিনবাদী কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশ্যে ও গোপনে পার্টির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে এবং ১৯৮৮ সালে 'কমিউনিস্ট লীগের' সঙ্গে একত্রিত হয়ে নতুন দল গঠন করে।[৭৩]

কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ পার্টিটি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কখনো গোপনে আবার কখনো প্রকাশ্যে পূর্ববাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রেখেছে। বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি (১৯৫৪) এবং সিয়াটো-সেন্টো জোটের বিরোধিতার ক্ষেত্রে

কমিউনিস্ট পার্টি সীমিত শক্তি সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মূলত সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মধ্যে উপলব্ধি জাগানো ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি এদেশে সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রেখেছে।[৭৪] আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কমিউনিস্ট কর্মী হওয়া তখন বেশ সাহসী কাজ ছিল এবং তাদের কাজে বেশ ঝুঁকি ছিল। তাদেরকে বিভিন্ন সময় সরকারের বহু অমানবিক অত্যাচার নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়েছে। অলি আহাদ অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে, তাদের নেতৃত্বের হটকারী নীতির ফলে তাদের দুর্দশা বেড়েছিল।[৭৫] এছাড়াও তাদের নৃেতত্বের আরো বেশ কিছু সমস্যা ছিল।[৭৬]

কৃষক শ্রমিক পার্টি (কেএসপি)

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে কৃষক-প্রজা পার্টির ভরাডুবির পর এ. কে. ফজলুল হক রাজনীতি থেকে নিষ্ক্রিয় হন এবং সরকারি চাকুরীতে (পূর্ববাংলার এ্যাডভোকেট জেনারেল পদে) যোগদান করেন। কিন্তু ১৯৫৪ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে তিনি ১৯৫৩ সালে পুনরায় রাজনীতিতে আসেন। তখন তিনি তার ১৯৩০-এর দশকের দল কৃষক-প্রজা পার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করার কাজে হাত দেন। ১৯৫৩ সালের আগস্ট মাসে কৃষক-শ্রমিক পার্টি গঠিত হয়। মূলত এ পার্টিটি ছিল কৃষক-প্রজা পার্টির নতুন সংস্করণ। এ. কে. ফজলুল হক এ পার্টির সভাপতি নিযুক্ত হন। আর সম্পাদক হন জনাব আবদুল লতিফ বিশ্বাস।[৭৭] মুসলিম লীগ থেকে অনেক হতাশাগ্রস্ত ও সুবিধাবঞ্চিত নেতা-কর্মী কেএসপিতে যোগদান করেন। কেএসপিতে যোগদানকারী মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন : হামিদুল হক চৌধুরী, সৈয়দ আজিজুল হক, আবু হোসেন সরকার, আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ। মূলত কেএসপিতে যোগ দেন মুসলিম লীগের সিনিয়র সদস্যরা, যারা অধিকাংশই ছিলেন প্রবীণ ও সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির।[৭৮] এ পার্টির কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, বিনা খেসারতে জমিদারি ও জায়গীরদারি উচ্ছেদ করা, পাট ও তুলা ব্যবসা জাতীয়করণ করা প্রভৃতি।[৭৯] দল গঠনের পরই আওয়ামী মুসলিম লীগের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্টে দলটি অন্তর্ভুক্ত হয়। উল্লেখ্য যে, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। যুক্তফ্রন্টে আওয়ামী লীগের পরে এ দলটি ছিল দ্বিতীয় শরিক দল। নির্বাচনের পর পার্টি প্রধান ফজলুল হক পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা নির্বাচিত হন। তার নেতৃত্বে ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল পূর্ববাংলায় ৪ সদস্য বিশিষ্ট যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। কিন্তু শরিক দলগুলোর সঙ্গে মতবিরোধের কারণে যুক্তফ্রন্ট ভেঙে যায়। কেন্দ্রীয় জটিল রাজনৈতিক সমীকরণে তার মন্ত্রীসভা (২৯ মে ১৯৫৪ সালে) বাতিল করা হয়। এরপর ১৯৫৫ সালের জুন মাসে কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকারকে পূর্ববাংলায় মন্ত্রীসভা গঠনের

অনুমতি দেয়া হয়। ১৯৫৬ সালের ৫ মার্চ ফজলুল হক পূর্ববাংলার গভর্নর পদে নিযুক্ত হন। এর ফলে দলটি আওয়ামী লীগের যৌথ নির্বাচনী ব্যবস্থা ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির বিরোধিতা করে। দলটি তখন মুসলিম লীগের নিকট মোটামুটি একটি গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। এরপর ১৯৫৬ সালের ৩০ আগস্ট আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রীসভার পতন ঘটে। পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালের ৩১ মার্চ কৃষক-শ্রমিক পার্টির আবু হোসেন সরকার আবার সরকার গঠনের আমন্ত্রণ পান। ইতোমধ্যে ১৯৫৮ সালের ১ এপ্রিল ফজলুল হক গভর্নরের পদ হারান। আবু হোসেন সরকার এরপর ১৯৫৮ সালের ২০ জুন একটি কোয়ালিয়শন মন্ত্রীসভা গঠন করেন। কিন্তু ৩০ জুন তার সে মন্ত্রীসভা আইন পরিষদের অনাস্থা ভোটে পরাজিত হয়।[৮০]

পরিশেষে বলা যায় যে, ক্ষমতার অংশীদারিত্বের দৌড়ঝাঁপে মাঝে-মাঝে এগিয়ে পিছিয়ে থাকলেও ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পর দলটি আর জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। এছাড়া সমাজের উচ্চ শ্রেণির হাতে দলটি নেতৃত্ব থাকায় এ দল সাধারণ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি। ১৯৫৮ সালের পর দলটি কেবল কাগজ কলমে থেকে যায় এবং ধীরে ধীরে এর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড স্তিমিত হয়ে পড়ে।

পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে থাকায় কংগ্রেসের পক্ষে পাকিস্তানে রাজনীতি করার অনুকূল পরিবেশ ছিল না। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পর পূর্ববাংলার কংগ্রেস দলীয় সদস্যরা তাদের পার্টিকে 'পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস' নামে পুনর্গঠিত করেন। ইসলামি দেশ পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা করাই ছিল এ দল গঠনের মূল লক্ষ্য। তখন তফসিলি সম্প্রদায়ের অনেক হিন্দু কংগ্রেসে যোগদান করে। ১৯৪৭- এর পর পাকিস্তানের মতো সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে কংগ্রেসের রাজনীতি করা সহজ ব্যাপার ছিল না। মুসলিম লীগের নেতা-কর্মীদের সাম্প্রদায়িক আচরণ, প্রাদেশিক পরিষদ ও গণপরিষদে কংগ্রেস দলীয় সদস্যদেরকে পাকিস্তানের শত্রু এবং ভারতীয় অনুচর হিসেবে গালমন্দ করা, পত্র-পত্রিকাগুলোতে বিরূপ সমালোচনা প্রভৃতি কারণে পূর্ব পাকিস্তানে (পূর্ববাংলায়) পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টির রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা অত্যন্ত দূরূহ হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে অলি আহাদ উল্লেখ করেছেন যে, "পাকিস্তান সৃষ্টির পর পাক-ভারতের রাজনীতিতে যে গুণগত পরিবর্তন দেখা দেয়, সে বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করে পাকিস্তানের মাটিতে তাদের পক্ষে প্রকাশ্যে কার্যকর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।"[৮১] এমতাবস্থায় পাকিস্তান কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কিরণ শংকর রায় দেশভাগের মাত্র ৮ মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে

চলে যান। তখন শ্রীশাস্ত্র চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেসের নেতৃত্ব হাতে তুলে নেন। এসময় মধ্যবিত্ত হিন্দুদের ব্যাপকহারে দেশত্যাগের ফলে রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেসের সাংগঠনিক কাঠামোও বেশ দুর্বল হয়ে যায়।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকায় আইন পরিষদে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান প্রতিটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ছিল। স্বভাবতই পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ববাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদে এবং প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্যদের ভোটে গঠিত পাকিস্তান গণপরিষদে হিন্দু প্রতিনিধিও ছিল। প্রকৃতপক্ষে এ হিন্দু সদস্যরাই পূর্ববাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদ ও পাকিস্তান গণপরিষদে বিরোধী দলের ভূমিকা পালন করেন। (উল্লেখ্য যে, তখন সকল মুসলমান সদস্য ছিলেন মুসলিম লীগ দলের।) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ দলের ৩৫ জন সদস্য বিরোধী দল হিসেবে খুবই তৎপরতা দেখান। নতুন রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট থাকা ছাড়াও কংগ্রেস বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি এবং যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে সোচ্চার ছিল। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কংগ্রেসের সংসদীয় দলের নেতা কুমিল্লার বাবু ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণের দাবিতে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তার দাবি প্রত্যাখ্যান করা হলে পূর্ববাংলায় ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন সাফল্য লাভ করে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে দলটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পূর্ববাংলায় পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি অনুকরণ করায় এ দলের ৭২ জন হিন্দু প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। পাকিস্তান দ্বিতীয় গণপরিষদেও এরা আসন লাভ করে। ১৯৫৪-৫৮ সাল পর্যন্ত সময়কালে পূর্ববাংলার রাজনীতি ও সরকার ভাঙা-গড়ার খেলায় হিন্দু প্রতিনিধিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগ দলটির অসাম্প্রদায়িক নামকরণ করা হলে কংগ্রেস দলীয় অনেক হিন্দু রাজনীতিবিদ আওয়ামী লীগে যোগ দান করেন। ফলে কংগ্রেস ক্রমশ দুর্বল হয়ে যায়। এরপর ১৯৫৮ সালে সামরিক আইন জারি করে সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পরবর্তীতে সামরিক আইন উঠে গেলে অনেক দলের পুনরুজ্জীবন হলেও পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস-এর কার্যক্রম বিষয়ে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।[৮২]

জামায়াতে ইসলামী হিন্দ

১৯৩০ সালের শুরু থেকেই অবিভক্ত ভারতে ইসলামি আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্যাইয়েদ আব্দুল আ'লা মওদুদীর নেতৃত্বে একটি পৃথক রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা

হয়। মাসিক পত্রিকা 'তারজুমান আল-কোরআন'-এর মাধ্যমে ১৯৩২ সাল থেকেই এ লক্ষ্যে প্রচারকার্য অব্যাহত রাখা হয়। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার পথ' শীর্ষক এক বক্তৃতায় মওলানা মওদুদী মুসলিম লীগের সঙ্গে তার মতপার্থক্যের কথা প্রকাশ করেন এবং ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। সে ঘোষণা অনুযায়ী ২৫ আগস্ট (১৯৪১) লাহোরে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ' নামে একটি নতুন ইসলামি রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়।[৮৩] সম্মেলনে মওলানা স্যাইয়েদ আব্দুল আলা মওদুদীকে নতুন দলের আমির নির্বাচিত করা হয়।

১৯৪৫ সালের ১৯-২১ এপ্রিল পাঞ্জাবের পাঠানকোটে দলের প্রথম নিখিল ভারত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর দলটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ' দিল্লীতে এবং 'জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান' লাহোরে দলের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। দলের প্রতিষ্ঠাতা আমীর মওলানা মওদুদী পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন।[৮৪] দলটি ইসলামি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের বিরোধিতা করে।[৮৫] কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে তারা তা মেনে নেয়। দেশভাগের প্রথম দিকে জামায়াতে ইসলামী দলটি সামাজিক কর্মকাণ্ড ও ইসলামি জ্ঞান চর্চার কর্মসূচি গ্রহণ করে। এভাবে একটি সমর্থকগোষ্ঠী তৈরী করে তারা ধীরে ধীরে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপৃত হয়।

এ দলটি ছিল মূলত একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক দল।[৮৬] ১৯৪৮ সালে 'কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র' প্রনয়ণের দাবিকে কেন্দ্র করে দলটি পাকিস্তানের রাজনীতিতে আবির্ভূত হয়। তবে মওদুদী পাকিস্তানে বিতর্কিত হন ১৯৫৩ সালে। ১৯৫৩ সালে তিনি কাদিয়ানী বিরোধী একটি উস্কানীমূলক বক্তৃতা প্রদান করেন এবং এর ফলে সেখানে একটি ভয়ানক দাঙ্গা সংঘটিত হয়। সে দাঙ্গায় শত-শত কাদিয়ানীকে হত্যা করা হয়। এ নির্মম হত্যাকাণ্ডের জন্য তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরবর্তীতে এর বিচার স্বরূপ আদালত তাকে ফাঁসির রায়ে দণ্ডিত করেন। কিন্তু তিনি গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের কাছে ক্ষমা প্রার্থণা করে জেল থেকে মুক্তি পান।[৮৭] উল্লেখ্য যে, সৌদি আরব ঐ সময় তার মুক্তির ব্যাপারে মধ্যস্থতা করে।

পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে জামায়াতে ইসলামী তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে পরিচালনা করতে শুরু করে। ১৯৫৬ সালে মওলানা আব্দুর রহীমকে প্রাদেশিক

ভারপ্রাপ্ত আমির এবং গোলাম আযমকে সহকারী সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়। গোলাম আযম ১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমির নির্বাচিত হন। আর ১৯৫৬-১৯৬৮ সাল পর্যন্ত মওলানা আব্দুর রহীম পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমির হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি পরবর্তীতে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির নির্বাচিত হয়েছিলেন।[৮৮]

উল্লেখ্য যে, ১৯৫৬ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রথম বারের মত জামায়াতে ইসলামী প্রধান মওলানা মওদুদী পূর্ব পাকিস্তানে সাংগঠনিক সফরে আসেন। এ সফরকালে তিনি বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা সদরে জনসভা ও সুধি সমাবেশে বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ বছর জামায়াতের উদ্যোগে ঢাকায় আয়োজিত 'ইসলামি শাসনতন্ত্র সম্মেলনে' চারটি দাবি উপস্থাপন করা হয়। দাবিগুলো ছিল নিম্নরূপ: (১) পাকিস্তানকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা; (২) রাষ্ট্রপতির পদটি মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণ; (৩) পূর্ববাংলাকে পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ এবং (৪) পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা।[৮৯]

পাকিস্তানের নির্বাচনী রাজনীতিতে দলটি প্রথম সফলতা লাভ করে ১৯৫৮ সালের করাচি মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের নির্বাচনে এক ডজনেরও বেশি আসন লাভ করার মাধ্যমে। এটি একটি ধর্মীয় আদর্শ ভিত্তিক দল হওয়ায় এবং দলীয় নেতা-কর্মীদের কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলা মানতে হয় বিধায় দলটি আপামর জনগণের সমর্থন অর্জন করতে পারেনি। এ দলের সদস্যপদ লাভ করতে হলে দলের নির্দেশিত মত ও পথ সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হয় বিধায় এ দলের সদস্য সংখ্যাও পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়নি। ১৯৫৭ সালে পাকিস্তানে এ দলের মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ১২৭১ জন। দলের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য দলের সদস্যদেরকে নিয়মিত চাঁদা, জাকাত, কোরবানির পশুর চামড়া, অনুদান প্রভৃতি দিতে হয়।[৯০]

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী দলটি অংশগ্রহণ করেনি, বরং তারা পাকিস্তানের নির্বাচন ব্যবস্থাকে অনৈসলামিক বলে অভিহিত করে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী- এর আমির চৌধুরী আলী আহমদ খান নির্বাচন পদ্ধতির সমালোচনা করে বলেন- 'ইহা দেশে অসাধুতার বিষ ছড়াইতে সাহায্য করিবে। ধর্মনিরপেক্ষতা বর্তমান বিশ্বের সকল অনর্থের মূল'। এছাড়া তারা এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট গঠনের পদ্ধতিরও সমালোচনা করে এবং মুসলিম লীগকে সমর্থন প্রদান করে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সরকার প্রণীত সংবিধান পূর্ববাংলাবাসীকে খুশি করতে

পারেনি। পূর্ববাংলায় এর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। জামায়াতে ইসলামী এ সংবিধানের কিছু বিষয় পরিবর্তন করে তা পুনঃপ্রবর্তনের পক্ষে মত প্রকাশ করে। ১৯৬১ সালে জায়ামাতে ইসলামী দলটি আইয়ুব খান প্রণীত পারিবারিক আইনকে ইসলাম বিরোধী বলে আখ্যায়িত করে আইয়ুব বিরোধী অবস্থান গ্রহণ করে। ১৯৬৫ সালে সম্মিলিত বিরোধী দলের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে দলটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন করে।

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উত্থাপিত ৬ দফা কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে যখন পূর্ববাংলাবাসী তাদের 'প্রাণের দাবি ৬ দফা'; 'বাঁচার দাবি ৬ দফা' বলে শ্লোগান তুলছে তখন জামায়াতে ইসলামী দলটি এর কঠোর সমালোচনা করে বলে যে, 'ছয়দফা কর্মসূচি পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করবে'। পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর আমির অধ্যাপক গোলাম আযম আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ৬ দফা কর্মসূচির সমালোচনা করে বলেন যে, 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি হুমকি স্বরূপ'। জামায়াতে ইসলামী দলটি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সমস্যার সমাধান সমাজতান্ত্রিক কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ কর্মসূচির দ্বারা সম্ভব নয়, বরং কেবলমাত্র ইসলামি অর্থনীতিই পারে পাকিস্তানের সকল সমস্যার সমাধান করতে।[৯১]

১৯৬৮-৬৯ সালের গণআন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী দলটি 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' (ডাক)-এর শরিক দল হিসেবে আইয়ুব বিরোধী ভূমিকা রাখে। কিন্তু ১৯৬৯-৭০ সালে বাঙালির স্বায়ত্তশাসন ও সমাজতন্ত্রের দাবির বিরুদ্ধে দলটি আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করে। পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে দলটির অভিমত ছিল যে, বিভিন্ন প্রদেশকে এতটুকু স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা উচিত যা দেশের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্ট করবে না। পাকিস্তানের অখণ্ডতা, শক্তিশালী কেন্দ্র এবং ইসলামি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি নিয়ে জামায়াতে ইসলামী দলটি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে 'দাঁড়িপাল্লা' প্রতীক নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে দলটির ৬৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় যে, দলটির মাত্র ৪ জন প্রার্থী পশ্চিম পাকিস্তান হতে জয় লাভ করেছেন। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে দলটি মাত্র ৬% ভোট পায়, কিন্তু কোন আসন লাভ করতে পারেনি। আর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে দলটি মাত্র একটি আসনে জয়লাভ করে।[৯২] এ থেকে বোঝা যায় যে, পূর্ববাংলার মানুষ কট্টরপন্থী ইসলামি রাজনীতিতে কোন প্রকার সমর্থন বা পৃষ্ঠাপোষকতা প্রদান করতে কখনোই আগ্রহী ছিল না।

এ দলটি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের চরম বিরোধিতা করে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পক্ষ অবলম্বন করে। তারা মুক্তযুদ্ধকে ভারতীয় হস্তক্ষেপ বলে আখ্যা করে। জামায়াতে ইসলামী দলটি তখন মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী 'শান্তি কমিটি' 'রাজাকার', 'আল-বদর' ও 'আল-শামস' বাহিনী গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য যে, রাজাকার বাহিনীতে প্রায় ১০০০০০ লোক ভর্তি হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক গোষ্ঠী বিভিন্ন বাহিনী দেশের অসংখ্য নিরীহ মানুষকে হত্যা, ধর্ষণসহ নানারকম মানবতা বিরোধী অপরাধে যুক্ত ছিল।[৯৩] স্বাধীনতার প্রাক্কালে যে অসংখ্য প্রগতিশীল বাঙালি বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়, তাতে আল-বদর, আল-শামস বাহিনী মুখ্য ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ সরকার জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

নেজামে ইসলামী

১৯৫৩ সালের ১ আগস্ট 'নেজামে ইসলামী' পার্টিটি গঠন করা হয়। দলের সভাপতি ও সেক্রেটারি ছিলেন যথাক্রমে মওলানা হাফেজ আতাহার আলী এবং জনাব আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী। যদিও মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত উলামাবৃন্দ এ দলের সদস্য হন, কিন্তু ফরিদ আহমদ এবং সৈয়দ কামরুল আহসানের মতো ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত কিছু ব্যক্তিত্ব এ দলে যোগ দেন। মূলত মুসলিম লীগের মতো এ দলের নেতৃত্বেও উচ্চবিত্ত মুসলমানরা অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুসলিম লীগের সঙ্গে এ দলের আদর্শিক পার্থক্য খুব বেশি ছিল না। এ দলের প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল- পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে দেশের সার্বিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা। ১৯৫৩ সালে কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলামী যৌথভাবে ১০ দফা দাবিনামা উপস্থাপন করে। তাদের দাবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- (১) দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের আজাদীর প্রতি পূর্ণ সমর্থন, (২) কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন এবং (৩) শরীয়ত বিরোধী সকল আইন বাতিল। তবে ১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে নেজামে ইসলামী পার্টিটি মুসলিম লীগ বিরোধী জোট যুক্তফ্রন্টের শরিক দল হিসেবে অংশগ্রহণ করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ২০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ১২টিতে নেজামে ইসলামী পার্টির প্রার্থীরা জয়লাভ করেন। উল্লেখ্য যে, যুক্তফ্রন্টের শরিক দল হওয়ায় তারা এ সাফল্য লাভ করতে পারে। নির্বাচনের পর ফজলুল হক মন্ত্রীসভায় এ দলের সেক্রেটারি জেনারেল আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী মন্ত্রী হিসেবে স্থান পান। ফজলুল হকের সঙ্গে শরিক দল আওয়ামী লীগের মতবিরোধ হলে নেজামে ইসলামী ফজলুল হকের পক্ষ নেয়। ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় নেজামে ইসলামী, মুসলিম লীগ (কাউন্সিল),

আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও এনডিএফ একত্রিত হয়ে কপ (কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টিস) [COP (Combined Oppsition Parties)] গঠন করে এবং ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন প্রদান করে। পরবর্তীতে দলটি আর কোন প্রকার সামাজিক ভিত্তি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।[৯৪]

খেলাফতে রব্বানী পার্টি

১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি মতান্তরে ২০ এপ্রিল খেলাফতে রব্বানী পার্টিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিও মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি ধর্মভিত্তিক দল। এ পার্টির আহবায়ক ছিলেন জনাব সোলায়মান খান। খেলাফতে রব্বানী পার্টির অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল শোষণহীন ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা। এছাড়া বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন, জমির উপর থেকে খাজনা মওকুফ, সবার জন্য কর্মসংস্থানের দাবি প্রভৃতি এ দলের অন্যতম কর্মসূচি ছিল। এ পার্টির আহবায়ক ঘোষণা করেন যে, যেহেতু তৎকালীন নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনে ব্যর্থ হয়েছে এবং যে উদ্দেশ্যে পাকিস্তান সৃষ্টি হল সে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠা যেহেতু মুসলিম লীগকে দিয়ে সম্ভব নয়, তাই খেলাফতে রব্বানী পার্টিটি প্রতিষ্ঠা করা হলো।[৯৫] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে দলটি যুক্তফ্রন্টের বাইরে ছিল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে এ দলের মাত্র একজন সদস্য নির্বাচিত হন। এর পরবর্তীতে দলটি অস্তিত্ব সংকটে পড়ে।

গণআজাদী লীগ

মুসলিম লীগের প্রতি বিদ্বেষবশত অলি আহাদ, কমরুদ্দিন আহমদ, তাজুদ্দিন আহমদ, নইমুদ্দিন আহমদ ও মোহাম্মদ তোয়াহা ধারাবাহিকভাবে আলাপ আলোচনা করে ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে 'গণআজাদী লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। কমরুদ্দিন আহমদকে দলের আহ্বায়ক নিযুক্ত করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক পৃথক রাষ্ট্র গঠন ও বাঙালি জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষাই ছিল দলটির মূল উদ্দেশ্য। এ প্রসঙ্গে অলি আহাদ বলেন, "লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়ন কল্পনায় আমরা পূর্ব পাকিস্তানকে এক ভিন্ন রাষ্ট্রজ্ঞান করিয়া পূর্ব পাকিস্তান ভিত্তিক ঘোষণাপত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করিয়াছিলাম। যতটা ছিল সংকল্প, তাহার চাইতে বহুগুণ বেশি ছিল বাঙ্গালী বিদ্বেষী কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আক্রোশ ও রাগের অভিব্যক্তি।"[৯৬] কিন্তু দলের আহবায়ক কমরুদ্দিন আহমদের কর্মবিমুখ নিস্ক্রিয় ভূমিকা, কারাগার ভীতি ও ত্যাগী মনোভাবের অভাব, সমগ্র দেশে উৎকট ও বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া এবং তদানিন্তন মুসলিম লীগ সরকারের কঠোর দমন নীতির কারণে দলটি বেশি দিন স্থায়ী হতে পারেনি।[৯৭]

পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ

পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দের মধ্যে দু'টি ধারা বিদ্যমান ছিল। একদিকে ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দিন ও আকরম খাঁ, অন্যদিকে ছিলেন আবুল হাশিম ও সোহরাওয়ার্দী। সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশিম ভারতে অবস্থানের কারণে তাদের অনুসারিদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা কাজ করে। উল্লেখ্য যে, মওলানা আকরম খাঁ বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলে উক্ত শূন্য আসনের নির্বাচনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিম ও ফজলুল হকের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে বঙ্গীয় প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আবুল হাশিমকে সমর্থন দেননি। আর ১৯৪৭ সালের ৫ আগস্ট পূর্ববঙ্গ মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি নেতা নির্বাচনে খাজা নাজিমুদ্দিনের বিরুদ্ধে এইচ.এস. সোহরাওয়ার্দীকে আবুল হাশিম সমর্থন দেননি। ফলে সোহরাওয়ার্দী-হাশিম জোট বিভক্ত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় হতাশাগ্রস্থ কর্মীদের পুনঃজাগরণের জন্য তরুণ নেতা শামছুল হক বিভাগোত্তর রাজনীতিতে যুব সমাজের ভূমিকা নির্ধারণের জন্য এক সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব করেন। সে প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের ৬-৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান খান সাহেব আবুল হাসনাতের বেচারাম দেউরির বাসভবনের হল রুমে উক্ত যুব সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে 'পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৫ সদস্য বিশিষ্ট পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের সভাপতি হন তসাদ্দুক আহমদ চৌধুরী।[৯৮] ঢাকা, রাজশাহী, ময়মনসিংহসহ বিভিন্ন জেলায় এ সংগঠনটির শাখা খোলা হয়। কিন্তু ব্যাপক পুলিশি নির্যাতন আর মুসলিম লীগের উগ্র সমর্থকদের অত্যাচার নির্যাতনের কারণে ১৯৪৮ সালের শেষ দিকে সংগঠনটির বিলুপ্তি ঘটে।[৯৯] পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের ১২ দফা কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপঃ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করে কৃষককে জমির মালিক করা এবং কৃষি ঋণ মওকুফ করে দেয়া, বড় বড় শিল্প-ব্যাংক-ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলো জাতীয়করণ করা, শ্রমিকদের কাজের সময় আট ঘণ্টা নির্ধারণ করা, বিনা ব্যয়ে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা, রাষ্ট্রীয় খরচে স্বাস্থ্য এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।[১০০]

পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ

কমিউনিস্ট নেতাদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টায় ১৯৫১ সালের ২৭ ও ২৮ মার্চ ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান যুব সম্মেলন আহ্বান করা হয়। যুব সম্মেলনের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগ বেশ সক্রিয় ছিল এবং তারা এ বিষয়ে বেশ কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করে। এসময় ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। উদ্যোক্তারা

বুড়িগঙ্গা নদীর বুকে নৌকায় হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে সম্মেলনের কাজ সমাপ্ত করেন। সম্মেলনে 'পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত সম্মেলনে জনাব মাহমুদ আলীকে সভাপতি ও জনাব অলি আহাদকে সেক্রেটারি নির্বাচিত করা হয়। এছাড়া উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন- আব্দুস সামাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, কে জি মোস্তফা, আব্দুল গফ্ফার চৌধুরী, তাজউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ। যুবলীগের আয়ুষ্কাল স্বল্প হলেও প্রথমদিকে সংগঠনটি প্রচণ্ড প্রাণ শক্তি নিয়ে কাজ শুরু করেছিল। পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক আন্দোলনে তারা ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছিল। লবণের অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে তারা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।[১০১] এছাড়া ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে যুবলীগ বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। বলা হয়ে থাকে যে, ভাষা আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্ব ছিল যুবলীগের নেতৃবৃন্দের হাতে।[১০২] এরপরে এ দলের অনেক নেতা-কর্মী জেল-জুলুমের শিকার হন, আবার অনেকে আত্মগোপনে চলে যান। ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থান পর্যন্ত কোনরকমে টিকে থাকলেও পরবর্তীতে যুবলীগের কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা দেখা দেয় এবং ধীরে ধীরে পার্টিটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।[১০৩] উল্লেখ্য যে, যুবলীগের প্রথম ঘোষণাপত্রে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর চরিত্র সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছিল।[১০৪] ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, সামন্তবাদ বিরোধিতা, বিশ্বশান্তি, গণতন্ত্র, সকলের জন্য চাকুরির সুযোগ প্রভৃতি ছিল এ সংগঠনের মূল দাবি। উল্লেখ্য যে, যুবলীগ প্রথমে উপর্যুক্ত দাবিসহ মোট ১৪ দফা দাবিনামা ঘোষণা করেছিল।[১০৫]

গণতন্ত্রী দল

১৯৫২ সালের ৩১ ডিসেম্বর (মতান্তরে ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে) 'গণতন্ত্রী দল' গঠন করা হয়। হাজী মোহাম্মদ দানেশকে গণতন্ত্রী দলের সভাপতি ও মাহমুদ আলীকে সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়। এ দলটি ছিল মূলত বামপন্থীদের একটি সংগঠন। কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগেই এ দলটি গঠন করা হয় এবং দলটি শুধু পূর্ব পাকিস্তানেই সীমিত ছিল। গণতন্ত্রী দল গঠনের উদ্দেশ্য ছিল যেসব কমিউনিস্ট পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে কাজ করতে অনাগ্রহী ছিলেন, কিংবা হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ার কারণে যাদের পক্ষে আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেয়া সম্ভব ছিল না তাদেরকে এ দলে সম্পৃক্ত করা।[১০৬] এ দলে সকল ধর্মাবলম্বীদের সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল। এ দলের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল- সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদের অবসান ঘটানো, বিদেশি মূলধন বাজেয়াপ্ত করা, ব্যাংক ও ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলো জাতীয়করণ করা, বিনা খেসারতে জমিদারী প্রথা বাতিল করা এবং কৃষকদের মধ্যে জমি বন্টন করা।[১০৭] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের শরিক দল হিসেবে এ দলের ১০ জন প্রার্থীর সকলেই জয়লাভ করেন। কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট পার্টি তার

প্রকাশ্য দল গণতন্ত্রী দল ভেঙে দেয়। ফলে এ দলের নেতা-কর্মীরা অনেকেই আওয়ামী লীগে যোগদান করেন।[১০৮]

এছাড়া ১৯৪৭ সালে দেশ বিভক্তির পর থেকে যেসকল ছাত্র সংগঠন পূর্ববাংলার জনগণের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য লড়াই-সংগ্রাম করেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ' (পরে ছাত্রলীগ) (৪ জানুয়ারি ১৯৪৮), 'ছাত্র ফেডারেশন' এবং 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন' (২৬ এপ্রিল ১৯৫২)। এছাড়া 'ছাত্র এসোসিয়েশন' (১৩ জানুয়ারি ১৯৪৮) এবং 'ছাত্রী সংঘ' (১৯৪৮) নামে দু'টি সংগঠনও পূর্ববাংলার জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করেছে।[১০৯]

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশে যেসকল রাজনৈতিক দল সক্রিয়ভাবে তাদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে, তাদের মধ্যে মুসলিম লীগ ও মুসলিম লীগের তিনটি উপদল (কনভেনশন মুসলিম লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও কাইয়ুম মুসলিম লীগ) মুসলিম জাতীয়তাবাদের নামে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখার স্বার্থে পূর্ববাংলার জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপেরই বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। এছাড়া পাকিস্তানি শাসনামলে পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ দলগুলো কখনো কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। আর ধর্মপন্থী অন্যতম প্রধান দল জামায়াতে ইসলামী ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর থেকে পূর্ববাংলার জনগণের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সবসময়ই নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। তারা ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিরোধিতা করেছে এবং ১৯৬৬ সালে বাঙালির মুক্তির সনদ ৬ দফা কর্মসূচিরও বিরোধিতা করেছে। এভাবে পূর্ববাংলার জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্বে বিশেষ করে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তারা কোন ইতিবাচক কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। এজন্য অবশ্য ১৯৭০ সালের নির্বাচনে দলটি পূর্ববাংলা থেকে কোন আসনে জয়লাভ করতে পারেনি। এ নির্বাচনের ফলাফল থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, দলটি পূর্ববাংলার জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে কখনো সম্পৃক্ত ছিল না। বরং সর্বক্ষেত্রে তারা আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধুর কার্যক্রমে নানাভাবে ব্যাঘাত সৃষ্টি করেছে। আর ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হলে তারা এ যুদ্ধকে ভারতীয় হস্তক্ষেপ বলে অভিহিত করে এবং পাকিস্তানের সামরিক সরকারকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী 'শান্তি কমিটি', 'রাজাকার', 'আল-বদর' ও 'আল-শামস' বাহিনীর মাধ্যমে যুদ্ধকালীন নয় মাস দলটি দেশব্যাপী হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি মানবতা বিরোধী

অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। আর মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত অন্য দু'টি দল নেজামে ইসলামী ও খেলাফতে রব্বানী পার্টি সবসময় পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসনের বিপক্ষে এবং পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছে।

আর পূর্ববাংলার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে বিভিন্ন পর্যায়ের আন্দোলন-সংগ্রামে সার্বক্ষণিক যে দলটি তার কর্মতৎপরতা অব্যাহত রেখেছে সে দলটি হলো আওয়ামী লীগ। উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগ দলটিই ছিল পূর্ববাংলা ভিত্তিক রাজনৈতিক দল। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি, '৬৯-এর গণআন্দোলন, '৭০-এর নির্বাচন এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ এর প্রতিটি পর্যায়েই দলটি যথাযোগ্য নেতৃত্বে প্রদানে সক্ষম হয়েছে। কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা, সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা, নারীর অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে দলটি পূর্ববাংলার জনগণের পক্ষে অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করেছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের দিক-পরিবর্তনকারী ফলাফল বিশ্লেষণ করলেই প্রমাণিত হয় যে, দলটি ছিল বাংলার জনগণের প্রাণের দল, ভালোবাসার দল, আস্থা ও নির্ভরতার দল। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্ব পর্যন্ত বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার অসাধারণ প্রজ্ঞা, কঠোর পরিশ্রম ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দ্বারা এ দলকে পূর্ববাংলার জনগণের একক জনপ্রিয় সংগঠনে পরিণত করেন। মূলত দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধিকারের প্রশ্নে বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১১০] শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত মুজিবনগর সরকারের পরিচালনায় দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়।

এছাড়া ন্যাপ (ভাসানী) ও ন্যাপ (মোজাফফর) স্বাধীনতাপূর্ব পূর্ববাংলার জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। পূর্ববাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের বিভিন্ন লড়াই-সংগ্রামের এ দু'টি দল সর্বদাই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। আওয়ামী লীগকেও তারা বিভিন্ন পর্যায়ের আন্দোলন-সংগ্রামে নানাভাবে সহায়তা করেছে। এছাড়া পূর্ববাংলায় বাম ধারার যেসকল রাজনৈতিক দল বাঙালির অধিকার আদায়ের জন্য বিভিন্নভাবে কাজ করেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- কমিউনিস্ট পার্টি, পাকিস্তান ন্যাশনাল কংগ্রেস, গণআজাদী লীগ, গণতন্ত্রী দল প্রভৃতি। এ দলগুলোর মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও পূর্ববাংলার মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সবসময় নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছে। স্বাধীনতা যুদ্ধে

কমিউনিস্টদের (চীনপন্থী কমিউনিস্টদের) ভূমিকা নিয়ে নানা ধরনের বিতর্ক রয়েছে। তবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বিপ্লবী সরকার কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সামন্তবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি সবসময় সোচ্চার ছিল। সর্বোপরি এদেশে ধর্মনিরপেক্ষ-অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির গতিধারা অব্যাহত রাখতে কমিউনিস্ট পার্টি সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রেখেছে। এছাড়া পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ ও পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ নামক সংগঠন দু'টিও পূর্ববাংলার জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে নানাভাবে কাজ করেছে।

তথ্যসূত্র

১. হাসানুজ্জামান চৌধুরী, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৪০, ৪৬

২. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৩৬-৩৭

৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

৪. মোজাম্মেল হক, *বৃটিশ-ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস (১৮৫৭-১৯৪৭)*, বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ১৮৩

৫. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-৮*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৭৭

৬. মোজাম্মেল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪

৭. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮

৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮-৩৯

৯. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১০, (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৬০

১০. এ কে এম ইদ্রিস আলী, "মুসলিম সমাজের উপর বঙ্গভঙ্গ রদের প্রভাব", ওয়াকিল আহমদ ও হাবিবা খাতুন (সম্পাদিত), *ইতিহাস*, (বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা), উনচল্লিশ বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র, ১৪১২, (বঙ্গভঙ্গ শতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা ২০০৬), বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ৭-১৬; মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, "বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫ : প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি", ওয়াকিল আহমদ ও হাবিবা খাতুন (সম্পাদিত), *ইতিহাস*, (বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা), উনচল্লিশ বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র, ১৪১২, (বঙ্গভঙ্গ শতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা ২০০৬), বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২৫-৩২

১১. এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭-১৯৪৭*, ইষ্টার্ন প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ১৯৬-১৯৮; মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন [১৭০৭-১৯৪৭]*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯. পৃ. ১২৩-১২৫; মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, *ভারত স্বাধীন হল*, (পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ), (বাংলা অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়), ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৮৬-৮৭

১২. হারুন-অর-রশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫

১৩. Mohammad Seraj Mannan, *The Muslim Political Parties in Bengal 1936-1947*, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1987. p.8; প্রেমেন আড্ডি ও ইবনে আজাদ,

বিভাগপূর্ব বাংলার রাজনীতি ও সমাজ, (বাংলা অনুবাদ : আনোয়ারুল হক), মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৫১-৫২

১৪. জিয়াউল হক, "পাকিস্তান ও ইসলামী মতাদর্শ", হাসান গারদেজি ও জামিল রশিদ (সম্পাদিত), *পাকিস্তান ধর্ম ও দ্বন্দ্বের রাজনীতি*, (বাংলা অনুবাদ : তানভীর মোকাম্মেল), দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১৯৮৬, পৃ. ৬২ (বিস্তারিত দেখুন, পৃ. ৬২-৬৫)

১৫. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-৮, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭

১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭-২৭৮

১৭. Choudhury Khaliquzzaman, *Pathway to Pakistan*, Longmans, London, 1961, pp. 235-236

১৮. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-৮, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৮

১৯. উদ্বৃত, জিয়াউল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭

২০. মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩৬৩-৩৬৪

২১. আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২৪৬

২২. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫

২৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৫-৩৬৬

২৪. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৯

২৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮১-৩৮২

২৬. বিস্তারিত দেখুন, হারুন-অর-রশিদ, *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬, পৃ.১-৭; আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস [১৯৪৯-১৯৭১]*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৯-১৫

২৭. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

২৮. এ মেনিফেস্টো সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : ১ম খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১১৮-১২০

২৯. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮২

৩০. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

৩১. Shyamoli Ghosh, *The Awami League 1947-1971*, Academic Publishers, Dhaka, 1990, p. 21; এ বিষয়ে আরো দেখুন, হারুন-অর-রশিদ, মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮-৩৯

৩২. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, *প্রাগুক্ত*, ১৭৬

৩৩. মো. মাহাবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৮-৩৬৯

৩৪. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮২

৩৫. আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১-২৫৩

৩৬. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-১*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১১০-১১১

৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১; আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২ (বিস্তারিত দেখুন, পৃ. ৮২-৮৯)

৩৮. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

৩৯. Shyamoli Ghosh, *op.cit.*, pp. 103-108; আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১-১৫১, ২০১

৪০. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সম্পর্কে দেখুন, আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২-১৬৬

৪১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬-১৭৫; আবুল মনসুর আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৯-৪৮০

৪২. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮৩; আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৯

৪৩. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : ২য় খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৭০০-৭০২

৪৪. মুজিব নগর সরকার সম্পর্কে দেখুন, মোনায়েম সরকার, "বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস মার্চ-ডিসেম্বর ১৯৭১", সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ; মোনায়েম সরকার; নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস [১৯৪৭-১৯৭১]*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২৩৭-২৩৮

৪৫. এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, হারুন-অর-রশিদ, *আওয়ামী লীগের ৫০ বছর সংগ্রামের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস*, সামিট প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩-১৯

৪৬. Talukder Moniruzzaman, *Radical Politics And The Emergence of Bangladesh*, Mowla Brothers, Dhaka, 2003, pp. 33-34; Rangalal Sen, *Political Elites in Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka, 1986, pp. 156-157; মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৩-৩৭৪

৪৭. Talukder Moniruzzaman, *Ibid*, p. 34; Rangalal Sen, *Ibid*, p. 157; হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১১

৪৮. Shamsul I Khan; S. Aminul Islam; M. Imdadul Haque, *Political Culture, Political Parties and the Democrati Transition in Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka, 2008, p. 79; Rangalal Sen, *Ibid*, p. 157

৪৯. Shamsul I Khan; S. Aminul Islam; M. Imdadul Haque, *Ibid*, p. 79; সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-১, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬

৫০. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১২

৫১. Talukder Moniruzzaman, *op.cit.*, p. 35; মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৪

৫২. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : ২য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৩৪

৫৩. Shamsul I Khan; S. Aminul Islam; M. Imdadul Haque, *op.cit.*, pp. 79-80

৫৪. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-৫,* বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৮৬; সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-৯,* বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৮

৫৫. ন্যাপ ভাসানী সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, *যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ১৮-২৪

৫৬. Shamsul I Khan; S. Aminul Islam; M. Imdadul Haque, *op.cit.*, pp. 79-80; সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-৫, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬

৫৭. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৭-৩৯৮

৫৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৮-৩৯৯

৫৯. Shamsul I Khan; S. Aminul Islam; M. Imdadul Haque, *op.cit.*, p. 83

৬০. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১

৬১. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০২

৬২. অলি আহাদ, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫,* [সংশোধিত ও বর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ], বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি:, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৯৯

৬৩. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০২

৬৪. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১-১৮২

৬৫. এসকল সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড সম্পর্কে দেখুন, অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯-১০০

৬৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯-১০১

৬৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০

৬৮. Shamsul I Khan; S. Aminul Islam; M. Imdadul Haque, *op.cit.*, p. 83; আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০২

৬৯. Talukder Moniruzzaman, *op.cit.*, pp. 32-33

৭০. *Ibid*, p. 35; Shamsul I Khan; S. Aminul Islam; M. Imdadul Haque, *op.cit.*, p. 84

৭১. Shamsul I Khan; S. Aminul Islam; M. Imdadul Haque, *Ibid*, pp. 84-85

৭২. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৪

৭৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৩

৭৪. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২

৭৫. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩

৭৬. এ বিষয়ে আরো দেখুন, বের্নার-অঁরি লেভি, *অবিকশিত জাতীয়তাবাদ ও অঙ্কুরে বিনষ্ট বিপ্লবের পটভূমিতে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হচ্ছিল*, নূর অফসেট প্রেস, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৪৭-১৬১ (বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা : শিশির ভট্টাচার্য্য)

৭৭. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭, ১৪২

৭৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৬-৩৭৭

৭৯. হাসানুজ্জামান, *বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের চেতনা ও মতাদর্শিক বিকাশ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৪৮

৮০. বিস্তারিত দেখুন, মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯-১৩৬

৮১. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯

৮২. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৭-৩৭৮

৮৩. Hafeez Malik, *Moslem Nationalism in India and Pakistan*, Public Affairs Press. Washington. D.C., 1963, p. 278; সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-৪*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ২৬

৮৪. মো. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, *বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির তিন দশক (১৯৭১-২০০০)*, অসডার পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৯১; সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-৪, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২৬

৮৫. Hafeez Malik, *op.cit.*, p. 275

৮৬. জামায়াতে ইসলামী দলটির নীতি আদর্শ সম্পর্কে দেখুন, মো. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০১-১০৪

৮৭. Shamsul I Khan; S. Aminul Islam; M. Imdadul Haque, *op.cit.*, p. 61; অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৫

৮৮. Md. Monoar Kabir Bhuian, *Polities and Development of the Jamaet-e-Islami Bangladesh*, AH Development Publishers House, Dhaka, 2006, p.63; পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী-এর নেতৃত্ব সম্পর্কে দেখুন, মো. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০০-১০১

৮৯. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২১

৯০. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৯

৯১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৯

৯২. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২১

৯৩. Shamsul I Khan; S. Aminul Islam; M. Imdadul Haque, *op.cit.*, pp. 62-63

৯৪. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৮; শাহেদ ইকবাল মো. মাহবুব-উর-রহমান, *বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি : সমস্যা ও সম্ভাবনা*, অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ২৫

৯৫. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭-১১৮, ৩৭৮

৯৬. অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

৯৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫-৩৬

৯৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪-৩৫

৯৯. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮

১০০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২-১০৩; হাসানুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

১০১.আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

১০২. Shamsul I Khan; S. Aminul Islam; M. Imdadul Haque, *op.cit.*, p. 83

১০৩. বদরুদ্দীন উমর, *বাংলাদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমস্যা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ১৫-১৬

১০৪. হাসানুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭

১০৫. যুবলীগের ১৪ দফা দাবি সম্পর্কে দেখুন, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২-২১৩

১০৬. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭২; অলি আহাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪

১০৭. Rangalal Sen, *op.cit.*, p. 88

১০৮. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৩

১০৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৫-৩৬০

১১০. এ বিষয়ে দেখুন, শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০১২, পৃ. ২৯৩-৩০০ (বিস্তারিত দেখুন, পৃ. ১-২৮৮); হারুন-অর-রশিদ, *বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু*, সুমি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ঢাকা, ১৯৯৬,পৃ. ১১-২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহান মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের ভূমিকা

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে স্বাধীনতা পূর্বকালীন সময়ে (১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পূর্ব থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত) পূর্ববাংলায় যে সকল রাজনৈতিক দল তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল, সে সকল দলের পরিচয়, চরিত্র, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে পূর্ববাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের ভূমিকা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হবে। মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় এবং পূর্ববঙ্গ (বর্তমান বাংলাদেশ) পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। যদিও লাহোর প্রস্তাবের মর্মার্থ ছিল- ভারতকে ভাগ করে উত্তর–পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত ভৌগোলিকভাবে সংলগ্ন মুসলিম প্রধান এলাকাগুলো নিয়ে পৃথক-পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে। আর সেখানে অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলো পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত হবে।[১] কিন্তু ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ দলীয় বিধায়কদের সম্মেলনে লাহোর প্রস্তাবের সংশোধন করে বলা হয় যে, ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাসমূহ যথা-পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান, সীমান্ত প্রদেশ এবং বাংলা ও আসামকে নিয়ে পাকিস্তান নামক একটি একক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।[২] পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান ১১০০ মাইল বিদেশি ভূখণ্ড দ্বারা বিচ্ছিন্ন ছিল। শুধু ধর্মীয় মিল ছাড়া এ দু'টি অঞ্চলের ভাষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, ঐতিহ্য এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছিল পরস্পর থেকে আলাদা।[৩] পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গ পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে কোনঠাসা ও শোষণের যাতাকলে পিষ্ট করে রাখে। পাকিস্তানের অধিবাসীদের শতকরা ৫৬ জনের বসবাস পূর্ব পাকিস্তানে থাকলেও 'গভর্নর জেনারেল' ও 'প্রধানমন্ত্রী' এ দু'টি পদের একটিতেও কোন বাঙালিকে নিয়োগ করা হয়নি। পাকিস্তানের রাজধানী প্রথমে করাচি ও পরে ইসলামাবাদে স্থাপন করা হয়। দেশরক্ষা বাহিনীর ৩টি সদরদপ্তরও পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপিত হয়। এছাড়া কলকারখানা স্থাপন, অর্থনৈতিক বিনিয়োগ, শিক্ষার সুযোগ, কৃষির উন্নতি, কর্মসংস্থানের সুযোগসহ সকল অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত বিষয় ছিল।[৪] এ সংক্রান্ত বিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানের দাবি-দাওয়াকে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কখনো আমলে নেয়নি। বরং তারা উপনিবেশসুলভ সাংস্কৃতিক একত্রীকরণ, অর্থনৈতিক শোষণ ও রাজনৈতিক আধিপত্যের নীতি অনুসরণ করে। এর ফলশ্রুতিতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিদ্যমান সংকট গভীর থেকে গভীরতর পর্যায়ে পৌঁছে

এবং অবশেষে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় হয় (১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর)। কিন্তু এ স্বাধীনতা একদিনে আসেনি। বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে এ অঞ্চলের মানুষকে দীর্ঘদিন বিভিন্ন পর্যায়ের আন্দোলন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। যেমন, ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত মাতৃভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের প্রাক্কালে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচি আন্দোলন, ১৯৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন কর্মসূচি, ১৯৭০ সালের নির্বাচন প্রভৃতি। আর সর্বশেষ ১৯৭১ সালে নয় মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধ ও ১৬ ডিসেম্বর এর বিজয় নিশ্চিতকরণ। উপরিউক্ত আন্দোলন-সংগ্রামে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে মহান মুক্তিযুদ্ধে এসকল সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এখানে প্রথমাংশে মহান মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের ভূমিকা এবং দ্বিতীয়াংশে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে।

মহান মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের ভূমিকা

বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা ও লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে রচিত হয়েছে এদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের পটভূমি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী রাজনৈতিক সংগঠন বা দল নিঃসন্দেহে আওয়ামী লীগ। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এদলের গঠন, মতাদর্শ ও লড়াই-সংগ্রামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে আওয়ামী লীগের ভূমিকা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

আওয়ামী লীগ

পূর্ববাংলার ইতিহাসে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' হলো প্রথম কার্যকর বিরোধী রাজনৈতিক দল। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের চরম দমননীতি প্রতিহত করতে এ দলের অভ্যুদয় ঘটে। গোড়া থেকে আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিল বাঙালিদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী দল। ১৯৪৯ সালে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে দলটি যাত্রা শুরু করে এবং ১৯৫৫ সালের ২৩ অক্টোবর মুসলিম শব্দটি বাদ দিয়ে 'আওয়ামী লীগ' নামকরণের মধ্য দিয়ে দলটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সবার জন্য এ দলে যোগদানের পথ অবারিত হয়।[৫] প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই আওয়ামী লীগ বিভিন্ন গণমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করে পূর্ববাংলার মানুষের প্রাণের দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান, নির্ভেজাল গণতন্ত্র, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন, পাকিস্তানের দু'অঞ্চলের মধ্যে

বৈষম্যের অবসান ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং তা বাস্তবায়নের সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে দ্রুত এ দলের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।[৬] বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম ও আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আওয়ামী লীগের কার্যকর পদক্ষেপ ও এর বলিষ্ঠ ভূমিকা প্রতিভাত হয়ে উঠে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন উপলক্ষ্যে যুক্তফ্রন্ট গঠন ও নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন, ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচি, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচন এর প্রতিটি ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সর্বশেষ ১৯৭১ সালে দলটি মহান স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান করে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশকে স্বাধীন ভূখণ্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান পর্যন্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে আওয়ামী লীগের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ববাংলার ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন লাভ করে। আর প্রাদেশিক পরিষদে অঞ্চলভিত্তিক ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন লাভ করে। আর জাতীয় পরিষদে পশ্চিম পাকিস্তানের ১৩৮টি অঞ্চলভিত্তিক আসনের মধ্যে জুলফিকার আলীর ভুট্টোর পিপিপি পায় মোট ৮৮টি আসন।[৭] বস্তুত এ নির্বাচনের ফলাফল ছিল ছয় দফার প্রতি পূর্ববাংলার জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন। স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়েই মূলত পূর্ববাংলার জনগণ এ রায় প্রদান করে। উল্লেখ্য যে, নির্বাচনের এ রায় পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে বিভক্তির বিষয়টি স্পষ্ট রূপ দান করে। এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু ৯ ডিসেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন যে, 'জনগণেরই জয় হয়েছে'। তিনি আরো বলেন যে, নির্বাচন ছিল ছয় দফা ও এগার দফার ভিত্তিতে গণভোট।[৮]

১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ শপথ গ্রহণ করেন। এ অনুষ্ঠানে তারা আওয়ামী লীগের ছয় দফা ও ছাত্রদের এগার দফা দাবির ভিত্তিতে পাকিস্তানের সংবিধান রচনার শপথ নেন।[৯] এরপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে জাতীয়

পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে পরামর্শ দেন। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উপলব্ধি করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জাতিকে আর দাবিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ১৯৭১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ৩ মার্চ (১৯৭১ সালে) ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এরপর ভেতরে ভেতরে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র চলতে থাকে যে, কীভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলকে ক্ষমতা বসতে না দেওয়া যায়।[১০] এ লক্ষ্যে জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানে দু'টি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল 'আওয়ামী লীগ' ও 'পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি' এ তত্ত্ব দাড় করান। তিনি এও বলেন যে, সংবিধানের প্রশ্নে দু'টি দলের মধ্যে সমঝোতা না হওয়া পর্যন্ত তিনি অধিবেশনে যোগ দেবেন না। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোন প্রকার আলোচনা না করে ইয়াহিয়া খান ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। এ ঘোষণার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ বাঙালি জাতি বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। বাঙালির জাতীয় উত্থানে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।[১১]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ঢাকায় ও ৩ মার্চ সমগ্র পূর্ববাংলায় হরতালের ডাক দেন। ২ মার্চ রাতে কারফিউ জারি করা হলে, ছাত্র-জনতা কারফিউ ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। পুলিশ মিছিলে গুলি চালায়। শত শত লোক আহত হয়। প্রতিবাদে প্রতিরোধে সকল স্তরের মানুষ রাজপথে নেমে আসে। চারদিকে বিদ্রোহ আর গগনবিদারী শ্লোগান উচ্চারিত হতে থাকে 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'। 'কৃষক শ্রমিক অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর'। 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'।[১২] ৩ মার্চ পল্টনের জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। ছাত্রলীগ ৫ দফাভিত্তিক প্রস্তাব গ্রহণ করে যা 'স্বাধীনতার ইশতেহার' নামে পরিচিত। ৪ মার্চ হতে ৬ মার্চ প্রতিদিন অর্ধবেলা হরতাল চলে। এ তিন দিনের হরতালে ঢাকাসহ সমগ্র দেশে আন্দোলন তুঙ্গে উঠে। প্রচণ্ড গণবিস্ফোরণের মুখে ইয়াহিয়া খান ৬ মার্চ ঘোষণা দেন যে, ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে। প্রেসিডেন্টের এ ঘোষণা বাংলাদেশের বিক্ষুব্ধ জনতাকে আশ্বস্ত করতে পারেনি। এদিকে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণার জন্য এক জনসভার আয়োজন করা হয়। ৭ মার্চ লোকে পরিপূর্ণ হয়ে যায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যান। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, প্রায় ১০ লক্ষ লোক উক্ত সমাবেশে উপস্থিত ছিল। জনসভায় আগত জনতার মুখে শ্লোগান ছিল- 'জয় বাংলা', 'তোমার আমার ঠিকানা পদ্মা মেঘনা যমুনা', 'তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ বাংলাদেশ', 'তোমার নেতা আমার নেতা শেখ মুজিব শেখ মুজিব', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর বাংলাদেশ

স্বাধীন কর' ইত্যাদি।[১৩] ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে উত্তাল জনসমুদ্রের সভামঞ্চে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৮ মিনিটের এক জ্বালাময়ী ভাষণ প্রদান করেন যা বিশ্বের ইতিহাসে বিখ্যাত ভাষণগুলোর মধ্যে অন্যতম হয়ে আছে। ভাষণে তিনি বলেন, "সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে, সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে আনতে হবে, হত্যার তদন্ত করতে হবে, আর জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখব, পরিষদে বসব কি বসব না।" তিনি কোর্ট-কাছারি, অফিস-আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন এবং বলেন, এ দেশ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ থাকবে। তিনি সারা বাংলায় প্রতিরোধ গড়ে তোলা, প্রতিরোধ সংগ্রাম শেষ অবধি মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়ার ইঙ্গিত, শত্রুর মোকাবেলায় গেরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন, যে কোন উস্কানির মুখে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা প্রভৃতি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করেন। এরপর তিনি চূড়ান্তভাবে ঘোষণা করেন- "ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব, ইনশাল্লাহ।... এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"[১৪] অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ এ ঐতিহাসিক ভাষণের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বলেন- বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের এ ভাষণ ছিল একজন দক্ষ কৌশলীর সুনিপুন বক্তব্য।[১৫] এখানে তিনি পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনকে হাতিয়ার হিসেবে বেছে নেন এবং জনগণকে "স্বাধীনতা সংগ্রাম" এর জন্য প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানান। মূলত বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের পর হতে বাংলাদেশে অসহযোগ ও প্রতিরোধ আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে। এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ২৫ মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণের সাথে-সাথে দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঘোষণা হয়ে উঠেছিল এক অভ্রান্ত পথ-নির্দেশ।[১৬]

ইতোমধ্যে ৭ মার্চ পাকিস্তান সরকার জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। নতুন গভর্নর পূর্ববাংলার জনগণের উপর অত্যাচার ও নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেন। ফলে অসহযোগ আন্দোলন এক মারমুখী রূপ লাভ করে। মূলত ২ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সারা বাংলায় সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলন চলে। উক্ত সময়ে পাকিস্তান সরকার সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়ে। সবকিছু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ অনুযায়ী পরিচালিত হতে থাকে। বঙ্গবন্ধু হয়ে উঠেন ডিফেক্টো (Defacto) বা কার্যত সরকার প্রধান। ১০ মার্চ পাকিস্তান সরকার সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কর্মক্ষেত্রে যোগ দেয়ার নির্দেশ দিলেও অসহযোগ আন্দোলন অব্যাহত থাকে। ১৩ মার্চ পুনরায়

পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে সামরিক আইন জারি করা হয়। ১৪ মার্চ জুলফিকার আলী ভুট্টো এক অবাস্তব প্রস্তাবের মাধ্যমে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার ফর্মুলা প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এসব কথায় গুরুত্ব না দিয়ে ১৪ মার্চ ৩৫ দফাভিত্তিক এক নির্দেশনামা জারি করেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ অকেজো হয়ে পড়ে। কেবল সৈন্যবাহিনী ব্যতীত সর্বত্র আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ অবস্থা উপলব্ধি করে ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকা সফরে আসেন। ১৬ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু ও তার সহযোগীদের সঙ্গে বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে আলোচনা করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দও ঐ সময়ে ঢাকা আসেন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সংকট সমাধানের জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। কিন্তু আলোচনা অসমাপ্ত রেখে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন। আর ঐ দিন মধ্যরাতেই পূর্ববাংলার নিরীহ জনগণের উপর নেমে আসে চরম আঘাত। মূলত এ আলোচনা পর্বটি ছিল ইয়াহিয়া খানের এক কূটকৌশল। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আলাপ-আলোচনার আড়ালে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং যথোপযুক্ত সময়ে পূর্ববাংলার জনগণের উপর সশস্ত্র আঘাত হানা।[১৭] পাকিস্তানি বাহিনী ২৫ মার্চ রাতে অতর্কিতভাবে ইপিআর ও পুলিশ লাইন, শ্রমিক কলোনি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল, জগন্নাথ হল ও ঢাকার বিভিন্ন বস্তিতে আক্রমণ চালায় এবং হাজার হাজার নিরীহ নর-নারীকে নির্বিচারে হত্যা করে। পুরান ঢাকার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা, শাখারি বাজার ও তাঁতি বাজার এলাকায়ও ব্যাপক আক্রমণ চালানো হয়।[১৮] পাকবাহিনী ২৫ মার্চ রাত ১টা ১০ মিনিটে (২৬ মার্চের প্রথম প্রহর) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তার বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়।[১৯] গ্রেফতার হওয়ার আগে অর্থাৎ ২৬ মার্চের ১ম প্রহরে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং ঢাকার দলীয় নেতৃবৃন্দকে ওয়্যারলেস যোগে চট্টগ্রামের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের নিকট এটি পৌঁছে দিয়ে তা প্রচারের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। পরের দিন বিবিসি-এর প্রভাতি অধিবেশনে এ ঘোষণাটি প্রচারিত হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মূল ঘোষণাটি ছিল ইংরেজিতে। যার বাংলা অর্থ নিম্নরূপঃ

> "আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। এই আমার শেষ কথা। যে যেখানেই থাকুন না কেন সকলের প্রতি আমার আবেদন রইল, যার কাছে যা আছে তাই নিয়ে দখলদার বাহিনীর মোকাবেলা করেন এবং বাংলার মাটি থেকে পাক দখলদার বাহিনীকে সমূলে উৎখাত করে চূড়ান্ত বিজয় না হওয়া পর্যন্ত লড়ে যান। আল্লাহ আমাদের সহায়। জয় বাংলা।"[২০]

২৬ মার্চ দুপুর ২ টা ১০ মিনিটে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি প্রথম প্রচার করেন। এরপর ২৭ মার্চ কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে (পরে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র) মেজর জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি পাঠ করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মেজর জিয়াউর রহমানের ২৭ মার্চের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের ঐতিহাসিক মূল কপিটি নিরাপত্তার কারণে নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল। মেজর জিয়াউর রহমানও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি ইংরেজিতে পাঠ করেন। যার বাংলা অনুবাদ নিম্নরূপঃ "আমাদের মহান নেতা, বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে আমরা, সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশের সরকার, এতদ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি এবং ঘোষণা করছি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ইতোমধ্যেই সরকার গঠিত হয়েছে।..."[২১] এরপর ৩০ মার্চ পর্যন্ত মেজর জিয়াউর রহমানের ঘোষণাপত্রের পাঠটি বহুবার প্রচার করা হয়। ইতোমধ্যে সারা বাংলায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বাঙালিরা সেদিন যার যা ছিল তাই দিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে থাকে।

এরপর ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল কোলকাতায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকার (মুজিবনগর সরকার) গঠন করা হয়। ঐ দিনই আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয় এবং ঐ ঘোষণাপত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ২৬ মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণাকে অনুমোদন দেওয়া হয়।[২২] এরপর ১৭ এপ্রিল তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমার ভবের পাড়ার (বৈদ্যনাথ তলা) আমবাগানে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের স্থানীয় জনপ্রতিনিধি অধ্যাপক ইউসুফ আলী উক্ত অনুষ্ঠানে শপথ বাক্য পাঠ করান। উক্ত শপথ অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি ১২৭ জন সাংবাদিক, বিপুল সংখ্যক জনতা ও মুক্তিযোদ্ধারা উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এখানে ঘোষণা দেন যে, আজ থেকে (১৭ এপ্রিল) বৈদ্যনাথ তলার নাম মুজিবনগর এবং অস্থায়ী রাজধানী মুজিবনগর থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হবে।[২৩] মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ঐ সময় পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থাকায়, সৈয়দ নজরুল ইসলাম (উপ-রাষ্ট্রপতি) অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন তাজউদ্দিন আহমদ। এছাড়া মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন এম মনসুর আলী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন এ এইচ এম কামরুজ্জামান, প্রধান সেনাপতি ছিলেন কর্নেল এম এ জি ওসমানী, চীপ অব স্টাফ ছিলেন কর্নেল আব্দুর রব এবং ডেপুটি চীফ অব স্টাফ ও বিমানবাহিনী

প্রধান ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকার।[২৪] মুজিবনগর সরকার গঠনের মাত্র দু'ঘণ্টা পর পাকিস্তানি বাহিনীর বিমান মুজিবনগরে গোলাবর্ষণ করে এবং মেহেরপুর দখল করে নেয়।

পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর অত্যাচার, লুটপাত ও গণহত্যার বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার আপামর জনগণ মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্বে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলে। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে ২৫ মার্চের হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদে ২৬ মার্চ থেকে বাংলার আপমর জনতা পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। রফিকুল ইসলাম (বীরউত্তম) অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে, ২৫ মার্চ রাত ৮টা থেকে চট্টগ্রামে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়।[২৫] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, ছাত্র, তরুণ ও কৃষকদের সন্তানেরা অস্ত্র হাতে নিয়মিত সেনাবাহিনী, পুলিশ, আনসার ও ইপিআর-এর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ অংশগ্রহণ করে। এজন্য বলা হয় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল প্রকৃতিপক্ষেই একটি জনযুদ্ধ।[২৬] মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য প্রথমে রনাঙ্গণকে ৮টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। এছাড়া মে-জুন মাসে আরো ৩টি বি-গ্রেড ফোর্স গঠন করা হয়। মেজর জিয়াউর রহমান ছিলেন 'জেড', মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ 'এস' এবং মেজর খালেদ মোশাররফ ছিলেন 'কে' ফোর্সের অধিনায়ক। মধ্য জুলাই মাস থেকে যুদ্ধের সুবিধার্থে সমগ্র দেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি সেক্টরে একজন করে সেক্টর কমান্ডার দায়িত্ব পালন করতেন। নিম্নে ১১টি সেক্টরের অঞ্চল ও কমান্ডারদের নাম উল্লেখ করা হলো : ১নং সেক্টরের (চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম) কামান্ডার ছিলেন প্রথমে মেজর জিয়াউর রহমান, পরে মেজর রফিকুল ইসলাম। ২নং সেক্টরের (নোয়াখালি, কুমিল্লা, দক্ষিণ ঢাকা, আংশিক ফরিদপুর) কমান্ডার প্রথমে ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ, তারপর ক্যাপ্টেন আব্দুস সালেক চৌধুরী এবং সর্বশেষ ক্যাপ্টেন এ.টি.এম. হায়দার। ৩নং সেক্টরের (উত্তর ঢাকা, সিলেট ও ময়মনসিংহের অংশবিশেষ) কমান্ডার প্রথমে ছিলেন মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ তারপর মেজর এ.এন.এম. নূরুজ্জামান। ৪, ৫ এবং ৬নং সেক্টরের (যথাক্রমে দক্ষিণ সিলেট, উত্তর সিলেট এবং রংপুর, দিনাজপুর) কমান্ডার ছিলেন যথাক্রমে মেজর সি.আর. দত্ত, মেজর মীর শওকত আলী এবং উইং কমান্ডার এম.কে. বাশার। ৭নং সেক্টরের (রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা) কমান্ডার ছিলেন মেজর নাজমুল হক, একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় তার মৃত্যুর পর মেজর কাজী নুরুজ্জামান সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব নেন। ৮নং সেক্টরের (কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর) কমান্ডার প্রথমে ছিলেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী এবং তারপর মেজর এম.এ. মনজুর। ৯নং সেক্টরের (খুলনা, বরিশাল) কমান্ডার ছিলেন মেজর এম.এ জলিল। ১০নং সেক্টর ছিল নৌ-অঞ্চলের জন্য, সেটি ছিল সরাসরি কমান্ডার ইন চিফের অধীনে। কোনো অফিসার ছিল না বলে এ সেক্টরের কোনো কমান্ডার ছিল না।

নৌ-কমান্ডোরা যখন যে সেক্টরে তাদের অভিযান চালাতেন, তখন সে সেক্টর কমান্ডারের অধীনে কাজ করতেন। এ নৌ-কমান্ডোরা অপারেশন জ্যাকপট নামে একটি অবিশ্বাস্য ও দুঃসাহসিক অভিযান পরিচালনা করে আগস্টের ১৫ তারিখ চট্টগ্রামে অনেকগুলো জাহাজ মাইন দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। ১১নং সেক্টরের (টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ) কমান্ডার ছিলেন মেজর এম.আবু তাহের। নভেম্বরে একটি সম্মুখযুদ্ধে আহত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন।[২৭] এছাড়া বাংলার কৃষক-শ্রমিক-জনতা, পুলিশ, আনসার, ইপিআর ও অন্যান্যদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়। আর ছাত্রলীগের উদ্যোগে 'মুজিব বাহিনী' নামে একটি গেরিলা বাহিনী গঠন করা হয়। এ বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান, আব্দুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ প্রমুখ।[২৮] এছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলে সাহসী মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্দ্যোগে বেশ কিছু বাহিনী গড়ে উঠে। এদের মধ্যে ছিল টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনী, ফরিদপুরের হেমায়েত বাহিনী, সিরাজগঞ্জের লতিফ মির্জার বাহিনী, ঝিনাইদহে আকবার হোসেন বাহিনী প্রভৃতি।[২৯] উপরিউক্ত বাহিনীগুলো পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে সর্বাত্মকভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

মুক্তিযোদ্ধাদের বেশিরভাগ ট্রেনিংক্যাম্প ছিল সীমান্ত এলাকায়। ভারতের সহায়তায় মুক্তিযোদ্ধারা প্রশিক্ষণ লাভ করতো। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা গুরুত্বপূর্ণ হামলা (নৌ-অভিযান) পরিচালনা করতে থাকে। ইতিহাসে এ হামলা অপারেশন জ্যাকপট নামে পরিচিত।[৩০] এসময় থেকে মুক্তিবাহিনী স্থলপথেও তীব্র আক্রমণের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী বর্ডার পোস্টগুলো একে একে দখল করে নিতে শুরু করে। বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনী কমলপুর, বিলোনিয়া, বয়রা প্রভৃতি বর্ডার পোস্টে হামলা করে এবং ৩০৭টি পোস্টের মধ্যে ৯০টিই দখল করে নেয়। পাশাপাশি গেরিলা বাহিনীর হামলাও তীব্রতর হয়ে উঠে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু অক্টোবরের শেষের দিকে তারা মুক্তিবাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। তখন পাকবাহিনী দিনের বেলাতেও নিজেদের সামরিক ঘাঁটি থেকে বের হতে ভয় পেতো। এমন পরিস্থিতিতে পাকিস্তান হতে ৫ ব্যাটালিয়ান সৈন্য তলব করা হয়। মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণে ক্রমান্বয়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অবস্থা এতটাই শোচনীয় হয়ে পড়ে যে উপায়ন্তর না দেখে ঘটনা ভিন্ন খাতে পরিচালিত করতে তারা ৩ ডিসেম্বর ভারতের সীমান্তে (কাশ্মীর) আক্রমণ করে। ফলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে বলেন, 'বাংলাদেশে যে যুদ্ধ চলে আসছিল তা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরিণত হয়েছে'। ভারতও এর জবাবে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং তাদের পশ্চিম সীমান্তে

পাকিস্তানের হামলা প্রতিহত করে। ভারতের সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সাথে যুক্ত হয়ে যৌথবাহিনী গঠন করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ৪ ডিসেম্বর থেকে ভারতীয় স্থলবাহিনীর সম্মুখ অভিযান শুরু হয়। যৌথবাহিনীর প্রবল আক্রমণের মুখে সারা দেশের সীমান্তবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রগুলো থেকে পাকিস্তানি সৈন্যরা দ্রুত পিছু হটতে শুরু করে। এভাবে একের পর এক পাকিস্তানি ঘাঁটির পতন হতে থাকে। উল্লেখ্য যে, ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।[৩১]

পাকিস্তানি উর্ধ্বতন অফিসাররা চীন ও আমেরিকা থেকে সাহায্য পাবে ভেবেছিল, কিন্তু বাস্তবে তার দেখা মেলে না। ১৬ ডিসেম্বরের পূর্বেই যৌথবাহিনী পাকিস্তানি বিমান বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়। মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে ইতোমধ্যে পর্যুদস্ত ও হতোদ্যম পাকিস্তানি বাহিনী এ. কে. নিয়াজীর নেতৃত্বে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনী প্রায় ৯৩,০০০ সৈন্যসহ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ করে। আর এরই মাধ্যমে ৯ মাস ব্যাপী রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের অবসান হয়, বিশ্বের মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'।

জামায়াতে ইসলামীর ভূমিকা

১৯৪১ সালের ২৫ আগস্ট ব্রিটিশ ভারতে সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদীর নেতৃত্বে এ দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন দলটির নাম ছিল 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ'। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দলটির নতুন নামকরণ করা হয় 'জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান'। দলটি ইসলামি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী ছিল।[৩২] কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে দলটির নেতৃবৃন্দ তা মেনে নিয়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়। জামায়াতে ইসলামী একটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল। ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করা তাদের প্রধান লক্ষ্য। ১৯৬১ সালে মাওলানা আব্দুর রহিমের নেতৃত্বে এ দলের পূর্ব পাকিস্তান শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে জামায়াতে ইসলামী দলটির উদ্ভব, প্রকৃতি ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ দলটির ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১৯৭০ সালের নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী দলটি অংশগ্রহণ করে। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে 'দাঁড়িপাল্লা' প্রতীক নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান হতে দলটির ৬৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। নির্বাচনের

ফলাফলে দেখা যায়, জামায়াতে ইসলামী পশ্চিম পাকিস্তানে মোট ৪টি আসনে জয় লাভ করে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ১টি আসনেও জয়লাভ করতে পারেনি। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও জামায়াতে ইসলামী মাত্র ১টি আসনে জয় লাভ করে।[৩৩] এতে করে বুঝা যায় যে, পূর্ববাংলার মানুষ কট্টরপন্থী ইসলামি রাজনীতিতে কোনরকম পৃষ্ঠপোষকতা করতে আগ্রহী ছিল না।

দলটির কর্মকাণ্ড লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, দেশ বিভাগের পর থেকে দলটি পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে সর্বদাই নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। যেমন ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন না করে দলটি মুসলিম লীগকে সমর্থন করে। আবার ছয় দফা দাবিরও বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। তারা মনে করতো যে, ছয় দফা কর্মসূচি পাকিস্তানের সংহতি বিনষ্ট করবে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে দলটি অংশগ্রহণ করলেও জাতীয় পরিষদে তারা কোন আসন লাভ করতে পারেনি। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে দলটি কখনো সম্পৃক্ত হতে পারেনি।

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে দলটি তাদের পূর্বের কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান সরকারকে সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। তারা পাক-হানাদার বাহিনীর আক্রমণ নির্যাতনের সহযোগী হিসেবে কাজ করা শুরু করে। পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য ৯ এপ্রিল ১০৪ সদস্য বিশিষ্ট 'নাগরিক শান্তি কমিটি' গঠন করা হয়। ১৪ এপ্রিল কমিটির নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি' করা হয়। ২১ সদস্য বিশিষ্ট উক্ত কমিটির মধ্যে অন্যতম ছিলেন- সৈয়দ খাজা খয়ের উদ্দিন (আহবায়ক), এ কিউ এম শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক গোলাম আযম, ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। ১৯৭১ সালের মে মাসে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে স্তব্ধ করতে এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রটিকে রক্ষা করার জন্য 'রাজাকার বাহিনী' নামে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী একটি বেসামরিক সশস্ত্র বাহিনী গঠন করে। উল্লেখ্য যে, প্যাকিস্তান রাষ্ট্রটির রক্ষার্থে জামায়াতে ইসলামীর নেতা অধ্যাপক গোলাম আযম পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানকে সশস্ত্র রাজাকার বাহিনী গঠনের পরামর্শ দেন। আর তার পরামর্শেই টিক্কা খান জুন মাসে "পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স '৭১" জারি করেন।[৩৪] জামায়াতে ইসলামীর বহু নেতা-কর্মী রাজাকার বাহিনীতে যোগ দেয়। শুরুতেই রাজাকার বাহিনীতে ১০০০০ জনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জুলাই মাসে সশস্ত্র রাজাকারের সংখ্যা দাঁড়ায় ২২ হাজার। আর এ রাজাকার বাহিনীই মূলত সন্ত্রাস ও নিপীড়নের মূলযন্ত্রে পরিণত হয়েছিল।[৩৫] তারা গ্রামে-গঞ্জে,

শহরে-বন্দরে, হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে সাধারণ মানুষের উপর ব্যাপক মাত্রায় নারকীয় অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। তাদের অত্যাচারে বাংলাদেশে প্রাণ বাঁচানো তখন দুঃসাধ্য ছিল।[৩৬] পাকবাহিনী ও রাজাকারদের নির্মমতা যে কত ভয়ানক ছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ এক ভুক্তভোগীর বর্ণনা থেকে নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

> "আমি তহন ছয় মাসের পোয়াতি (গর্ভবতী)। পাক সেনারা চোখের সামনে গুলি কইরা আমার স্বামীডারে মাইরা ফালায়। জানুয়ারগরের অত্যাচারে পেটের বাচ্চাডাও নষ্ট অইয়া যায়। এরা চইলা গেলে নিরুপায় অইয়া গোসুল ছাড়াই স্বামীরে উডানে (বাড়ির আঙ্গিনায়) কব্বর দিছি। পরে দুই পুলাপান লইয়া অসুস্থ সইলে গ্রাম ছাড়ি। কম বয়সে বিধবা অইছি, স্বামীর আদর কি জিনিস বুঝবার পাই নাই। তারাও বুঝব বিধবা অয়নের কি কষ্ট।... স্বামী মইরা যাওয়ানের পর ২২ দিন জাউ খাইয়া থাকছি। ভাতের অভাবে মেয়েডা মইরা যায়। পরে অসুস্থ সইল লইয়া বাড়ি বাড়ি কাম করছি। শেষে ভিক্ষা কইরা চলছি। শুধু এই দিনডা দেহুনের লাইগা আল্লাহ আমগরে বাঁচাইয়া রাখছে। কামারুজ্জামানের ফাঁসি অইব এই খবরেই আমরা বিরাট খুশি অইছি। কামারুজ্জামানের ফাঁসি অইলে আমার স্বামী-সন্তানের আত্মা শান্তি পাইব।"[৩৭]

উল্লেখ্য যে, '৭১- এর যুদ্ধাপরাধী খুনি কামারুজ্জামানের (জামায়াতে ইসলামীর সাবেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল) ফাঁসির রায় বহাল রাখার পর শেরপুর জেলার নালিতাবাড়ির সোহাগপুর গ্রামের বিধবাপল্লির বাসিন্দা জোবায়দা খাতুন উপরিউক্ত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। একই গ্রামের আরেকজন স্বামীহারা নারী করফুলি বেগম (৭০) বলেন,

> "সাক্ষী দেওয়ার পর থাইকা রাতে ঘরের চালে কে বা কারা ডেল মারত। এলাকার লোকজন ডর (ভয়) দেহাইত। সরকার বইদলা (পরিবর্তন) গেলে নাহি, আমগর উল্ডা বিচার করব। এর লাইগা সবসুমু ভয়ে ভয়ে থাকতাম। ফাঁসির রায় বহাল থাহায় আমগর মনে স্বস্তি ফিইরা আইছে। কামারুজ্জামানের ফাঁসি অইলে আমগর আত্মা শান্তি পাইব।"[৩৮]

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালের ২৫ জুলাই সোহাগপুর গ্রামে কামারুজ্জামানের নেতৃত্বে আল-বদর, রাজাকার ও পাকিস্তানি বাহিনী নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায় ও নারী নির্যাতন (ধর্ষণ) করে। বেনুপাড়ার সব পুরুষকে (১৮৭ জন) হত্যা করে পাড়াটিকে বিধবাপল্লিতে পরিণত করা হয়। সেদিন যে ৫৭ জন বিধবা হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে জোবায়দাসহ ৩০ জন এখনো বেঁচে আছেন।[৩৯] এখানে আরো উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকহানাদার বাহিনী ও রাজাকার বাহিনী বাংলাদেশের সর্বত্রই এ ধরনের অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়েছে।

রাজাকার বাহিনী গঠনের পর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর উদ্যোগে জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মীদের নিয়ে 'আল-বদর' এবং অবাঙালি বিহারীদের নিয়ে 'আল-শামস' নামে দু'টি সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তোলা হয়। আল-বদরের অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করত পাকিস্তানি বাহিনী।[৪০] আল-বদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন মতিউর রহমান নিজামী। ইসলামের ইতিহাসের ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে অবলম্বন করে কট্টরপন্থী এ গোষ্ঠী তাদের নামকরণ করে আল-বদর বাহিনী নামে। হিন্দু-মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে আল-বদর বাহিনী তাদের চরম পরাকাষ্টা সাধন করে। আর আল-শামস বাহিনীর কাজ ছিল দেশের অভ্যন্তরে বাঙালি ভাবধারার সমর্থক ছাত্র-ছাত্রী, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষক শ্রেণিকে হত্যা করা। এ বাহিনীরও নেতৃত্ব দান করেন মতিউর রহমান নিজামী।[৪১] ১৪-১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তারা পরিকল্পিতভাবে ৫০ জন বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে।[৪২] উল্লেখ্য যে, জামায়াতে ইসলামী ছাড়াও নেজামে ইসলামী, জামায়াতে উলামায়ে ইসলাম, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি এবং মুসলিম লীগের তিনটি উপদলই পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী ভূমিকা পালন করে। তবে সবচেয়ে আক্রমণাত্মক ভূমিকা পালন করে জামায়াতে ইসলামী দলটি। এছাড়া ইসলামি দলগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে বরাবরই ভারতীয় আগ্রাসন বলে আখ্যায়িত করেছে। তারা কখনোই বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে মেনে নিতে চায়নি।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে জামায়াতে ইসলামী দলটি তার সহযোগী রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস বাহিনী নিয়ে হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ ও বাড়িতে-বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে বহু মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটিত করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধাপরাধের দায়ে তাদের অনেকে গ্রেপ্তার হয়, অনেকে আত্মগোপন করে এবং অনেকে বিদেশে পালিয়ে যায়। এরপর নতুন সরকার ১৯৭২ সালের সংবিধানে ধর্মপন্থী রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতি স্তিমিত হয়ে পড়ে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাদের মানবতা বিরোধী অপরাধে জড়িত থাকার অভিযোগ যাচাই-বাছাই ও বিচারের জন্য ২০০৯ সালে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল' গঠিত হয়েছে। জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ ট্রাইব্যুনালে প্রমাণিত হয়েছে এবং বিভিন্ন নেতা-কর্মীকে মৃত্যুদণ্ডসহ ভিন্ন-ভিন্ন মেয়াদে সাজা প্রদান করা হয়েছে। আরো কিছু নেতা-কর্মীর বিচার এখনো প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধে বামপন্থী দলগুলোর ভূমিকা

চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্বের প্রভাবে ১৯৬৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থী দলগুলো দু'টি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। তাই মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে বামপন্থী দলগুলোর মধ্যে মস্কোপন্থী ও পিকিংপন্থী দু'টি ধারার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মস্কোপন্থী বাম দলগুলোর মধ্যে ছিল: (১) বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (মনি সিংহ), (২) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) (মুজাফফর), (৩) ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) ও (৪) কৃষক সমিতি। আর পিকিংপন্থী বাম দলগুলোর মধ্যে ছিল: (১) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) (ভাসানী), (২) ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ), (৩) পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে) তোয়াহার নেতৃত্বে, (৪) পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি (মা-লে) আব্দুল হকের নেতৃত্বে, (৫) পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (মতিন-আলাউদ্দিন) (৬) পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (টিপু বিশ্বাস ও দেবেন শিকদার), (৭) পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলন এবং (৮) জাতীয় মুক্তিবাহিনী (৩ জুন '৭১), পরে এর নাম হয় 'পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি'।[৪৩]

মস্কোপন্থী বাম দলগুলোর ভূমিকা

মনি সিং এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির রুশপন্থী অংশটি ৬ দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন ও স্বাধীনতা যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ জয়ী হলে সাম্প্রদায়িকতার অবসান হবে ও ভারতের সাথে সম্পর্কের উন্নতি হবে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথেও বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নতি হবে, সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হবে, পাশাপাশি এ যুদ্ধের সফল পরিণতি দক্ষিণ এশিয়ায় গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে এ বিশ্বাসকে সামনে রেখে মস্কোপন্থী বাম দলগুলো মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করে। মুক্তিবাহিনীতে ও গেরিলাবাহিনী গঠনের মাধ্যমে তারা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। তাদের ৬০০০ (ছয় হাজার) সদস্য মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে বিভিন্ন সেক্টরে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। আর ২০০০০ (বিশ হাজার) সৈন্যের একটি গেরিলা দল ঢাকা ও কুমিল্লার বিভিন্ন এলাকায় যুদ্ধ করে।[৪৪] উল্লেখ্য যে, গেরিলাবাহিনীর একটি দলকে উন্নত প্রশিক্ষণের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু দলটি ফিরে আসার পূর্বেই বাংলাদেশে স্বাধীন হয়ে যায়।[৪৫] এভাবে মস্কোপন্থী বাম দলগুলো স্বাধীনতাযুদ্ধে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

পিকিংপন্থী বাম দলগুলোর ভূমিকা

পিকিংপন্থী বাম দলগুলো মুক্তিযুদ্ধে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত যুদ্ধ হয়। এ কারণে চীন ছিল ভারতের শত্রু। অতএব ভারতের আজন্ম শত্রু পাকিস্তান ছিল চীনের

Dhaka University Institutional Repository

মিত্র। এজন্য ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে চীনপন্থী বাম দলগুলো ভারতকে ‘সম্প্রসারণবাদী’ ও রাশিয়াকে ‘সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী’ শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে। আর বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধকে রুশ-ভারতের চাপিয়ে দেয়া আগ্রাসী যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করে ও পাকিস্তানকে সমর্থন প্রদান করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ন্যাপ (ভাসানী) নেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ভারতে গেলেও তার দলের নেতা-কর্মীরা দেশের অভ্যন্তরেই আত্মগোপন করে থাকে। পিকিংপন্থী অন্য দলগুলো পাকবাহিনী, আওয়ামী লীগ ও মুক্তিবাহিনী উভয়কেই শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে। নকশাল আন্দোলনের প্রভাবে এদের কোন কোন গ্রুপ এদেশের জোতদার শ্রেণির বিরোধিতা ও অনেকক্ষেত্রে তাদেরকে খতম করাও শুরু করে। এসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এ দলগুলো মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে।[৪৬] অবশ্য চীনপন্থী একটি উপদল অহিদুর রহমানের নেতৃত্বে রাজশাহী অঞ্চলে মুক্তিবাহিনীর সাথে একযোগে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে। আরো কয়েকটি চীনপন্থী উপদল যেমন, দেবেন শিকদার ও বাশার এর নেতৃত্বাধীন ‘পূর্ববাংলার কমিউনিস্ট পার্টি’, নাসিম আলীর ‘হাতিয়ার গ্রুপ’, কাজী জাফর আহমদ, হায়দার আকবর খান রনো ও রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বাধীন ‘কমিউনিস্ট বিপ্লবিদের সমন্বয় কমিটি’ প্রভৃতি উপদলগুলো মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য ‘বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি’ গঠন করে। তবে এরা মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করতে চাইলেও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ও আওয়ামী লীগের পক্ষ হতে কোন উল্লেখযোগ্য সাড়া পায়নি। এ উপদলগুলো চীনের বাংলাদেশ বিরোধী নীতির কারণে চীনের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল, আবার ভারত ও রাশিয়াকেও মিত্র হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ তারা মনে করতো ভারতের শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করার জন্য তাদের শ্রেণিমিত্র আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানোর চেষ্টা করছে। তাদের ভারত বিরোধী কার্যকলাপের জন্য অনেক সময় তাদেরকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের হাতে নাজেহাল হতে হয়।[৪৭]

মূলত স্বার্থদ্বন্দ্ব, মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রভাবে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো মুক্তিযুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করে। তবে উল্লেখ্য যে, চীনপন্থী বাম দলগুলো ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতার প্রভাবে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নেয়। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা বা ইসলামের ধর্মীয় আদর্শ রক্ষা করা কোনভাবেই তাদের লক্ষ্য ছিল না।

Dhaka University Institutional Repository

মহান মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের ভূমিকা

যে কোন দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোই মূলত মূখ্য ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক হিসাব ছিল সাংঘাতিক জটিল। সুদীর্ঘকালের বৃটিশ শাসন অবসানের পর ভারত বিভক্তি, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান মিলে একক পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। অতঃপর পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর নানারকম বৈরী আচরণ, সে প্রেক্ষিতে দীর্ঘ ২১ বছরের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম এবং অবশেষে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ও পূর্ব পাকিস্তানের নাম মুছে দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম। স্বাধীনতা সংগ্রামের এ পথ পরিক্রমায় রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা এ অধ্যায়ের প্রথমাংশে আলোচনা করা হয়েছে। এ রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর আন্দোলন-সংগ্রামের পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর আন্দোলনও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সাংস্কৃতিক সংগঠনের কার্যক্রমসমূহ হলো মূলত একটি জাতির মননকে বিকশিত করা, প্রগতির পথে অগ্রসর করা এবং জাতিকে নতুন কিছু গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করা। এ দিকগুলো বিচার করলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কার্যক্রমকে বেগবান করার জন্য এবং জনমনে এর ইতিবাচক সাড়া জাগানোর ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ প্রসঙ্গে রথীন চক্রবর্তীর নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "(১) সাংস্কৃতিক জীবন রাজনৈতিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; (২) রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কিত; (৩) রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পী ও সাহিত্যিকের অবশ্যই সুনির্দিষ্ট কিছু দায় থেকে যায়; এবং (৪) সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রাজনৈতিক অনুগামিতা শুধু প্রত্যাশিতই নয়, দায়বদ্ধতাও বটে।"[৪৮] অর্থাৎ রাজনৈতিক আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। আর এ দু'য়ের আন্তঃসম্পর্কও অত্যন্ত গভীর। নিম্নে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে পূর্ববাংলার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মসূচি ও আন্দোলনের বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এখানে পর্যায়ক্রমে সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ ও তাদের কার্যাবলি, এরপর পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও অনুষ্ঠানসমূহ এবং সবশেষে সাংস্কৃতিক স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন ও প্রতিবাদ কর্মসূচিসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম সাহিত্য সমাজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম হল ইউনিয়ন কক্ষে বাংলা ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সভাপতিত্বে ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি ‘মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ নামে একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছু মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন প্রগতিশীল শিক্ষক ও ছাত্র এ সংগঠনের সঙ্গে শুরু থেকেই জড়িত ছিলেন। সংগঠনটি পরিচালনা করতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিভাগের অধ্যাপক আবুল হুসেন, মুসলিম হলের ছাত্র এ. এফ. এম আবদুল হক, ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্র আবদুল কাদির প্রমুখ। এছাড়াও ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক কাজী আবদুল ওদুদ ও যুক্তিবিদ্যার অধ্যাপক কাজী আনোয়ারুল কাদীর এ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ‘বুদ্ধির মুক্তি’ ছিল সংগঠনটির মূল শ্লোগান। বুদ্ধির মুক্তি বলতে তারা বুঝাতেন অন্ধ সংস্কার ও শাস্ত্রানুগত্য থেকে মানুষের বিচার বুদ্ধিকে মুক্তি দান। চিন্তা চর্চা ও জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা তৈরী এবং আবহমানকালের চিন্তা ও জ্ঞানের সঙ্গে সংযোগ সাধনই ছিল সংগঠনটির প্রধান লক্ষ্য। সংগঠনটি তাদের চিন্তা চেতনাকে বাঙালি সমাজের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য তিনটি পথ অবলম্বন করতো। যেমন- (ক) পত্র-পত্রিকা প্রকাশ, (খ) সাময়িক অধিবেশন ও বার্ষিক সম্মেলনের ব্যবস্থা করা এবং (গ) গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ।[৪৯]

এ সাহিত্য সমাজের বার্ষিক মুখপাত্র ছিল ‘শিখা’ পত্রিকা। এটি ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। শিখার মোট পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়।[৫০] শিখা তৎকালীন অন্যান্য সাময়িকপত্র থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের ছিল। এজন্য প্রথম সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পত্রিকাটি বুদ্ধিজীবী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। শিখা মুসলিম সাহিত্য সমাজের সারা বছরের কর্মকাণ্ডের পরিচয় প্রদান করতো। শিখার আদর্শ বাণী ছিল- ‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব’।[৫১] মুসলিম সাহিত্য সমাজ দশ বছর তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পেরেছিল। পিছিয়ে পড়া বাঙালি মুসলমান সমাজের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে মুসলিম সাহিত্য সমাজের বিরাট অবদান রয়েছে।[৫২]

প্রগতি লেখক সংঘ

ধনতন্ত্র ও ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সাম্যবাদী ভাবধারার অঙ্গীকার নিয়ে সৈয়দ সাজ্জাদ জহীর ও মূলক রাজ আনন্দের উদ্যোগে ১৯৩৪ সালের শেষ দিকে অথবা ১৯৬৫ সালের শুরুর দিকে বিলেতে

‘ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ’ নামে একটি সাহিত্য সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৬ সালের ১০ এপ্রিল সৈয়দ সাজ্জাদ জহীরের নেতৃত্বে ভারতের লক্ষ্ণৌতে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ’। আর এর ধারাবাহিকতায় ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ‘বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ’। ঢাকায় এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৯ সালে। পুরোনো ঢাকার দক্ষিণ মৈশুণ্ডিতে জোড়পুল লেনের ‘প্রগতি পাঠাগার’ ছিল সদস্যদের মিলনকেন্দ্র। এ সংগঠনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন- সোমেন চন্দ, সতীশ পাকড়াশী, রনেশ দাশগুপ্ত, কিরণশংকর সেনগুপ্ত প্রমুখ।[৫৩] লেখক সংঘের ইশতেহার ছিল– ‘সাম্যবাদী আদর্শে পরিচালিত হয়ে সমাজের মূল সমস্যা ক্ষুধা, দারিদ্রতা, সামাজিক পশ্চাদমুখিতা ও রাজনৈতিক পরাধীনতাকে সাহিত্যের উপাদান করা এবং সামাজিক পরিবর্তনকে প্রগতিশীলতার খাতে প্রবাহিত করা’।[৫৪] ১৯৪০ সালে ঢাকার গেণ্ডারিয়া হাই স্কুল মাঠে সংঘের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কাজী আবদুল ওদুদ। ১৯৪১ সালে জার্মানি কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণের পটভূমিতে গঠিত হয় ‘সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি’ এবং ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ এ সমিতির পক্ষ থেকে ফ্যাসিবাদ বিরোধী একটি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে যোগদানের পথে সোমেন চন্দ নিহত হন। এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সারাদেশে ফ্যাসিবাদ বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পায়। আর ‘বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের’ নতুন নামকরণ করা হয় ‘ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ’ নামে। তিন বছর পর ১৯৪৫ সালে পুনরায় এর নামকরণ করা হয় ‘প্রগতি লেখক সংঘ’।[৫৫] সংঘের নিয়মিত বৈঠকে পঠিত রচনাসমূহ নিয়ে ১৯৪১ সালে ‘ক্রান্তি’ নামক একটি সংকলন প্রকাশ করা হয়। এছাড়া প্রকাশিত হয় সংঘের মুখপত্র পাক্ষিক ‘প্রতিরোধ’ (১৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯) ও সোমেন চন্দের গল্প সংকলন ‘সংকেত ও অন্যান্য গল্প’ (১৩৪৩)। এভাবে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ও গণসঙ্গীত রচনা করে এবং সাহিত্য বৈঠক ও সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ‘প্রগতি লেখক সংঘ’ ঢাকায় একটি প্রগতিশীল পরিবেশ তৈরী করতে পেরেছিল। আর এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও রংপুরে। কিন্তু সাতচল্লিশের দেশবিভাগজনিত বিশৃঙ্খলা ও পরবর্তীকালে সরকারের অত্যাচার-নির্যাতনের ফলে সংঘের কার্যক্রমে ভাটা পড়ে। সংঘের অনেক কর্মী দেশ ত্যাগ করে ভারতে চলে যান, অনেকে গ্রেফতার হন এবং অন্য সদস্যগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলে সংঘের কর্মতৎপরতা ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যায়।[৫৬] তবে ১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তির পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গে মুক্ত চিন্তা ও উদার সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরীতে উপরিউক্ত সংগঠন দু’টি মাইলফলক ভূমিকা পালন করেছিল।

তমদ্দুন মজলিশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম ও কিছু ছাত্রের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর 'তমদ্দুন মজলিস' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৫৭] সংগঠনের পক্ষ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর (১৯৪৭) 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' এ শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করা হয়। সেখানে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষার পক্ষে যুক্তি সহকারে লেখা প্রকাশিত হয়। সেখানে আবুল কাশেম বলেন- বাংলা ভাষাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা, আদালত ও অফিসাদির ভাষা।[৫৮] এছাড়া আবুল কাশেম তমদ্দুন মজলিশের পক্ষ থেকে আরো দাবি করেন যে 'লাহোর প্রস্তাবেও পাকিস্তানের প্রত্যেক ইউনিটকে সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতার অধিকার দেয়া হয়েছে। কাজেই প্রত্যেক ইউনিটকে তাদের স্ব-স্ব প্রাদেশিক রাষ্ট্রভাষা কি হবে তা নির্ধারণ করার স্বাধীনতা দিতে হবে'।[৫৯]

উল্লেখ্য যে, ভাষার প্রশ্নে প্রথম পর্যায়ে (১৯৪৭-১৯৪৮ সালে) এ সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলা ভাষার দাবিতে প্রথম সংগ্রাম পরিষদ এ সংগঠনটির উদ্যোগেই গঠিত হয়।[৬০] তবে আদর্শগত দিক থেকে এ সংগঠনটি ছিল মুসলীম লীগ ও পাকিস্তানবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী। এজন্য ইসলামি আদর্শ ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সুখী সমাজজীবন গড়ার লক্ষ্য নিয়ে সংগঠনটি পরবর্তীতে পথ চলতে থাকে।[৬১] এ সংগঠনটির মুখপাত্র ছিল সাপ্তাহিক 'সৈনিক' পত্রিকা। আর 'দ্যুতি' নামে এর একটি সাহিত্য পত্রিকা ছিল। ১৯৫৪ সালের পর এ সংগঠনটির কার্যক্রমে ভাটা পড়ে।[৬২]

ধূমকেতু শিল্পী সংঘ

মুসলিম লীগের চরম দমন নীতি ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে ১৯৫০ সালে 'ধূমকেতু শিল্পী সংঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে দু'বার এ সংগঠনের নাম পরিবর্তন করা হয়। প্রথমে 'পূর্ব পাকিস্তান শিল্পী সংসদ' এবং পরে 'পাকিস্তান গণনাট্য সংঘ'। সংঘের কর্মীরা গণসঙ্গীত স্কোয়ার্ড গঠন করে এবং ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য জেলা শহরে গণসঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট ও বঞ্চনার কথা তুলে ধরে জনগণকে সচেতন ও উজ্জীবিত করতে থাকে। এ গণসঙ্গীতগুলোর মধ্যে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের 'ঘুম ভাঙ্গান গান' ছিল অন্যতম।[৬৩] গাজীউল হক এ বিষয়ে বলেন, "আমরা ৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে দেখেছি বক্তৃতা মানুষকে যতখানি না আকর্ষণ করতে পেরেছিল তার চেয়ে শিল্পী সংঘের গণসঙ্গীতের আসর মানুষকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল, অভিভূত করেছিল"।[৬৪]

সংস্কৃতি সংসদ

১৯৫১ সালে 'সংস্কৃতি সংসদ' সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬৫] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক এ সংগঠনটি নাটক, দেশাত্মকবোধক গান ও গণসঙ্গীতের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিচালনায় অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল। বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' (১৯৫১), তুলসী লাহিড়ীর 'পথিক' (১৯৫৩) ও বনফুলের 'কবয়' (১৯৫৪) ছিল সংগঠনটির প্রথম পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য নাট্যাভিনয়। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কেন্দবিন্দু হওয়ায় সংসদের পরোক্ষ প্রভাব ছিল বহু বিস্তৃত। সংসদের প্রথম দিকের সভাপতি ছিলেন- খান সারওয়ার মুর্শিদ ও আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ।[৬৬]

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ

'প্রগতি লেখক সংঘের' কর্মকাণ্ড স্থিতিমিত হয়ে পড়লে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য অঙ্গনে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় পাকিস্তানবাদী সংস্কৃতি কর্মীরা সে সুযোগ পুরোপুরি গ্রহণ করেছিল। তারা বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য, প্রবহমানতা ও মানবিকতাকে খণ্ডিত করার ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। সৈয়দ আলী আহসান "দৈনিক আজাদ" ও সরকার পরিচালিত "মাসিক মাহেনও" পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখে নতুন সাহিত্যের গতিপথ নির্মাণে উদ্যোগী হয়। বাংলা সাহিত্যের পূর্ব ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলমানদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনকে অবলম্বন করে সাহিত্য সৃষ্টির কথা বলা হয়। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করার ও বাংলা ভাষা সংস্কারের পরামর্শও দেয়া হয়। এসব অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সাম্যবাদ ও বুর্জোয়া উদার নীতিতে বিশ্বাসী সাহিত্য কর্মীরা নতুনভাবে সংগঠিত হন। দীর্ঘদিন আলোচনা ও বিচ্ছিন্ন উদ্যোগের পর ১৯৫২ সালের শেষ দিকে ঢাকায় গঠিত হয় 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ'। ড. কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন এর প্রথম সভাপতি এবং প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন ফয়েজ আহমদ। এ সংগঠনের সঙ্গে আরো জড়িত ছিলেন- সওগাত পত্রিকার সম্পাদক মো. নাসির উদ্দিন, আতোয়ার রহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ, কামরুল হাসান, আবদুল গণি হাজারী, বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, আনিসুজ্জামান, আবদুল্লাহ আলমুতী শরফুদ্দীন প্রমুখ। সংসদের নিয়মিত পাক্ষিক সাহিত্যসভা হতো। এক একটি সভায় দেড়শ পর্যন্ত শ্রোতামণ্ডলী উপস্থিত থাকতেন। এসব নিয়মিত সাহিত্য সভা ছাড়াও অতিরিক্ত বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হতো। যেমন, ১৯৫২-৫৩ সালে ম্যাক্সিম গোর্কি, ১৯৫৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও ১৯৫৫ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কিত বিশেষ সভা অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৩ সালে এ সংগঠনের উদ্যোগে কবি হাসান হাফিজুর

রহমানের সম্পাদনায় 'একুশের প্রথম সংকলন' প্রকাশিত হয়। এ সংসদের অন্যতম প্রধান সাফল্য ছিল ১৯৫৪ সালে সর্বদলীয় সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠান।[৬৭]

মূলকথা মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক কর্মকাণ্ড, ধর্মান্ধ ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার বিরুদ্ধে এটাই ছিল ১৯৪৭ উত্তরকালে সবচেয়ে শক্তিশালী, সুসংগঠিত ও প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ধারার সাংস্কৃতিক সংগঠন। এ সংসদের সাথে সম্পৃক্ত কর্মী, সংগঠক ও বুদ্ধিজীবীরা বাঙালির সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৬৮]

ছায়ানট

১৯৬১ সালে ছায়ানট সাংস্কৃতিক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃতি চর্চায় দেশীয় ঐতিহ্য ও প্রকৃতিমুখী হওয়া। রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী পালন, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্রভাবনাকে কেন্দ্র করে ছায়ানট তার পথচলা শুরু করে। বিচারপতি মাহবুব মুর্শেদ, গোবিন্দ চন্দ্র দেব, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী প্রমুখ বুদ্ধিজীবী ও কিছু সংস্কৃতি কর্মীদের উদ্যোগে ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উৎসব সফলভাবে সমাপ্ত হয়। পরবর্তীতে সুফিয়া কামাল, মোখলেসুর রহমান, সায়েরা আহমদ, ওয়াহিদুল হক, সানজীদা খাতুন, সাইফউদ্দীন আহম্মদ মানিকসহ বহু অনুপ্রাণীত কর্মী সাংস্কৃতিক আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য একটি সমিতি করার সিদ্ধান্ত নেন। তাদের সে উদ্যোগেই এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ছায়ানট প্রতিষ্ঠার পর-পরই বাঙালিকে তার গানের ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দিতে ঘরোয়া পরিবেশে আয়োজন করে সঙ্গীত অনুষ্ঠান 'শ্রোতার আসর'। ছায়ানটের মূল অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল-রমনা বটমূলে বর্ষবরণ, জাতীয় দিবস পালন (শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস), রবীন্দ্র-নজরুল জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন, ঋতু উৎসব (বর্ষা, শরৎ, বসন্ত), লোকসঙ্গীতের উৎসব, নাট্যোৎসব, দেশঘরের গান, শুদ্ধসঙ্গীত উৎসব, নৃত্যোৎসব প্রভৃতি। এছাড়া ছায়ানট মাসিক নির্ধারিত বক্তৃতামালার আয়োজন করতো। এসব অনুষ্ঠানে নানাভাবে দেশজ পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হতো। মূলত সঙ্গীতকে ঘিরে বাঙালির সংস্কৃতি সাধনার সমগ্রতাকে বরণ ও বিকশিত করতে ছায়ানট উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে। ক্রমে গুণী সঙ্গীত শিল্পী, চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, নাট্যশিল্পী, চলচ্চিত্র শিল্পী, বিজ্ঞানী, সমাজব্রতী নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের সৃজনশীল সংস্কৃতি চর্চার মিলনমঞ্চ হয়ে উঠে ছায়ানট। সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ পর্যন্ত বাঙালির সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সব পথ পরিক্রমায় ছায়ানট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

স্বাধীনতার পর সংস্কৃতি ও সঙ্গীত চর্চাকে আরও ব্যাপক ও নিবিড় করে তোলার সৃষ্টিশীল সাধনায় ছায়ানট নিমগ্ন রয়েছে।

সঙ্গীত ছাড়াও ছায়ানট কিছু মানবিক কাজ করে থাকে। তার মধ্যে অন্যতম হলো-প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত মানুষকে সাহায্য সহযোগিতা করা। ষাটের দশকের শুরুতে দেশের দক্ষিণোপকূলে ঘূর্ণিঝড় গোর্কি আঘাত হানলে সেখানকার লোকজনের জন্য সরকারি অনুদান ছাড়াই ছায়ানট ত্রাণ বিতরণ করে। এছাড়া ১৯৭০ সালের জলোচ্ছ্বাস ও উত্তরাঞ্চলের মঙ্গা এবং পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত মানুষের পাশে ছিল এ সংগঠনটি।

স্বাধীনতার পূর্বে বাংলা একাডেমী, ইংলিশ প্রিপারেটরি স্কুল (বর্তমান উদয়ন উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পুরাতন অস্থায়ী গৃহ), আজিমপুর কিন্ডারগার্টেন (বর্তমান অগ্রণী বালিকা বিদ্যালয়) এবং কলাবাগান লেক সার্কাস হাইস্কুলে স্থানান্তরিত হয়ে কাজ চালিয়ে এসেছে ছায়ানট। স্বাধীনতার পর দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুল ভবনে ছিল তাদের কার্যালয়। পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ধানমন্ডিতে তাদের স্থায়ী কার্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য এক বিঘা জমি বরাদ্দ দেন। এ জমিতেই নির্মিত হয়েছে ‘ছায়ানট সংস্কৃতি ভবন’।[৬৯]

উদীচী

১৯৬৮ সালের ২৯ অক্টোবর এ সাংস্কৃতিক সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। উদীচী অর্থ ঊষালগ্নে উত্তর আকাশে উঠা দিক নির্দেশক ধ্রুব তারা। শিল্পচর্চার মাধ্যমে সকল প্রকার আর্থ-সামাজিক শাসন-শোষণ, বৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি ছিল উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য। সত্যেন সেন ছিলেন এ সংগঠনের প্রধান উদ্যোক্তা। এছাড়া প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তিত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- গোলাম মোহাম্মদ ইদু, রনেশ দাস গুপ্ত, মঞ্জুরুল আহসান খান প্রমুখ। এ শিল্পীগোষ্ঠী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আন্দোলনের পটভূমি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদীচীর মঞ্চায়িত ‘আলো আসছে’, ‘শপথ নিলাম’ প্রভৃতি নাটক স্বাধীনতার চেতনাবোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। দেশের বেশিরভাগ প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী উদীচীর গণজাগরণমূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেন। আবুল ফজল, কবীর চৌধুরী, কলিম শরাফী, শেখ লুৎফর রহমান, সানজীদা খাতুন, জহির রায়হান, সরদার ফজলুল করিম, জাহানারা ইমাম, পান্না কায়সার প্রমুখ বরণ্যে লেখক ও শিল্পী-সাহিত্যিকগণ উদীচীর কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করায় বহুলোক উদীচীর সঙ্গে সম্পৃক্ত হন।

স্বাধীনতার পর দেশের সাংস্কৃতিক নীতি নির্ধারণে উদীচী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের বিভিন্ন স্থানে উদীচীর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সারা দেশে উদীচীর ২৪০টি শাখা ও প্রায় ১০০০০ কর্মী রয়েছে। এছাড়া আমেরিকা, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও ফ্রান্সে উদীচীর শাখা রয়েছে। ১৯৭৫ সালে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর উদীচী আর কোন সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পায়নি। প্রগতীশীল ও উদার নীতির কারণে বরং এ সংগঠনটি পরবর্তীতে মৌলবাদীদের দ্বারা বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হয়। ১৯৯৯ সালে যশোরে এবং ২০05 সালে নেত্রকোণায় উদীচীর সম্মেলনে গ্রেনেড হামলা চালায় মৌলবাদী দুষ্কৃতিকারীরা। এসময় এ সংগঠনের বহু শিল্পী-কর্মী হতাহত হয়। বিভিন্ন বাঁধা-বিঘ্ন পেরিয়ে এ সংগঠনটি আজও দেশের সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে নানাভাবে অবদান রেখে চলেছে।[৭০]

এছাড়া আরো কিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে অগ্রসরমান করেছিল। সেগুলো হলো- অগ্রণী শিল্পী সংঘ, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী (বাফা), ঐক্যতান, ক্রান্তি শিল্পী গোষ্ঠী, গণ শিল্পী গোষ্ঠী প্রভৃতি। এছাড়াও ১৯৬২ সালের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিক বেশকিছু সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে উঠে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল বহুব্রীহি, সুন্দর, বৈকালিক, অবকাশ, সূর্য সৈনিক, কৌণিক, স্পন্দন, কালচক্র প্রভৃতি। এ সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো কবিতা, নাটক, সঙ্গীত, বিশেষত গণসঙ্গীত পরিবেশন করে পূর্ববাংলার গণমানুষকে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।[৭১]

পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও অনুষ্ঠানসমূহ

এসময় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও তাদের বিভিন্নমুখী কার্যক্রমের পাশাপাশি ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও অনুষ্ঠানসমূহ দেশীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐহিত্য রক্ষায় বেশ সহায়ক ও উদ্দীপনামূলক কাজ করেছিল। সর্বোপরি বাঙালির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও মুক্তির সংগ্রামে এসব সম্মেলন ও অনুষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল। নিম্নে এ সকল সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও অনুষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন (ঢাকা, ১৯৪৮-১৯৪৯)

'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন' ১৯৪৮ সালের ৩১ ডিসেম্বর এবং ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের উদ্যোক্তা ছিলেন পূর্ববাংলা সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী

হাবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী। সম্মেলনে মূল সভাপতি ছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। বাংলা কবিতা, শিশু সাহিত্য, লোক সাহিত্য, পুঁথি সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব ছাড়াও এতে বাঙালির ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষাভাবনা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। মূল সভাপতি ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। শিক্ষা ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি তার বক্তব্যে তুলে ধরেন।[৭২] প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোন আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছে যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।"[৭৩] ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এ বক্তব্য শুধু সেদিনের নয়, আজকের দিন এবং অনাগত ভবিষ্যৎ কালেও বাঙালির আত্মপরিচয় জিজ্ঞাসায় অমর বাণী হিসেবে বিবেচিত হবে। বস্তুত সেদিন পণ্ডিত শহীদুল্লাহর ঐ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের সাংস্কৃতিক অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল।[৭৪] এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্যে ছিল পাকিস্তানি সাহিত্যের পুনঃজাগরণ, কিন্তু সম্মেলনের সভাপতির বক্তব্যে সরকারের সে আশার গুড়ে বালি হয়।[৭৫]

পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন (চট্টগ্রাম, ১৯৫১)

দেশ বিভাগের পর চট্টগ্রামের প্রগতিশীল সাহিত্যকর্মীরা পর-পর দু'টি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। একটি 'সংস্কৃতি পরিষদ' অপরটি 'প্রান্তিক'। এ দু'টি সংগঠন যৌথভাবে ১৯৫১ সালের ১৬ মার্চ তারিখে চট্টগ্রামের হরিখোলার মাঠে 'পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলনের' আয়োজন করে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল ও মূল সভাপতি ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। পূর্ববাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সম্মেলনে সর্বাধিক প্রাধান্য দেয়া হয়। সম্মেলনের মূল প্রস্তাব ছিল- 'সমাজ পরিবর্তনে সাহিত্যের ভূমিকা সম্পর্কে'।[৭৬]

পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন (কুমিল্লা, ১৯৫২)

১৯৫২ সালের ২২, ২৩ ও ২৪ আগস্ট কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয় 'পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন'। এ সম্মেলনের উদ্যোক্তা সংগঠন ছিল 'কুমিল্লা প্রগতি মজলিস'। ফরওয়ার্ড ব্লক, যুবলীগ, কমিউনিস্ট পার্টি ও রেভোলিউশনারি সোসালিস্ট পার্টির ন্যায় প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর শাখাসমূহ এতে সহযোগিতা করে। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, সরকার বিরোধী সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহ এখানে জমায়েত হয়েছিল। এই সম্মেলনেও মূল সভাপতি ছিলেন আবদুল

করিম সাহিত্য বিশারদ। সম্মেলনের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ছিল- সাহিত্যালোচনা, সঙ্গীতানুষ্ঠান, চিত্র-প্রদর্শনী ও পুথি-প্রদশর্নী। মূল সভাপতি আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ তার বক্তৃতায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির তৎকালীন অবস্থা, রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কিত বিতর্ক, সাহিত্যে বিভিন্ন আদর্শের সংঘাত প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেন। রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আজ বোধ হয় তাঁহারা দেশকে পাপে ডুবাইতে চাহেন, যাঁহারা প্রশ্ন তুলিয়াছেন বাঙ্গালা ভাষা আমাদের সংস্কৃতির বাহন হইতে পারে না। সংস্কৃতি ধ্বংসের অনেক পথ আছে। জনসাধারণবিরোধী ও সমাজবিরোধী গোঁয়ারনীতি তার অন্যতম উপায় বটে। কিন্তু তার পরিনামফল পারস্যে আরবদের ভাগ্যের মতই হইতে বাধ্য।"[৭৭] বাংলা ভাষা আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টার নিন্দা করে সম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। মূলত কুমিল্লা সম্মেলন এদেশের সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবতাবাদ ছিল এ সম্মেলনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।[৭৮]

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন (ঢাকা, ১৯৫৪)

পূর্ববাংলার কিছু প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীরা উদ্যোগী হয়ে ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে (২৩-২৭ এপ্রিল) ঢাকায় পাঁচ দিনব্যাপী এ সম্মেলনের আয়োজন করে। এর পিছনের অনুপ্রেরণা ছিল মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠন। সম্মেলনে প্রায় প্রতিটি জেলা থেকে সাংস্কৃতিক কর্মীরা অংশগ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও বেশ কিছু সাংস্কৃতিক কর্মী এ সম্মেলনে যোগদান করে। সম্মেলনের মূল নীতিতে ১০৮ জন শিল্পী-সাহিত্যিক স্বাক্ষর প্রদান করেন। এতে পূর্ববাংলার লেখক, শিল্পী ও সাহিত্যানুরাগীদের মধ্যে ব্যাপকতম ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' সঙ্গীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তার বক্তব্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সরকার ও তার অনুগত শিল্পী-সাহিত্যিকদের ষড়যন্ত্রের সমালোচনা করেন। সম্মেলনের কর্মসূচিসমূহের মধ্যে ছিল- বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ, গণসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, নৃত্যনাট্য, লোকনাট্য, ছায়ানাটক, চিত্র ও পুস্তক প্রদর্শন, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতি। এ সম্মেলনে মূলত অসাম্প্রদায়িকতা ও দেশীয় সংস্কৃতির বিকাশের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল।[৭৯]

কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন (টাঙ্গাইল, ১৯৫৭)

১৯৫৭ সালে আওয়ামী লীগের কাগমারী সম্মেলনের সাথে অনুষ্ঠিত হয় 'কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন'। এর প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক ছিলেন আবু জাফর শামসুদ্দীন। ৮ ফেব্রুয়ারি ড. কাজী

মোতাহার হোসেনের সভাপতিত্বে সম্মেলন শুরু হয়। সম্মেলন ১০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলে। সম্মেলনে ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করা হয় এবং বক্তৃতা প্রদান করা হয়। আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে ছিল- বাউলগান, সারিগান, যাত্রাগান, পালাভিনয়, জারিগান, লাঠিখেলা প্রভৃতি। সম্মেলনকে আন্তর্জাতিক চরিত্র দেয়ার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, মিশর ও ভারতের শিল্পীগণ এতে যোগদান করেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষার জন্য রক্তদানের যে বিরল দৃষ্টান্ত পূর্ববাংলার মানুষ তৈরী করেছিল, সম্মেলনে সে বিষয়টির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানানো হয়। কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব এখানেই যে, একই সময়ে সেখানে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশনের বিরাট রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল। তবে সাংস্কৃতিক সম্মেলনের বৈশিষ্ট্যগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। উদ্যোক্তাগণ কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি দ্বারা যে আচ্ছন্নচিত্ত ছিলেন না, সেটা ছিল লক্ষ্য করার মতো বিষয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙালির মিলিত প্রয়াসে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি সম্ভব এবং দুই বঙ্গের সংস্কৃতির মূল মূলত অভিন্ন, সম্মেলন এ ধারনাকে স্পষ্ট করেছিল। এ সম্মেলনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল- শহুরে ও গ্রামীণ সংস্কৃতিকে মেলাবার প্রয়াস। এছাড়া বিদেশি শিল্পীদের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের বিষয়টিও ছিল অন্যতম একটি প্রধান দিক।[৮০]

উপরিউল্লিখিত এসব সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সম্মেলনে বাংলা ভাষার পক্ষে জোর দাবি উচ্চারিত হয়। জাতির সামনে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিবর্তনধারা তুলে ধরা হয়। এ সম্মেলনসমূহে অংশগ্রহণ করে দেশের সকল বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ঐতিহাসিক, অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীগণ বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধারাকে শাক্তিশালী করেছেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও বিকাশের ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি বাঙালির মুক্তি সংগ্রামকে বেগবান করে তোলার ক্ষেত্রে উপরিউল্লিখিত এ সকল সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্মেলনের ভূমিকা অনস্বীকার্য।[৮১]

রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালন

১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানেও এ অনুষ্ঠান পালনের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন উদ্যোগ গ্রহণ করে। সামরিক সরকার দৃশ্যত কোন উচ্চবাচ্য না করলেও পাকিস্তানপন্থী বুদ্ধিজীবীরা এ রবীন্দ্র উৎসবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন। 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা ছিল রবীন্দ্রনাথ বিরোধী এ প্রচারনার মুখপাত্র। ১৯৬১ সালের এপ্রিল-মে মাসে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রায় দু'ডজন প্রবন্ধে

রবীন্দ্রনাথকে মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু ও তার সাহিত্যকে পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থী বলে প্রত্যাখান করা হয়। আর শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের পাকিস্তান বিরোধী বলে অভিযুক্ত করা হয়।[৮২] ঐ একই গোষ্ঠী দেশের বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি আলোচনা সভা করে তাদের বক্তব্য প্রচার করতে থাকে। ১৯৬১ সালের ৭ মে ঢাকা জেলা কাউন্সিল হলে অনুষ্ঠিত সভায় রবীন্দ্র সাহিত্যকে হিন্দু ও ভারতীয় সাহিত্যের সাথে অভিন্ন বলে মত প্রকাশ করে বলা হয় যে, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আগ্রহ-আতিশয্যের রাজনৈতিক তাৎপর্য হচ্ছে পাকিস্তানের জাতীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রকে বানচাল করে 'অখণ্ড ভারতীয় রামরাজ্য' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়তা করা। সুতরাং যারা এ কাজে নিযুক্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য এবং রবীন্দ্রনাথসহ সমগ্র 'বিজাতীয় সঙ্গীত সাহিত্যের' চর্চা পূর্ব পাকিস্তানে নিষিদ্ধ করে দিয়ে খাঁটি পাকিস্তানি সংস্কৃতির চর্চা করার জন্য সরকার ও দেশবাসীর প্রতি আহবান জানানো হয়। এ সভায় বক্তৃতা করেন গোলাম আযম, ফজলুল হক সেলবর্ষী, কবি খান মঈনুদ্দিন, দেওয়ান আবদুল হামিদ, মওলানা মহিউদ্দিন প্রমুখ। তবে এ সভার আগেই ঢাকা ও প্রদেশের অন্য কয়েকটি শহরে রবীন্দ্রানুরাগীরা নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান পালন করেন। এসব অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ছিল- প্রবন্ধপাঠ, সাহিত্য প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, সঙ্গীত, গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, নাটক মঞ্চায়ন, চিত্র ও পুস্তক প্রদর্শনী, শিশুদের অনুষ্ঠান প্রভৃতি। এর ফলে বহুদিনের জড়তা ও স্তব্ধতা কেটে গিয়ে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একটি বড় প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। শুধু ঢাকাতেই তিনটি প্রধান কমিটি ভিন্ন- ভিন্নভাবে অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। কবি সুফিয়া কামাল, অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল হাই, বিচারপতি এস.এম. মুর্শেদ প্রমুখ এসব অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ও তার সৃষ্টিকে বিশ্ব সাহিত্যের সম্পদ তথা পূর্ববাংলার সংস্কৃতি ও জনজীবনের অনুকূল উপাদান বলে উপস্থাপন করেন। ড. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন রবীন্দ্রনাথকে সমগ্র পৃথিবীর বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধার পাত্র বলে মত প্রকাশ করেন।[৮৩]

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ

১৯৬৩ সালের ২২–২৮ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার মিলনায়তনে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' পালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড এবং পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা যৌথভাবে এর আয়োজন করেছিল। এতে ছবি প্রদর্শনী, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাঙালিয়ানার গৌরব জাগিয়ে তোলা হয় হাজার হাজার দর্শক-শ্রোতার অন্তরে।[৮৪] অনুষ্ঠানের মূল প্রেরণা ছিল বাংলা বিভাগের ছাত্র ও শিক্ষকদের অভিজ্ঞতাকে চার দেয়ালের পরিধি, পুথির পরিবেষ্টন ও গবেষণার অনুবীক্ষণ থেকে বিস্তৃত করে সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে দেশবাসীর কৌতুহল, শ্রদ্ধা আর চেতনা বৃদ্ধি করা। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য

সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা দেয়ার জন্য অনুষ্ঠানটির অত্যধিক গুরুত্ব রয়েছে। সাম্প্রদায়িক ভাবনা অনুষ্ঠানের কর্মসূচিতে প্রতিফলিত হয়নি, যদিও অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল মধ্যযুগের ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য কর্মে। এ ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি ও ঐতিহ্য সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা সেসময় নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয় ছিল।[৮৫]

পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান পালন

পহেলা বৈশাখ বাঙালিদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থবহ দিন। বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানমালার মাধ্যমে বাংলা সনের ১ম দিনটি পালন করা বাঙালি সংস্কৃতির অতি প্রাচীন রীতি। ব্যবসায়ীরা এদিনে হাল খাতা খোলে ও গ্রাম-গঞ্জে মেলা বসে।[৮৬] পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে উৎসবটি ক্রমশ গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছিল এবং নববর্ষ পালনের বিষয়টি ধীরে ধীরে কমে আসছিল। কারণ পাকিস্তানিরা এ অনুষ্ঠান পালনকে দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা হিসেবে দেখত।[৮৭] কিন্তু ১৯৬১ সালের পরবর্তী বছরগুলোতে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের সংখ্যা আবার বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৬৪ সালের ১লা বৈশাখ প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়। তখন এটি রীতিমত জাতীয় উৎসবের আকার ধারণ করে। প্রাদেশিক সরকার দিনটিকে ছুটি হিসেবে ঘোষণা করে। সেদিন (১৯৬৪ সালের ১লা বৈশাখ) ঢাকার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অভূতপূর্ব জনসমাগম দেখা যায়। বাংলা একাডেমী, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, ছায়ানট, পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস, নিক্কন ললিতকলা কেন্দ্র, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ, সমাজকল্যাণ কলেজ ছাত্র সংসদ, গীতিকলা সংসদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বর্ষবরণের অনুষ্ঠান আয়োজন করে। বাংলা একডেমী প্রাঙ্গনে 'ঐক্যতান' গোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে এত দর্শক-শ্রোতা ছিল যে, ভিড়ের চাপে কয়েকজন আহত হয়। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে হাঙ্গামার কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দর্শক সংখ্যা দেখে কোন-কোন পত্রিকা বিস্ময় প্রকাশ করেছিল।[৮৮]

মহাকবি স্মরণোৎসব ও আফ্রো-এশীয় সাহিত্য-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

১৯৬৮ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দু'টি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিশেষ অগ্রগতি নির্দেশ করে। প্রথমটি ছিল- মহাকবি স্মরণোৎসব আর দ্বিতীয়টি ছিল আফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠান। নিম্নে এ দু'টি অনুষ্ঠান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

মহাকবি স্মরণোৎসব

ঢাকার কারিগরি মিলনায়তনে ১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে উপমহাদেশের বাংলা ও উর্দু সাহিত্যের পাঁচজন খ্যাতনামা কবির স্মরণে উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। তারা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মীর্জা গালিব, আল্লামা ইকবাল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ পাঠ, আলোচনা, কবিতা আবৃতি, গান-মুশায়রা, নৃত্যনাট্য-নাটক মঞ্চায়ন ইত্যাদির মাধ্যমে পাঁচদিন পাঁচজন কবির সামগ্রিক পরিচয় ও গুরুত্ব তুলে ধরা হয়।

আফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

এশিয়া ও আফ্রিকার মুক্তিকামী জনগণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এ অনুষ্ঠানটি ১৯৬৮ সালের ২০ এবং ২১ ডিসেম্বর ঢাকার কারিগরি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। কবিতা, প্রবন্ধ পাঠ, গণসঙ্গীত, নাটক, আলোচনা প্রভৃতি ছিল অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু। অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল– সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসীবাদের বিরোধিতা ও নির্যাতিত মানুষের মুক্তি। দ্বিতীয় দিনের প্রবন্ধ পাঠ অনুষ্ঠানের সভাপতি সিকান্দার আবু জাফর বলেন– আফ্রো এশিয়ার নিপীড়িত মানুষের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হয়ে পাকিস্তানের নির্যাতিত জনগণকেও শোষকদের তৈরী দেয়াল ভেঙ্গে ফেলতে হবে।[৮৯]

উপরিউল্লিখিত সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং সংগঠনগুলোর নানামুখী কার্যক্রম, পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও অনুষ্ঠানমালা ছাড়াও সাংস্কৃতিক স্বৈরাচার বিরোধী নানা আন্দোলন ও প্রতিবাদ কর্মসূচিতেও পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক কর্মী, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় আবার কখনো আপামর জনসাধারণ বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করেছে। নিম্নে সে সকল আন্দোলন ও প্রতিবাদ কর্মসূচি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

ভাষা আন্দোলন

ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এ আন্দোলন যতটা না ছিল সাংস্কৃতিক, তার চেয়ে বেশি ছিল রাজনৈতিক।[৯০] পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন বৈষম্যমূলক আচরণ, শোষণ ও অত্যাচার-নির্যাতনের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালি জাতির প্রথম প্রতিবাদ, বিদ্রোহ ও সফলতা। ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বাংলার দামাল ছেলেরা বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত করেছিল ঢাকার রাজপথ। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর পশ্চিম পাকিস্তানি শাষকগোষ্ঠী বাঙালিদের নানাভাবে শোষণ করতে থাকে। সে শোষণের জের হিসেবে তারা

বাংলা ভাষার উপরও আঘাত হানে। কারণ তারা ভালভাবেই জানত যে, বাঙালি জাতিকে শোষণ করতে হলে তাদের সংস্কৃতিকে সর্বাগ্রে ধ্বংস করতে হবে। সে পরিকল্পনা মাফিক তারা ধর্মের দোহাই দিয়ে সর্বাগ্রে বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ করে। তাদের পরিকল্পনা ছিল এক ধর্ম, এক জাতি, এক রাষ্ট্রের জিগির তুলে দেশটাকে অজ্ঞতা ও মূর্খতার অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখে চিরকাল শাসন চালিয়ে যাবে।[৯১]

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বুদ্ধিজীবী মহলে সর্বপ্রথম বির্তক শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বিভিন্ন যুক্তিতর্কের মাধ্যমে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পাল্টা প্রস্তাব প্রদান করেন। এছাড়া বহু প্রখ্যাত, স্বল্পখ্যাত ও অখ্যাত লেখক ১৯৪৭ সালের মধ্যেই বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রতি তাদের ব্যাপক সমর্থন জানিয়েছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা-লেখির পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার করার জোড় দাবি উত্থাপন করা হয়।[৯২] ১৯৪৭ সালের ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর 'পূর্ব পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগের' এক কর্মী সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা বাংলা ভাষা করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৯৩] আর সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে? সে বিষয়ে জনগণের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়া 'তমদ্দুন মজলিশ' নামক একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে আলাপ-আলোচনা, সভা-সমিতি ইত্যাদি ব্যাপারে প্রথম থেকেই বেশ সক্রিয় ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাশেমের উদ্যোগে ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর মজলিশের পক্ষ থেকে 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শীর্ষক একটি বই প্রকাশিত হয়।[৯৪] এসব কার্যক্রমের ফলে পূর্ববাংলার শিক্ষিত সমাজ ও ছাত্র সমাজের মধ্যে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে একটি প্রবল জনমত তৈরী হয়।

উল্লেখ্য যে, ইতোমধ্যে পাকিস্তান গণপরিষদে সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও উর্দুকে নির্বাচন করা হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনে উপরিউক্ত দু'টি ভাষার সঙ্গে বাংলাকেও গণপরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব দেন।[৯৫] (উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ পাক-হানাদার বাহিনী শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও তার পুত্রকে বাসা থেকে আটক করে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে নির্মমভাবে গুলি করে হত্যা করে।

অধ্যাপক আনিসুজ্জামান অবশ্য উল্লেখ করেছেন যে, মার্চ মাসে কুমিল্লায় সামরিক বাহিনীর লোকেরা তাকে হত্যা করে।[৯৬] কারণ, ভাষা আন্দোলনে পাকিস্তানিদের যে পরাজয় হয়েছিল, তা তারা কোনদিনই সহজভাবে মেনে নেয়নি। তারা ১৯৭১ সালে এসে শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে হত্যা করে তার প্রমাণ দেয়।) কিন্তু গণপরিষদে লিয়াকত আলী খান উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র সরকারি ভাষা হিসেবে ঘোষণা করেন। নানা ধরনের আলোচনা ও বিতর্কের পর ভোটে শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পূর্ববাংলায় ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। গণপরিষদে লিয়াকত আলী খানের ঘোষণার প্রতিবাদে পূর্ববাংলার ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী সাংবাদিক নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ এক নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ছাত্রবৃন্দ ধর্মঘট পালন করেন। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রামকে গতিশীল করার জন্য ২ মার্চ (১৯৪৮) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। পরিষদের উদ্যোগে ১১ মার্চ (১৯৪৮) পূর্ববাংলার সর্বত্র সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ধর্মঘট চলাকালে পুলিশ-ছাত্র সংঘর্ষ হয়। এতে ৫০ জন ছাত্র গুরুতর আহত হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের কনভেনর নঈমুদ্দীন আহমদ অবশ্য এক বিবৃতিতে বলেন যে, ১১ মার্চ ধর্মঘটে ২০০ জন আহত হন, ১৮ জন গুরুত্বর আহত হন, ৬৯ জনকে জেলে বন্দী করা হয় এবং মোট ৯০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। (এদের মধ্যে অনেককে অবশ্য পরে ছেড়ে দেয়া হয়)।[৯৭] এরপর থেকেই ভাষা আন্দোলন নতুন গতি পায় এবং সাধারণ জনগণ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি অনুধাবন করে মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন রাষ্ট্রভাষা কমিটির সঙ্গে ১৫ মার্চ (১৯৪৮) আলোচনায় বসতে বাধ্য হন। উক্ত আলোচনা সভায় গুরুত্বপূর্ণ ৮ দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিতে ভাষা আন্দোলনকারীদের মধ্যে যারা ইতঃমধ্যে গ্রেফতার হয়েছিল তাদের মুক্তির ব্যাপারে জোর দাবির কথা উল্লেখ ছিল। আর এপ্রিলে (১৯৪৮) অনুষ্ঠিতব্য পূর্ববাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষার করার বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য বলা হয়। পাশাপাশি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কারো বিরুদ্ধে যেন কোন ব্যবস্থা না নেওয়া হয় সে বিষয়টিও উল্লেখ ছিল।[৯৮]

ইতোমধ্যে পুর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। অধিবেশনে ভাষার বিষয়টি উপেক্ষা করা হলে ছাত্ররা নতুন করে আন্দোলন শুরু করে। চুক্তি বাস্তবায়নে নাজিমউদ্দীন কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা জানার জন্য ছাত্ররা ১৭ মার্চ (১৯৪৮) প্রাদশিক পরিষদের সভাকক্ষের দিকে মিছিল সহকারে অগ্রসর হলে পুলিশ লাঠিচার্জ ও ফাঁকা গুলি করে মিছিলটি ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ছাত্রদের এ

আন্দোলনে নাজিমউদ্দীন ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। তিনি গর্ভনর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে যথাশীঘ্র সম্ভব পূর্ববাংলা সফরে আসার আহ্বান জানান। ১৯৪৮ সালের ১৯ মার্চ পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় আসেন। ২১ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দুর কথা ঘোষণা করেন।[৯৯] তাৎক্ষণিকভাবে বাংলার ছাত্র সমাজ ও পরে সর্বস্তরের মানুষ ঐ ঘোষণার তীব্র প্রতিবাদ করে। জিন্নাহর এ স্বৈরাচারী মনোভাব পূর্ববাংলার বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ২৪ মার্চ (১৯৪৮) রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক প্রতিনিধিদল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করে একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন। স্মারকলিপিতে তারা বিশেষভাবে দাবি করেন যে, বাংলা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত এবং যে পর্যন্ত তাদের এ দাবি আদায় না হবে, সে পর্যন্ত এ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে।[১০০] এরপর ১৯৪৮ সালের ১৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় এসে এক বক্তব্য প্রদানকালে পুনরায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দেন। ছাত্র-জনতা এই ঘোষণারও তীব্র প্রতিবাদ করে। এসময় সারা পূর্ব পাকিস্তানেই ভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। আর তখন এ আন্দোলনের বিপক্ষে সরকারের অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রাও বাড়তে থাকে। এছাড়া জিন্নাহর পূর্ববাংলা সফরের পর ভাষা আন্দোলনে কিছুটা ভাটা পড়ে। তবে ছাত্ররা ১৯৪৮ সালের পর থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর ১১ মার্চ পালন করতো। ইতোমধ্যে ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান বাঙালি হয়েও বাংলা বর্ণমালাকে আরবিকরণের পরিকল্পনা করেন। এ উদ্দেশ্যে একটি কমিটিও গঠিত হয়। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদ এবং বুদ্ধিজীবী মহলের সমালোচনার কারণে সরকারের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এরপর ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান গণপরিষদের সাংবিধানিক মূলনীতি কমিটির এক রিপোর্টে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হয়। এর প্রতিবাদে ঢাকায় 'সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়। উক্ত সংগ্রাম কমিটি ৪ ও ৫ নভেম্বর (১৯৫০) ঢাকায় জাতীয় মহাসম্মেলন করে এবং ১২ নভেম্বর (১৯৫০) পূর্ববাংলায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং উর্দুর সঙ্গে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি অব্যাহত রাখে। শেষ পর্যন্ত সরকার রিপোর্টটি প্রত্যাহার করে নেয়। এরপর ভাষা আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সংগ্রামী ও উৎসাহী ছাত্র ১৯৫১ সালে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। এ পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন ভাষা সৈনিক আব্দুল মতিন।[১০১]

এরপর ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন পল্টন ময়দানের এক জনসভায় ঘোষণা করেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। এ ঘোষণার ফলে ছাত্র-শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী মহলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় এবং আন্দোলন নতুন মাত্রা লাভ করে। নাজিমউদ্দীনের ঘোষণার প্রতিবাদে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রাভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ৩০ জানুয়ারি (১৯৫২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট ও সভা আহ্বান করে। ৩০ জানুয়ারির সভায় ৪ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) ঢাকা শহরে ছাত্র ধর্মঘট, বিক্ষোভ মিছিল ও ছাত্রসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আন্দোলনকে সর্বাত্মক রূপদানের লক্ষ্যে ৩১ জানুয়ারি 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রাভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এর আহ্বায়ক ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব। উক্ত পরিষদ ৪ ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি সমর্থন করে এবং ২১ ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল, বিক্ষোভ মিছিল ও সভার কর্মসূচি ঘোষণা করে।[১০২] কিন্তু পাকিস্তান সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি রাত থেকে এক মাসের জন্য সারা ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সকল প্রকার সভা, সমাবেশ, মিছিল ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সরকারের এ ঘোষণা ছাত্র সমাজকে আরও বিক্ষুদ্ধ করে তোলে। তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সভায় ১৪৪ ধারা ভাঙ্গা না ভাঙ্গা নিয়ে অনেক আলোচনা হয় এবং চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই আলোচনা সভা শেষ হয়।[১০৩] পরদিন ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় জড়ো হতে থাকে এবং তারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গাজীউল হক বটতলার সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।[১০৪] এ প্রসঙ্গে বশীর আল-হেলাল বলেন- ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ছাত্ররা, যুবলীগের নেতা-কর্মীগণ ও পৃথকভাবে কয়েকজন ছাত্রনেতা।[১০৫] ছাত্র সমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে। উল্লেখ্য যে, ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজের বহু ছাত্র-ছাত্রীরা এ মিছিলে যোগ দেয়। পুলিশ মিছিলে লাঠিচার্জ করে, কাদুনে গ্যাস ছাড়ে ও গুলি বর্ষণ করে। পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই রফিক উদ্দিন আহম্মদ ও আবদুল জব্বার শহীদ হন। আর ১৭ জনের মতো গুরুত্বর আহত হন। এদের মধ্যে রাত ৮টার সময় আবুল বরকত হাসপাতালে শাহাদত বরণ করেন।[১০৬] এ নির্মম ও বর্বোরচিত হত্যাকাণ্ডের কথা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। সমগ্র বাংলাদেশ বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে। ২১ ফেব্রুয়ারি এ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হয়, পুলিশ সেখানেও গুলি বর্ষণ করে এবং সেদিনও কমপক্ষে ২ জন শহীদ হন। ২১ ফেব্রুয়ারির ঘটনার দিন ও পরে কমপক্ষে ৬ জন শহীদ হয়েছিলেন বলে সরকারি বিবরণী থেকে জানা যায়।[১০৭] শহীদদের স্মরণে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ২৩ ফেব্রুয়ারি বর্তমান কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের এখানে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করেন। শহীদ শফিউর রহমানের বাবাকে দিয়ে ২৪ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারটি উদ্বোধন করানো

হয়। কিন্তু ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে দেয়। উল্লেখ্য যে, এর পরবর্তীতে (১৯৫৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি) সেখানেই কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। পরে কয়েক দফায় সম্পন্ন হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের কাজ। কিন্তু ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকবাহিনী শহীদ মিনারটি আবার ভেঙ্গে দেয়। এরপর ১৯৭৩ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার শহীদ মিনারটি পুনঃনির্মাণ করেন। এরপর ১৯৮৬ সালে এর পূর্ণরূপ দেয়া হয়।[১০৮]

অবশেষে পূর্ববাংলার সর্বস্তরের মানুষের আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার বাহ্যিক স্বীকৃতি দেয়। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন ২২ ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার করার বিষয়টি পাকিস্তান গণপরিষদ অধিবেশনে প্রস্তাবের জন্য পাশ করিয়ে নেন। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৫৪ সালে ৯ মে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে উর্দু ও বাংলাকে পাকিস্তানের সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সংবিধানের ২১৪ অনুচ্ছেদে বলা হয় 'দি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অব পাকিস্তান শ্যাল বি উর্দু অ্যান্ড বেঙ্গলি'।[১০৯] আর এ প্রক্রিয়ায় মাধ্যমেই বাংলা ভাষা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে।

এরপর ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হলে কিছু পশ্চিম পাকিস্তানি বুদ্ধিজীবী আইয়ুব খানকে ভাষার প্রশ্নটি পুনঃবিবেচনা করে শুধু উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। ১৯৬২ সালে তিনি যে সংবিধান রচনা করেন তাতে তিনি বাংলা ও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বহাল রাখেন। কিন্তু এরপরেও ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়সহ বিভিন্ন মহল এবং সরকারের কেউ কেউ বাংলা ভাষার উপর তাদের ক্রমাগত আক্রমণ অব্যাহত রাখে।[১১০]

পরিশেষে বলা যায় যে, বাঙালির জাতীয় জীবনে ভাষা আন্দোলনের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষা আন্দোলন একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হলেও কালক্রমে এটি রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। বাংলার ছাত্রসমাজের সঙ্গে অনেক রাজনৈতিক দল, রাজনীতিবিদগণ ও বহু শ্রেণি-পেশার মানুষ এ আন্দোলনকে সম্পৃক্ত হন। ফলে পূর্ববাংলায় স্বাধিকারের চিন্তা-চেতনা শুরু হয়। মূলত একুশের চেতনাই বাঙালিকে স্বাধিকার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। এ আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালি আত্মসচেতন হয়ে উঠে। তারা নিজেদের অধিকার আদায় করার জন্য লড়াই করতে প্রস্তুত হয়। পরবর্তী

আন্দোলনসমূহে ভাষা আন্দোলন অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। যেমন, ৬২– এর শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬–এর ছয় দফা আন্দোলন ও ১৯৬৯–এর দেশব্যাপী গণআন্দোলনের মূলে ছিল একুশের চেতনা ও অনুপ্রেরণা। মাতৃভাষার মর্যাদা আদায় করতে যেয়ে বাঙালির মধ্যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একতা তৈরী হয়। তারা শোষণ থেকে মুক্ত হবার কথা চিন্তা করতে শিখে। আর এভাবেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই জাতীয়তাবাদের চেতনা বিশেষভাবে কার্যকর হয়েছিল। এজন্য বলা যায় যে, একুশে ফেব্রুয়ারির সংগ্রামের পথ ধরেই স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব হয়েছে।[১১১]

আইয়ুব খানের ভাষানীতি ও সাংস্কৃতিক স্বৈরাচার বিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদ

সামরিক আইন জারির পর আইয়ুব খান নতুন উদ্যোমে জাতীয় সংহতি সাধনের চেষ্টা করেন। তার পরিকল্পনা ছিল এক জাতি, এক ধর্ম, এক ভাষা, এক সংস্কৃতি ও অভিন্ন ঐতিহ্য সৃষ্টি করা।[১১২] বাংলা ভাষাকে তারা হিন্দুদের ভাষা ও পাকিস্তানের জন্য বিপদজ্জনক মনে করে এদেশের জনগণের উপর উর্দুকে চাপিয়ে দেয়ার যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল, ১৯৫২ সালে তা ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু আইয়ুব খান মনে করতেন যে, দু'টি জাতীয় ভাষা থাকলে পাকিস্তানিরা কখনো এক জাতিতে পরিণত হবে না। সুতরাং জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রয়োজনে পাকিস্তানে একটি সাধারণ ভাষা প্রয়োজন। আর সে জন্য বাংলা ও উর্দুর মিশ্রণে একটি নতুন ভাষা তৈরী করতে হবে এবং তা লিখতে হবে রোমান বর্ণমালায়। আইয়ুব খানের এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নবগঠিত 'শিক্ষা কমিশন' ও 'বাংলা একাডেমী' বাংলা বর্ণমালার সংস্কার এবং বাংলা ও উর্দুর উপযোগী একটি সংশোধিত রোমান বর্ণমালা প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাংলা একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসানের নেতৃত্বে 'ভাষা সংস্কার কমিটি' দীর্ঘ স্বরসহ কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বর্ণ বাংলা বর্ণমালা থেকে বাদ দেয়ার সুপারিশ করলে গভর্নর মোনেম খান তাকে স্বাগত জানান। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে আইয়ুব খানের এ ষড়যন্ত্রের তীব্র প্রতিবাদ হয়। 'দৈনিক ইত্তেফাকে' এর প্রতিবাদে সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। ১৯৫৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র সংগঠনগুলোর উদ্যোগে আয়োজিত সভা-সমাবেশে রোমান হরফের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অনুষ্ঠিত আরো একটি সভায় রোমান হরফ প্রবর্তনের বিরোধিতা করে প্রস্তাব নেয়া হয়। ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও অধ্যাপক আবদুল হাই রোমান হরফের বিরোধিতা করে সারগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ১৯৬০ সালের শহীদ দিবসে এবং ১৯৬২ সালের শিক্ষা আন্দোলনেও রোমান হরফ প্রবর্তন চেষ্টার জোর বিরোধিতা করা হয়। পাশাপাশি ভাষা সংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধেও একই ধরনের প্রতিবাদ করা হয়। এ পর্বে বাংলা সাহিত্যের গতি পরিবর্তন করে

পাকিস্তানি সাহিত্যে পরিণত করার জন্য আইয়ুব সরকার বহু চেষ্টা করেন। যেমন, ১৯৫৯ সালে করাচীতে তিন দিনব্যাপী সাহিত্য সম্মেলন, ‘পাকিস্তান লেখক সংঘ’ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল- সাহিত্যের বিষয়বস্তু হবে পাকিস্তানের সংহতি ও ইসলামের আদর্শ।[১১৩]

১৯৬৭ সালে পাকিস্তান সরকারের রবীন্দ্রনাথ বিরোধী আন্দোলনের প্রতিবাদ

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় বাঙালিদের মধ্যে সাময়িকভাবে হলেও পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। গানে-কবিতায়-প্রবন্ধে-নৃত্যনাট্যে সাম্প্রদায়িকতা, ভারত বিরোধিতা ও জেহাদী জোশ জাগিয়ে তোলার ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। এজন্য ‘সমবায় লেখক সংঘ’ ও ‘National Writers War Front Abd-Allah Academy’ প্রতিষ্ঠা করা হয়। লেখক সংঘ প্রবর্তন করে ৬ই সেপ্টেম্বর পুরস্কার। আর NWWFAAA-এর কাজ ছিল ইসলামি ভাবাদর্শ প্রচার করা। এ সংস্থাটি ‘জেহাদের ডাক’, ‘জেহাদের শপথ’, ও ‘জেহাদের তাৎপর্য’ নামক পুস্তক ও ‘তাজাল্লি’ নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে। এছাড়া অনুপ্রেরণামূলক গান-কবিতার সংকলন ‘চির দুর্জয়’, ‘চির উন্নত মম শির’ ও ‘আমার সোনার দেশ’ ছিল উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা। নজরুল ইসলামকে মুসলমানদের কবি বানাবার চেষ্টা করে নজরুল একাডেমী। উল্লেখ্য যে, ১৯৬৪ সালে নজরুল একাডেমী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে এর কাজ শুরু হয় ১৯৬৭ সালে। ১৯৬৮ সালের ২৪মে একাডেমীর উদ্বোধন ও নজরুল জন্ম বার্ষিকী পালন করা হয়। নজরুল একাডেমীর প্রধান কাজ ছিল ইসলামি আদর্শকে বলিষ্ঠ করে তুলে ধরা এবং পাকিস্তানি সংস্কৃতির সংহতি ও বিকাশ সাধনের জন্য কাজ করা।[১১৪] ১৯৬৭ সালের ২২ জুন পাকিস্তানের তথ্য ও বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীন জাতীয় পরিষদে ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মর্যাদার পরিপন্থী এমন সকল রবীন্দ্র সঙ্গীত ভবিষ্যতে পাকিস্তান বেতারে প্রচার করা হবে না।[১১৫] আর অন্যান্য সঙ্গীতের প্রচারও হ্রাস করা হবে। এ ঘোষণা প্রদানের পর ঢাকার বিদ্বৎসমাজের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এর সমর্থনে ও প্রতিবাদে বিবৃতি প্রকাশ ও সভা করা শুরু হয়। তবে সরকারের ঐ ঘোষণার বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার জনগণের প্রতিবাদ ছিল সর্বজনীন ও স্বতঃস্ফূর্ত। এ বিষয়ে প্রথম প্রতিবাদী বিবৃতি দেন ১৯ জন বুদ্ধিজীবী। তারা সরকারের সিদ্ধান্তকে দুঃখজনক বলে অভিহিত করে বলেন, “রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বাংলা ভাষাকে যে ঐশ্বর্য দান করেছে, তাঁর সঙ্গীত আমাদের অনুভূতিকে যে গভীরতা ও তীক্ষ্ণতা দান করেছে তা রবীন্দ্রনাথকে বাংলাভাষী পাকিস্তানিদের কাছে সাংস্কৃতিক সত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত করেছে।”[১১৬] এছাড়া মাওলানা ভাসানী, ঢাকার এগারজন উর্দু কবি, তিনটি উর্দু প্রতিষ্ঠান, প্রাদেশিক পরিষদের স্বতন্ত্র দলের নেতা আসাদুজ্জামান খান ও খুলনার সত্তরজন

বুদ্ধিজীবী সরকারি নীতির বিরোধিতা করে বিবৃতি প্রদান করেন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্রান্তি, ছায়ানট, সৃজনী, অপূর্ব সংসদ, ঐক্যতান, সংস্কৃতি সংসদ, স্পন্দন, পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন গ্রুপ), আমরা কজনা, বাংলা ভাষা সংগ্রাম পরিষদ, বাণীচক্র, পূরবী ও খুলনার চৌদ্দটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এ ঘোষণার প্রতিবাদ জানায় এবং রবীন্দ্র সাহিত্যকে বাঙালিদের ঐতিহ্যের অন্তর্গত বলে দাবি করে। বিবৃতি প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ সভা এবং মিছিলও শুরু হয়। 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ' ও 'সংস্কৃতি সংসদ' প্রতিবাদ সভা করে ও বিক্ষোভ মিছিল বের করে। কবি জসীম উদ্‌দীনের বাসায় ঢাকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সভা করে ও প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মসূচি প্রণয়ন করে। 'ক্রান্তি' ও সমমনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ঢাকা প্রেসক্লাবে এ বিষয়ে একটি সভা করে। সভায় বক্তারা রবীন্দ্রনাথ ও পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানকে বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দাবি করেন। সংস্কৃতিকে তারা ভূগোল ও ইতিহাস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে ব্যাখ্যা করেন এবং বঙ্গ সংস্কৃতির উপর হামলা হলে ১৯৫২ সালের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে বলে হুঁশিয়ারী দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বেগম সুফিয়া কামাল। ড. কুদরত-ই-খুদার সভাপতিত্বে আরো একটি সভা হয় ঢাকার কারিগরি মিলনায়তনে। আবুল হাশিম, বদরুদ্দীন উমর প্রমুখ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বক্তারা বলেন যে, সংস্কৃতির উপর হামলা মূলত রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর হামলা এবং পাকিস্তান সরকার ইসলাম ও পাকিস্তানের সংহতির নামে বিরামহীনভাবে তা করে চলছে। তারা আরো বলেন যে, পাকিস্তান একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র এবং এর প্রত্যেকটি অঞ্চলের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে। সভাশেষে ড. কুদরত-ই-খুদাকে সভাপতি করে 'সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ' গঠন করা হয়। খুলনাতেও অনুরূপ 'সংস্কৃতি সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়।[১১৭] উল্লেখ্য যে, এসময় পূর্ব পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য প্রায় সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কারাগারে আটক ছিলেন। তবে 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির' নেতা মাওলানা ভাসানী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন যে, 'ইসলাম সত্য ও সুন্দরের জয় ঘোষণা করেছে। এ সত্য ও সুন্দরের পতাকাকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাই যারা ইসলামের নামে রবীন্দ্রনাথের উপর আক্রমণ চালাচ্ছেন, তারা আসলে ইসলামের সত্য ও সুন্দরের নীতিতে বিশ্বাসী নন।'[১১৮] আন্দোলনের তীব্রতায় পাকিস্তান সরকার বিচলিত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ৪ জুলাই (১৯৬৭) জাতীয় পরিষদে পুনরায় বিবৃতি প্রদান করে তথ্যমন্ত্রী তার বক্তব্য প্রত্যাহার করে নেন।

বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে নতুন ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ

(বাংলা ভাষা সংস্কার ও পুনরায় রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ)

১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে পুনরায় রোমান হরফের পক্ষে প্রচারণা শুরু হয়। ১৯৬৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক পরিষদের উদ্যোগে পুনরায় বাংলা ভাষা সংস্কারের প্রস্তাব নেয়া হয়। পাকিস্তানপন্থী বুদ্ধিজীবীরা এতে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। কিন্তু এ প্রস্তাবের বিপক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ একটি সর্বদলীয় সভার আয়োজন করে এবং সভাশেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। ৪১জন বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতি কর্মী 'বাংলা হরফের রদবদল বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করবে' বলে প্রতিবাদ জানান। এছাড়া 'পূর্ব পাকিস্তান নীহারিকা সংসদ', 'সংস্কৃতি সংসদ' ও ভৈরবের 'সংস্কৃতি পরিষদ' এর প্রতিবাদ করে। আওয়ামী লীগ নেতা মাওলনা তর্কবাগিশও এ অপচেষ্টার নিন্দা জানান। আর এসময় প্রেসিডেন্ট কর্তৃক পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা নির্মাণের চেষ্টা করা হয়। ১৯৬৮ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর ঢাকায় নজরুল একাডেমীর এক অনুষ্ঠানে তিনি আহবান জানান- বিভিন্ন ভাষার সমন্বয়ে একটি পাকিস্তানি ভাষা গড়ে তোলার জন্য। এ ঘটনায় পূর্ববাংলায় ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন বিশেষকরে 'পূর্ববাংলা ছাত্র ইউনিয়ন' ও 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ' এর প্রতিবাদ করে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ বাংলাকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। পরে বিভিন্ন জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক সংগঠন এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। বিশেষ করে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্ন পুনরুজ্জীবন, জাতীয় ভাষা সৃষ্টি ও আঞ্চলিক সংহতি নষ্ট করার অপপ্রয়াস সম্পর্কে আওয়ামী লীগের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সরকারকে সতর্ক করে দেয়।[১১৭] এছাড়া মাওলানা ভাসানীও সরকারের এ অপচেষ্টার বিরুদ্ধে বিবৃতি প্রদান করেন। অর্থাৎ ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও সামরিক শাসকবর্গ বিভিন্নভাবে বাংলা ভাষার উপর তাদের আক্রমণ অব্যাহত রেখেছে।

পুস্তক বাজেয়াপ্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন

১৯৬৯ সালের শেষ দিকে পর-পর কয়েকটি বইয়ের প্রকাশকদের উপর 'কেন বইগুলো বাজেয়াপ্ত করা হবে না' তার কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়। বইগুলো ছিল- কামরুদ্দীন আহমদের- 'The Social History of Pakistan', বদরুদ্দীন উমরের- 'সংস্কৃতির সংকট' ও 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা', ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর- 'জেলে ত্রিশ বছর', সত্যেন সেনের- 'আলবেরুনী', আবদুল মান্নান সৈয়দের-'সত্যের মত বদমাস' ও মাওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক পুস্তিকা 'ভোটের আগে ভাত চাই'। পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক কর্মীরা ও বুদ্ধিজীবীগণ এতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ৩০ জন বুদ্ধিজীবী এক বিবৃতিতে সরকারের পদক্ষেপকে আশঙ্কাজনক বলে অভিহিত করেন এবং বইগুলোকে বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে দাবি করেন। 'সাম্প্রতিক' গোষ্ঠীর লেখকরা উন্নতমানের রচনা নিষিদ্ধ না করার জন্য সরকারের প্রতি আহবান জানায়। লেখক, শিল্পী, শিক্ষক,

বুদ্ধিজীবী, ছাত্র সংগঠন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সকলেই এ ঘটনায় ব্যাপক প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করেন। তাদের কর্মসূচির মধ্যে ছিল বিবৃতি প্রদান, মিছিল, সভা, সমাবেশ প্রভৃতি। [১২০]

এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষক ড. মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলামের "পাকিস্তান : দেশ ও কৃষ্টি" নামক দু'খণ্ডে রচিত বইটি ১৯৭০ সালে ইস্ট পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত হয় এবং পরের শিক্ষাবর্ষ থেকে নবম-দশম শ্রেণিতে সেটি পাঠ্যবই হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বইটিতে ধর্মের দোহাই দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি কৃষ্টি কালচারের সর্বজনীনতার কথা বলা হয়। বইটি পাঠ্যক্রম থেকে প্রত্যাহারের জন্য শিক্ষার্থীরা সংগঠিতভাবে আন্দোলন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ ও পুর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ) আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। পরে বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়ন ও বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন এতে যোগ দেয়। ১৬ জন বুদ্ধিজীবী সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করে বইটি প্রত্যাহারের দাবি জানান। আন্দোলনের মুখে অবশেষে সরকার নমনীয় নীতি গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত ২১ আগস্ট (১৯৭০) এক প্রেসনোটে জানানো হয় যে, '১৯৭১ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য বইটির প্রথম খণ্ডের কিয়দংশ ও দ্বিতীয় খণ্ড পুরোপুরি বাদ দেয়া হবে ....'।[১২১] তবুও আন্দোলন অব্যাহত থাকে। এ বইয়ের বিরুদ্ধে সেদিন যে আন্দোলন হয়েছিল, তার লক্ষ্য ছিল প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানবাদেরই বিরোধিতা করা। এর মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের আরো একধাপ অগ্রগতি সাধিত হয়।[১২২]

পাকিস্তানপন্থীদের কর্মতৎপরতা

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, পূর্ববাংলায় যে সাংস্কৃতিক আন্দোলন চলছিল এর বিরুদ্ধে মারাত্মক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল পাকিস্তানপন্থীরা। পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক কর্মীদের চলার পথ মোটেই মসৃণ ছিল না। পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বিভিন্ন সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সম্মেলনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পাকিস্তানপন্থী সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মীরা বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে ও বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। ধর্মান্ধতা ও প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যান-ধারণাকে সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ধারণ করার লক্ষ্যে চল্লিশের দশকেই তারা দু'টি সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। এর একটি হলো 'পূর্ব পাকিস্তান রেঁনেসা সোসাইটি' (১৯৪২) এবং অপরটি 'পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' (১৯৪২)। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তানপন্থীরা বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত ভাষা থেকে পৃথক করা, আরবী হরফে বাংলা লেখা, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করা ইত্যাদি বহু অপচেষ্টা করেছে। পাকিস্তানবাদী সাহিত্য-সংস্কৃতি সৃষ্টির লক্ষ্যে তারা বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাদের কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- পূর্ববংলা ভাষা সংস্কার কমিটি (১৯৪৯), ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন-ঢাকা (২৭-২০ অক্টোবর

১৯৫২), সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী অনুষ্ঠান (মার্চ ১৯৫৭), রওনক সাহিত্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা (১৯৫৮), পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলন-চট্টগ্রাম (১৯৫৮), রোমান হরফ প্রবর্তনের চেষ্টা (১৯৫৯), পাকিস্তান লেখক সংঘ প্রতিষ্ঠা (২৯-৩১ জানুয়ারি, ১৯৫৯), জাতীয় ভাষা সৃষ্টির প্রচেষ্টা (১৯৬৮), জাতীয় পুনর্গঠন সংস্থা (১৯৬৯)। এসব সংগঠন ও কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল- সাহিত্যে পাকিস্তানবাদ প্রতিষ্ঠা করা। সাহিত্যে পাকিস্তানবাদ বলতে তারা বোঝাতো হিন্দুদের থেকে মুসলমানদের পৃথক করে ইসলামি বিষয় ভিত্তিক আরবি-ফারসি-উর্দু শব্দবহুল মুসলমানী বাংলায় সাহিত্য রচনা করা।[১২৩]

মোটকথা সংস্কৃতি চর্চায় তারা রাজনীতির মতো ফ্যাসীবাদী পদ্ধতি অনুসরণ করে। তারা এক জাতি, এক ধর্ম, এক সংস্কৃতি, এক ভাষা ও একই আদর্শে সাহিত্য সৃষ্টির কথা প্রচার করার চেষ্টা করে। নজরুল ইসলামকে মুসলমানদের কবি বানানোর চেষ্টা করে নজরুল একাডেমী। বাংলা ভাষা বিষয়ে সংস্কারের কাজে হাত দেয় বাংলা একাডেমী। ১৯৬৭ সালে রবীন্দ্রনাথের গান বর্জনের জন্য রেডিও পাকিস্তানকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক পরিষদ বাংলা ভাষা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। আর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান স্বয়ং উদ্‌যোগী হন জাতীয় ভাষা নির্মাণে। কিন্তু এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়। এ প্রসঙ্গে আবুল কাসেম ফজলুল হকের নিম্নোক্ত উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের আয়ুষ্কালে পাকিস্তানবাদী চক্র সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, সেগুলো ছিল সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক, প্রাকৃতিক নিয়ম বিরোধী, নির্বুদ্ধিতাপ্রসূত, হাস্যকর ও কাণ্ডজ্ঞানশূণ্য। তবু পূর্ববাংলার জনগণের কাছে তা এসেছিল বিরাট চ্যালেঞ্জ হিসেবে-বাঁচা মরার প্রশ্ন হিসেবে। পূর্ববাংলা সেই চ্যালেঞ্জের যোগ্য জবাব দিয়েছে।"[১২৪]

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক কর্মীরা ও বুদ্ধিজীবীগণ বাঙালির জাতীয় চেতনার সংরক্ষণ ও তার নিজস্ব ধারা টিকিয়ে রাখতে সংগ্রাম শুরু করে চল্লিশ এর দশক থেকেই। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সফলতা অর্জনের পর নানা চড়াই-উৎরাই এর মধ্য দিয়ে ষাটের দশকে এসে তাদের অগ্রযাত্রায় নতুন গতি যোগ হয়। তখন সাংস্কৃতিক চেতনার নানা রকম সম্প্রসারণ সাধিত হয়। এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম দিনের বিশেষ অনুষ্ঠানমালা, ছায়ানট প্রতিষ্ঠা, নতুন উদ্যোগে বাংলা নববর্ষ পালন, মহাকবি স্মরণোৎসব, আফ্রো-এশীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পালিত হয়। সুকান্তের কবিতা বিশেষভাবে আদৃত হয়। গণসঙ্গীত ও গণনাটকের প্রচলন ঘটে। বিদেশি সাম্যবাদী কবিদের কবিতার অনুবাদ শুরু হয়। মূলত এসকল কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে সাহিত্যে বাঙালির মুক্তির চেতনার পূর্ণতা প্রকাশ পায়। আর ১৯৭১ সালের ৫ মার্চ, স্বাধীনতা

সংগ্রামের চূড়ান্ত প্রস্তুতিকালে লেখক-শিল্পীরা মিছিল সহকারে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের পাদদেশে উপস্থতি হন। সেখানে দাঁড়িয়ে ড. আহমদ শরীফের পরিচালনায় তারা হাত তুলে শপথ নেন–'আমরা পূর্ববাংলার সার্বিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মৃত্যুর বিনিময়ে হলেও চালিয়ে যাবো। সংগ্রামী জনগণকে আমরা অনুপ্রেরণা জোগাব লেখনীর মধ্যে দিয়ে। আমাদের লেখনী হবে সংগ্রামের সাফল্যের জন্য বুলেট-বেয়নেট। অতীতের সকল মতানৈক্য ভুলে জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আমরা এগিয়ে যাব সংগ্রামের সাফল্যের দিকে'।[১২৫] মোটকথা এসময় সাংস্কৃতিক জাগরণ পরিপূর্ণতা পায়। অর্থাৎ মানুষের মনে স্বাধীনতার ও মুক্তির বাসনা তৈরীতে সাহিত্য তখন যথার্থ ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার কাজটি করতে পেরেছিল।

মূলত পূর্ববাংলার সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনের গভীর সম্পর্ক ছিল। কারণ, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলায় যেসকল সাংস্কৃতিক আন্দোলন হয়েছিল, তা মূলত এ অঞ্চলের মানুষকে রাজনৈতিকভাবে উজ্জীবিত করে মহান মুক্তিযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছিল। ঐতিহাসিক মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্তকুমার রায় এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন যে, 'পূর্ববাংলায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, অন্তিমে একে অন্যকে প্রেরণা যুগিয়েছে। যে কারণে একটা সময় দেখা যায় যে, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে তেমন কোন তফাৎ ছিল না। কারণ উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল অভিন্ন। দ্বিতীয়ত, পূর্ববাংলায় সাংস্কৃতিক কর্মী তথা সাংস্কৃতিক আন্দোলন যেকোন রাজনৈতিক আন্দোলনের আগে অন্যায় নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে, প্রণোদনা যুগিয়েছে। পরে রাজনৈতিক কর্মীরা এতে যোগ দিয়েছেন।'[১২৬] উদাহরণস্বরূপ ভাষা আন্দোলনের কথা বলা যায়। মূলত এসময়ই রাজনীতি ও সংস্কৃতি একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠে। আর সাংস্কৃতিক আন্দোলন এদেশের মানুষকে প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল বলেই পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর অনুগত প্রতিক্রিয়াশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উদ্যোক্তরা কোনক্রমেই সফলতা লাভ করতে পারেনি। তারা ধর্মের দোহাই দিয়েও সফলকাম হতে পারেনি। উল্লেখ্য যে, এদেশের মানুষ বরাবরই ধর্মপ্রাণ ছিল। এ দেশের মানুষের কাছে সাংস্কৃতিক কর্মীরাই প্রগতিশীলতার কথা, তথা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির বাণী প্রচার করে তাদেরকে মুক্তির সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করেছিল। আর নিঃসন্দেহে একাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন। এজন্য বলা হয় যে, সাংস্কৃতিক কর্মীরাই বাঙালির মন-মননে স্বাধীনতার বীজ বপণ করেছিল। আর রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সে বীজ প্রস্ফুটিত হয়েছিল ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

পরিশেষে বলা যায় যে, মুসলিম সাহিত্য সমাজ, প্রগতি লেখক সংঘ, সংস্কৃতি সংসদ, পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, ধূমকেতু শিল্পী সংঘ, ছায়ানট, উদীচী প্রভৃতি সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো তাদের নানামুখী কর্মসূচির মাধ্যমে বাঙালির স্বাধীনতার অগ্রযাত্রাকে ব্যাপকভাবে তরান্বিত করেছিল, রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর কার্যক্রমকে বহুগুণ বেগবান করেছিল। এছাড়া পূর্ববাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও অনুষ্ঠানসমূহ এবং সাংস্কৃতিক স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন সংগ্রাম বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বত্তার মূল বৈশিষ্ট্য জনগণের সামনে তুলে ধরেছিল, তাদেরকে সচেতন করেছিল, তাদের মন ও মননকে মুক্তির সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করেছিল। আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিতে যেসকল প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম হয়েছিল এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালে যে মহান মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে যে রাজনৈতিক সংগঠনটি এককভাবে নেতৃত্ব প্রদান করেছিল সে সংগঠনটি হলো আওয়ামী লীগ। দলটি ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন, ছয় দফা কর্মসূচি প্রণয়ন ও ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের নেতৃত্ব প্রদান করেছে এবং পূর্ববাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে। মূলত এ দলের প্রধান কাণ্ডারি বাংলার অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অসাধারণ প্রজ্ঞা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দ্বারা পূর্ববাংলার জনগণকে স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মূলত দীর্ঘ ২৪ বছর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম আর সাধনার দ্বারা তিনি বাঙালি জাতিকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে তিনি জাতিকে চূড়ান্তভাবে স্বাধীনতার মূলমন্ত্রে দিক্ষীত করেন। আর ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাংলার আপামর জনগণ সেদিন মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকারের পরিচালনায় দীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলার মুক্তিকামী জনগণ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তাদের বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন করে। উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে মস্কোপন্থী বাম দলগুলো স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। আর ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, জামায়াতে উলামায়ে ইসলাম, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি ও মুসলিম লীগের তিনটি উপদলই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। বিশেষ করে জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের পক্ষ হয়ে পাকহানাদার বাহিনীর সকল প্রকার বর্বরতাকে সমর্থন করে। শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস প্রভৃতি ইউনিটের মাধ্যমে তারা এদেশের অসংখ্য নিরীহ মানুষকে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করেছে, মানুষের সম্পদ লুট করেছে, অসংখ্য মা-বোনকে ধর্ষণ করেছে, ধর্ষণকাজে পাকিস্তানিদের সহায়তা করেছে, দেশের হিন্দু জনগোষ্ঠীর সঙ্গে চরম সাম্প্রদায়িক আচরণ করেছে, সর্বশেষ বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব প্রদান

করেছে। উল্লেখ্য যে, পিকিংপন্থী বাম রাজনৈতিক দলের বেশ কয়েকটি গ্রুপও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে ছিল।

তথ্যসূত্র

১. Choudhury Khaliquzzaman, *Pathway to Pakistan*, Longmans, London, 1961, pp. 235-236; হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র : ১ম খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ২

২. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র : ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-১৬

৩. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *মুক্তিসংগ্রাম*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, (চতুর্থ সংস্করণ), পৃ. ১৪-১৫

৪. পশ্চিম পাকিস্তানিদের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক বৈষম্য ও শোষণ প্রসঙ্গে বিস্তারিত দেখুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২-৩৮

৫. Shyamoli Ghosh, *The Awami League 1947-1971*, Academic Publishers, Dhaka, 1990, p. 21; আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস (১৯৪৯-১৯৭১)*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৬৩-৬৪

৬. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১০ (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ১৭৬-১৭৭

৭. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২

৮. উদ্ধৃত, হাসানউজ্জামান, *বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের চেতনা ও মতাদর্শিক বিকাশ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ১১৯

৯. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ৮১

১০. এ সম্পর্কে দেখুন, G.W. Chouhdhury, *The Last Days of United Pakistan*, The University Press Limited, Dhaka, 1993, pp. 151-153

১১. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৭

১২. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, প্রতীতি, ঢাকা, ২০০৮, পৃ.৫; Kamruddin Ahmed, *A Socio Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh*, Pioneer Press, Dacca, 1975, pp. 236-246

১৩. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২-১৯৩

১৪. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র : ২য় খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৭০০-৭০২

১৫. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯০

১৬. মঈদুল হাসান, *মূলধারা'*৭১, দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৬, পৃ.৪

১৭. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতি : সংস্কৃতির স্বরূপ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩১-৩২

১৮. Talukder Moniruzzaman, *Radical Politics And The Emergence of Bangladesh*, Mowla Brothers, Dhaka, 2003, pp. 92-93 (২৫ মার্চের গণহত্যা সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, আবুল কাসেম ফজলুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৬-২৭১; মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩-১৫৪; মুহম্মদ জাফর ইকবাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭-৮)

১৯. Talukder Moniruzzaman, *Ibid*, pp. 96-97

২০. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র : ৩য় খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ১

২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২ (পাদটীকা দ্রষ্টব্য)

২২. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

২৩. মোনায়েম সরকার, "বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস মার্চ-ডিসেম্বর ১৯৭১", সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ, মোনায়েম সরকার, নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২৩৮

২৪. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র : ৩য় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬-১৭

২৫. রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম), *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৪, (পরিমার্জিত নবম সংস্করণ), পৃ. ১২

২৬. মোনায়েম সরকার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩৯

২৭. মুহম্মদ জাফর ইকবাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১-১২

২৮. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৬

২৯. মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৬১

৩০. অপারেশন জ্যাকপট সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৯-৩৫২; মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭-১০৮

৩১. হারুন-অর-রশিদ, বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৯

৩২. Hafeez Malik, *Moslem Nationalism in India and Pakistan*, Public Affairs Press, Washington. D.C., 1963, p. 275

৩৩. আবু আল সাঈদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২

৩৪. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৩-৩০৮

৩৫. Ali Riaz, *Bangladesh A Political History since Independence*, I.B. Tauris & Co. Ltd., London, 2016, p. 42; মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮; মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের রাজনীতি : যুদ্ধাপরাধী জামায়াত এবং জঙ্গি প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১১৯-১২০

৩৬. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭০

৩৭. উদ্ধৃত, আবুল বারকাত, *বাংলাদেশে মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির*, মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৭৫-১৭৬

৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৬

৩৯. *প্রাগুক্ত*

৪০. Talukder Moniruzzaman, *op.cit.*, p. 96; Ali Riaz, *op.cit.*, p. 42

৪১. পাক বাহিনী, রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস বাহিনীর যুদ্ধকালীন অত্যাচার-নির্যাতন, হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে দেখুন, মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৭-৩১৭

৪২. Ali Riaz, *op.cit.*, p. 42

৪৩. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮১

৪৪. Talukder Moniruzzaman, *op.cit.*, pp. 102-103

৪৫. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮১

৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮২ (বিস্তারিত দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, *একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ভূমিকা*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৯-১৩)

৪৭. Talukder Moniruzzaman, *op.cit.*, pp. 104-105; আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১০, (দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ), পৃ. ১২৪-১২৫

৪৮. রথীন চক্রবর্তী, *রাজনৈতিক আন্দোলন সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট*, কলকাতা, ১৯৮৮,পৃ. ১৭৫

৪৯. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-১১*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা,২০১১, (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ২৭২-২৭৩

৫০. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, "বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৫৮", সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ; মোনায়েম সরকার; নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*,পৃ. ৭৮

৫১. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-১৩*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা,২০১১, (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ২৭-২৮

৫২. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-১১, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭২-২৭৩

৫৩. সাঈদ-উর রহমান, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২)*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৫

৫৪. সাঈদ-উর রহমান, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ২৪

৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪-২৫

৫৬. সাঈদ-উর রহমান, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-১৬

৫৭. বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ১৪

৫৮. পুস্তিকাটি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ১৪-১৯

৫৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫

৬০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬-৪৭

৬১. রোজিনা কাদের, *ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০০৪, পৃ. ৩৩; সুকুমার বিশ্বাস, *বাংলাদেশে নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৪৯

৬২. এ সংগঠনটি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, রেজোয়ান সিদ্দিকী, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭১)*, জ্ঞান বিতরনী, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৩৯-৬৮

৬৩. রোজিনা কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

৬৪. গাজীউল হক "একুশের স্মৃতিচারণ", গাজীউল হক ও এম আর আখতার মুকুল (সম্পাদিত), *বাহান্নর ভাষা আন্দোলন*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৬৭

৬৫. সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮

৬৬. সাঈদ-উর রহমান, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২১

৬৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১-২২

৬৮. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮-৭৯

৬৯. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-৪*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১১, (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ৪৩৪-৪৩৬

৭০. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-২*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১১, (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ১২৮

৭১. বিস্তারিত দেখুন, রোজিনা কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪-৩৫, ৩৮-৪৫, ৭৮-৭৯, ১১৫-১২১; রেজোয়ান সিদ্দিকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮-১০২

৭২. সাঈদ-উর রহমান, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫-২৬

৭৩. হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র : ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬

৭৪. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

৭৫. রোজিনা কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬ (এ সম্মেলন সম্পর্কে বিস্তারিত দেখ, বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৪-১৮৫)

৭৬. সাঈদ-উর রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫-৩৬

৭৭. সাঈদ-উর রহমান, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮

৭৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮-২৯

৭৯. রোজিনা কাদের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬-৩৭

৮০. বিস্তারিত দেখুন, সাঈদ-উর রহমান, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২-৩৫

৮১. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯

৮২. Rangalal Sen, *Political Elites in Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka, 1986, pp. 211-213

৮৩. সাঈদ-উর রহমান, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭-৪৯; প্রীতিকুমার মিত্র, "বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৫৮-১৯৬৬", সালাহ্উদ্দীন আহ্মদ; মোনায়েন সরকার; নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৬-১১৭

৮৪. প্রীতিকুমার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭

৮৫. সাঈদ-উর রহমান, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১

৮৬. পহেলা বৈশাখ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, মুনতাসীর মামুন, *বাংলাদেশের উৎসব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ৯৪-৯৮

৮৭. Rangalal Sen, *op.cit.*, p. 212

৮৮. সাঈদ-উর রহমান, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১

৮৯. এ অনুষ্ঠান দু'টি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০-৬২

৯০. আহমদ রফিক, "ভাষা আন্দোলন : ইতিহাস ও অর্জন", আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *মুক্তির সংগ্রাম*, চন্দ্রাবতী একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪, (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ. ২০৯ (বিস্তারিত দেখুন, পৃ. ২০৯-২১৬)

৯১. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

৯২. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৬-৮৭

৯৩. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২

৯৪. বিস্তারিত দেখুন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪-১৭

৯৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০

৯৬. আনিসুজ্জামান, *আত্মপরিচয় ভাষা-আন্দোলন স্বাধীনতা*, চন্দ্রাবতী একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৩৪; ফ. র. আল-সিদ্দিক, *বাঙালির জয় বাঙালির ব্যর্থতা*, [*প্রথম খণ্ড*], পরমা, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৬৮

৯৭. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫

৯৮. আট দফা চুক্তি সম্পর্কে দেখুন, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র : ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭; মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮-৯০

৯৯. এ বিষয়ে দেখুন, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র : ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫-৮৮; বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯-১১০ (বিস্তারিত দেখুন, পৃ. ১০৪-১১১)

১০০. স্মারকলিপিটি সম্পর্কে দেখুন, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র : ১ম খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯

১০১. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩-৯৪

১০২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪-৯৫

১০৩. এ প্রসঙ্গে দেখুন, বশীর আল্‌হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ৩০৩-৩০৪, ৩০৭-৩০৮

১০৪.এ সম্পর্কে দেখুন, আব্দুল মতিন, *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন*, মুক্তচিন্তা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৩-২৪

১০৫. বশীর আল্‌হেলাল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০৯

১০৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৩-৩২৪

১০৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৩-৩৩৪

১০৮. বশীর আল্‌হেলাল, *ভাষা-আন্দোলনের সেই মোহনায়*, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ৫১-৫৩

১০৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১ (বিস্তারিত দেখুন, পৃ. ৫৪-৬১)

১১০.সাঈদ-উর রহমান, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২-৫৯

১১১. ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭০; বশীর আল্‌হেলাল, *ভাষা*

আন্দোলনের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫; বশীর আল্‌হেলাল, *ভাষা-আন্দোলনের সেই মোহনায়*, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৩; আনিসুজ্জামান, *আত্মপরিচয় ভাষা-আন্দোলন স্বাধীনতা*, চন্দ্রাবতী একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১২৯-১৬১; গাজাউল হক ও এম.আর. আখতার মুকুল (সম্পাদিত) *বাহান্নোর ভাষা আন্দোলন*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯১; মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৮৬-১০২; রতন লাল চক্রবর্তী, *ভাষা আন্দোলন : দলিলপত্র*, কল্যাণ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯১; আহমদ রফিক, *ভাষা আন্দোলন*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১; আব্দুল মতিন, *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন*, মুক্তচিন্তা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৩

১১২. সাঈদ-উর রহমান, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

১১৩. প্রীতিকুমার মিত্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫-১৬; সাঈদ-উর রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬-৭৯

১১৪. সাঈদ-উর রহমান, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩-৫৪

১১৫. Rangalal Sen, *op.cit.*, p. 211

১১৬. সাঈদ-উর রহমান, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬

১১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬-৫৭

১১৮. সন্তোষ গুপ্ত "বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাস ১৯৬৯-১৯৭১ সালের মার্চ পর্যন্ত", সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মদ; মোনায়েম সরকার; নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৩-১৫৪

১১৯. সাঈদ-উর রহমান, পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৮-১১০

১২০.সাঈদ-উর রহমান, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩-৬৪

১২১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫

১২২. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩

১২৩. এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, সাঈদ-উর রহমান, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬-২০, ২৯-৩০, ৩৫-৪৬, ৫৭-৫৯, ৬৮-৬৯; আবুল কাসেম ফজলুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০-২৯; *বের্নার অঁরি লেভি, অবিকশিত জাতীয়তাবাদ ও অঙ্কুরে বিনষ্ট বিপ্লবের পটভূমিতে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হচ্ছিল*, নুর অফসেট প্রেস, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ১৩৮-১৪০ (বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা : শিশির ভট্টাচার্য্য)

১২৪. আবুল কাসেম ফজলুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭

১২৫. উদ্ধৃত, সাঈদ-উর রহমান, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯

১২৬.মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম : ১৯৪৭-১৯৯০*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল এবং জোট : উত্থান ও বিকাশ

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল এবং জোটের উত্থান ও বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বহুকাল থেকে ধর্মপন্থী রাজনীতির প্রচলন রয়েছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু বাংলাদেশের ধর্মপন্থী রাজনীতির রয়েছে ভিন্ন ইতিহাস। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভ করার পূর্বে পূর্ববাংলায় (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড চালু ছিল। স্বাধীনতার পূর্বে পূর্ববাংলার উল্লেখযোগ্য ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল ছিল- মুসলিম লীগ ও মুসলিম লীগের তিনটি উপদল কনভেনশন মুসলিম লীগ; কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও কাইয়ুম মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী ও খেলাফতে রব্বানী পার্টি।[১] কিন্তু ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো দেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর দোসররূপে কাজ করে। উল্লেখ্য যে, ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী ও তাদের সহায়তায় গঠিত রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস বাহিনী যুদ্ধকালীন সময় ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণসহ বহুবিধ মানবতা বিরোধী কাজে লিপ্ত ছিল। সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই প্রথম নজীর যে, নিজ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের ধর্মীয় দলগুলোর বিরোধিতা করা। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর নেতিবাচক ভূমিকার কারণেই স্বাধীনতা লাভের মাত্র দু'দিন পর (১৮ ডিসেম্বর ১৯৭১) এক নির্বাহী আদেশে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগসহ মোট চারটি ইসলামি দলকে নিষিদ্ধ করা হয়।[২] এরপর ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে যে প্রথম সংবিধান রচনা করা হয় সেখানেও ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের স্বাধীনতার রূপকার, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ডের পিছনে অবশ্য দেশি-বিদেশি বিভিন্ন শক্তি ও রাজনৈতিক এজেন্ট নানাভাবে জড়িত ছিল। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হয়। দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়। প্রথমে খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এরপর বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। অতঃপর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি

ক্ষমতায় এসে ধর্মপন্থী রাজনীতির বৈধতা প্রদান করেন এবং সংবিধান সংশোধন করেন। পঞ্চম সংশোধনীতে সংবিধানের শুরুতেই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযুক্ত করা হয়।[৩] এর ফলে সংবিধানের যে শর্ত ছিল 'ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মপন্থী কোন সমিতি বা সংগঠন করার অধিকার কোন নাগরিকের থাকবে না'।[৪] পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে সে বিষয়টি বিলুপ্ত হয়। আর এ ঘটনা প্রবাহের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে পুনরায় ধর্মপন্থী রাজনীতির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। ফলে ধর্মকেন্দ্রিক বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যেমন পুনরুত্থান হয়, তেমনি কিছু নতুন দলেরও সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে ধর্মপন্থী দলগুলো তাদের রাজনৈতিক ব্যাপ্তি ঘটানোর জন্য কয়েকটি জোটও গঠন করে। বর্তমান অধ্যায়ে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ধর্মপন্থী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং জোটের উত্থান ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল এবং জোটগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল ও জোটগুলোর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ:

(১) ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র চালু করা।

(২) ইসলামি আইন-কানুন (কোরআন-হাদীসের আলোকে) দ্বারা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার সার্বিক বিষয় পরিচালনা করা।

(৩) পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল ও জোট সৃষ্টির কারণসমূহ

ইসলাম ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল ও জোট সৃষ্টির পিছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কারণগুলো নিম্নরূপ:

(১) বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে প্রগতিশীল শাসক ও সরকারের অগ্রযাত্রাকে বাঁধাগ্রস্ত করা।

(২) সামরিক বাহিনীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ ও দীর্ঘমেয়াদী সামরিক স্বৈরশাসন।

(৩) সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী সাধন এবং ধর্মপন্থী দলগুলোকে রাজনীতি করার সুযোগ প্রদান।

(৪) স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত ইসলাম ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের তৎপরতা। বিশেষ করে স্বাধীন বাংলাদেশে পুনরায় জামায়াতে ইসলামী দলটির ধর্মপন্থী রাজনীতি চালু করা।

(৫) সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী ও ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম করা।

(৬) গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বাঁধাগ্রস্ত হওয়া।

(৭) দেশে প্রচলিত অন্যান্য ধারার রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃত্বের ব্যর্থতা।

(৮) প্রশাসন পরিচালনায় সীমাহীন দুর্নীতি, অপচয় ও ব্যর্থতা।

(৯) ইসলামপন্থী দলগুলোর মধ্যে অনৈক্য ও নেতৃত্বের সংঘাত।

(১০) বিভিন্ন ধর্মীয় ইস্যুতে ইসলামি দলগুলোর মতপার্থক্য।

(১১) দেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলোর জোট গঠনে ইসলামি দলগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ।

(১২) আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও মুসলমানদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন।

নিম্নে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল এবং জোটের উত্থান ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (বর্তমানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)

বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অন্যতম প্রধান দল হচ্ছে 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'। নিম্নে বাংলাদেশে দলটির উত্থান ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো: ১৯৪১ সালে বৃটিশ ভারতে স্যাইয়েদ আব্দুল আলা মওদুদীর নেতৃত্বে 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ' নামে একটি ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৫] দলটি ভারত বিভক্তির বিপক্ষে থাকলেও পরবর্তীতে তারা তা মেনে নেয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির পর দলটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ' দিল্লীতে এবং 'জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান' লাহোর তাদের প্রধান কার্যালয় স্থাপন করে তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে।[৬] ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে না থাকার মধ্য দিয়ে দলটি প্রথম পূর্ববাংলার জনগণের কাছে সমলোচিত হয়। উক্ত নির্বাচনে তারা মুসলিম লীগকে সমর্থন করে। এরপর ছয় দফা কর্মসূচি থেকে শুরু করে ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ও বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রতিটি ক্ষেত্রে এ দলটি পূর্ববাংলার জনগণের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে পূর্ববাংলার জনগণের রায়ে জামায়াতে ইসলামী দলটি সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখাত হয়। উল্লেখ্য যে, জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে দলটি একটি আসনেও জয়লাভ করতে পারেনি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হলে জামায়াতে ইসলামী দলটি এ যুদ্ধকে ভারতীয় হস্তক্ষেপ আখ্যা দিয়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পক্ষাবলম্বন করে। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক গোষ্ঠী রাজাকার, শান্তি কমিটি, আল-বদর, আল-শামস বাহিনী দেশের অসংখ্য নিরীহ মানুষকে হত্যা, ধর্ষণ, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়ি-ঘর আক্রমণ, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন প্রভৃতি মানবতা বিরোধী অপরাধ সংঘটিত

করে।[৭] স্বাধীনতা যুদ্ধে এ নেতিবাচক ভূমিকার জন্য স্বাধীনতার পর জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ধর্মপন্থী দলগুলোর রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী অফিসার ও সৈন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হয়। দেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়। এরপর ১৯৭৬ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে (১৯৭৬ সালের ২৮ জুলাই) তিনি পিপিআর (পলিটিক্যাল পার্টিস রেগুলেশন্স) [PPR (Political Parties Regulations)] অধ্যাদেশ জারি করে সীমিতভাবে কিছু রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি দেন।[৮] এ সুযোগে জামায়াতে ইসলামীসহ স্বাধীনতা বিরোধী দলগুলো বাংলাদেশে পুনরায় রাজনীতি করার সুযোগ লাভ করে।[৯] জামায়াতে ইসলামী তখন কয়েকটি ইসলামী দলের সমন্বয়ে আইডিএল (ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ) [IDL (Islamic Democratic League)] নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে। জামায়াতে ইসলামী ছাড়া আইডিএল (IDL)- এর অন্তর্ভুক্ত দলগুলো ছিল- নেজামে ইসলামী, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি), ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি (আইডিপি), বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক পার্টি (বিডিপি) এবং ইমারত পার্টি। প্রাক্তন নেজামে ইসলামী পার্টির নেতা মাওলানা সিদ্দিক আহমদকে নতুন এ দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।[১০] গণতান্ত্রিক উপায়ে ইসলাম ধর্মের আদর্শের ভিত্তিতে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠন করাই ছিল এ দলটির মূল লক্ষ্য। তাদের মতে দেশের শাসনতন্ত্র হবে পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক। এসময় থেকে মূলত আইডিএল (IDL)- এর ব্যানারেই জামায়াতে ইসলামী ও অন্যান্য ইসলামি দল তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে।

আইডিএল (IDL) ১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত গণভোট এবং ১৯৭৮ সালে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সমর্থন প্রদান করে। ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আইডিএল (IDL) মুসলিম লীগের সঙ্গে যৌথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এ নির্বাচনে তাদের দল থেকে মোট ৬ জন প্রার্থী জয়লাভ করে। ইতোমধ্যে ১৯৭৮ সালে পিপিআর (PPR) রহিত হলে ১৯৭৯ সালের ২৫ মে এক কনভেনশনের মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামী দলটি স্বনামে আত্মপ্রকাশ করে । তখন দলটির নাম দেয়া হয় 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'। অধ্যাপক গোলাম আযমকে এ দলের আমির নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু স্বাধীনতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে তার নাগরিকত্ব

না থাকায় দলের সিনিয়র নায়েবে আমির আব্বাস আলী খান ভারপ্রাপ্ত আমির হিসেবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকেন।[১১] নেতৃত্বের কোন্দল ও জামায়াতে ইসলামী নামে নতুন দলের আত্মপ্রকাশের প্রশ্নে মতভেদ দেখা দেয়ায় মাওলানা আব্দুর রহিমের নেতৃত্বে জামায়াতে ইসলামীর একটি ছোট অংশ 'ইসলামী ঐক্য আন্দোলন' নামে একটি পৃথক রাজনৈতিক দল গঠন করে। এরপর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ১৯৮১ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশে ইসলামি বিপ্লবের ৭ দফা গণদাবি ঘোষণা করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- বাংলাদেশকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও কোরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক আইন প্রণয়ন করা, ঈমানদার ও যোগ্য লোকের সরকার কায়েম করা, বাংলাদেশের আজাদীর হেফাজত করা, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল করা প্রভৃতি। [১২]

উল্লেখ্য যে, ১৯৭৯ সালের নির্বাচনের পর থেকে জামায়াতে ইসলামী দলটি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের প্রতি তাদের সমর্থনের নীতি পরিত্যাগ করে। দলটি বাংলাদেশকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র ঘোষণা ও গোলাম আযমকে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে। পাশাপাশি তারা 'বাংলাদেশ' ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং তাদের দৃষ্টিতে দেশে অনৈসলামিক কার্যকলাপ (সহশিক্ষা, নাটক, ছবি প্রদর্শনী প্রভৃতি) বন্ধের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করে। এর ফলশ্রুতিতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিসমুহের সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে। মুক্তিযোদ্ধারা জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার এবং গোলাম আজমকে দেশ থেকে বহিষ্কার করার দাবি জানায়। এমতাবস্থায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান মুক্তিযোদ্ধাদের চাপের মুখে ১৯৮১ সালের ১১মে এ বিষয়ে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেন। কিন্তু এর কিছুদিন পরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হলে মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা দ্বন্দ্ব ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়। এরপর জামায়াতে ইসলামী দলটি বিএনপি সরকারের প্রতি নমনীয় নীতি অনুসরণ করে। আর ১৯৮১ সালের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে দলটি বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে সমর্থন প্রদান করে।[১৩]

এরপর ১৯৮২ সালে জেনারেল এইচ.এম. এরশাদ ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী দলটি জেনারেল এরশাদকে সমর্থন প্রদান করেনি। বরং বিরোধী জোট ও দলের সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী মিছিল, সমাবেশ, হরতাল, অবরোধ, বিক্ষোভ ইত্যাদির মাধ্যমে রাজপথের আন্দোলনে কিছুটা সক্রিয় ছিল।[১৪] উল্লেখ্য যে, দলটি স্বৈরাচার সরকারের পতনের আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সর্বপ্রথম কেয়ারটেকার সরকারের

ফর্মুলা প্রদান করে।[১৫] তবে ১৫ দলীয় ও ৭ দলীয় জোট এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে রাজী হয়নি। কিন্তু ১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী দলটি অংশগ্রহণ করে এবং ১০টি আসন লাভ করে। এর পরবর্তীতে ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে দলটি ১৮টি আসনে জয়লাভ করে এবং ১২.৩% ভোট পায়।[১৬] আর তাদের সমর্থন নিয়ে তখন বিএনপি সরকার গঠন করে। কিন্তু বিএনপির সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীর এ সখ্য খুব বেশি দিন টিকেনি। ১৯৯৪ সাল থেকে তারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য আন্দোলন শুরু করে।[১৭]

এরপর ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত ৭ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী দলটি ৩০০ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মাত্র ৩টি আসন লাভ করে এবং ৮.৬১% ভোট পায়। পরবর্তীতে জামায়াতে ইসলামী দলটি নতুন রাজনৈতিক মেরুকরণে বিএনপি ও চার দলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ২০০১ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এ নির্বাচনে তারা মোট ১৭টি আসন লাভ করে। তাদের প্রাপ্য ভোটের হার ছিল ৪.২৯%।[১৮] নির্বাচনে এ বিজয় লাভের ফলে জোট সরকারের অধীনে তারা পর্যায়ক্রমে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করে। মন্ত্রণালয় তিনটি হচ্ছে কৃষি মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে প্রথমবারের মত এ দলটি সরকার গঠনে অংশীদারিত্বের সুযোগ লাভ করে। ক্ষমতার অংশীদারিত্ব লাভ করে দলটি তখন নানাভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে। দলটির বিরুদ্ধে তখন সংখ্যালঘু নির্যাতন, ধর্মীয় উম্মাদনা সৃষ্টি, আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন, তাদের মসজিদ ও প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া এবং জঙ্গিবাদের পৃষ্ঠপোষকতার অভিযোগ উঠে। আর অনেক ক্ষেত্রে তার প্রমাণও মেলে। এরপর ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও দলটি বিএনপির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু এ নির্বাচনে তারা মাত্র ২টি আসন লাভ করতে সমর্থ হয় এবং ৪.০৬% ভোট পায়।[১৯] উল্লেখ্য যে, ২০০৮ সালে দলটি তার পূর্বের নাম 'জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ'-এর পরিবর্তে নতুন করে নামকরণ করে 'বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামী'।

মুসলিম লীগ

ঢাকায় ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর বৃটিশ-ভারতে মুসলমানদের প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন 'মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[২০] শুরুতে দলটির নেতৃত্বে দেন আগা খান ও নবাব স্যার সলিমুল্লাহ।

পাকিস্তান আন্দোলনে এ দলটির ভুমিকাই ছিল মুখ্য। ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তানের দু'অংশেই মুসলিম লীগ তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে। কিন্তু ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের কাছে মুসলিম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফলে পূর্ববাংলার (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) রাজনীতি থেকে মুসলিম লীগের বিদায় ঘটে। এরপর ১৯৬২ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে মুসলিম লীগ তিনটি উপদলে বিভক্ত হয়ে যায়। যথা, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, কনভেনশন মুসলিম লীগ ও কাইয়ুম মুসলিম লীগ।[২১] ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হলে মুসলিম লীগের তিনটি উপদলই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে পাক-হানাদার বাহিনীর দোসর হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ হলে মুসলিম লীগের রাজনীতিও নিষিদ্ধ হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান পিপিআর (PPR) অধ্যাদেশ জারি করলে খান এ সবুর খানের নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ মুসলিম লীগ' নামে দলটি পুনরায় তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করে। বাংলাদেশ মুসলিম লীগের মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি সময়ে ক্ষমতা ও নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব নিয়ে মুসলিম লীগ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। সবুর খান বিরোধী অংশ বি. এ. সিদ্দিকী ও জমিরুদ্দীন প্রধানের নেতৃত্বে একটি পৃথক মুসলিম লীগ গঠন করেন।[২২]

১৯৭৭ সালে অনুষ্ঠিত গণভোটে মুসলিম লীগ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে সমর্থন প্রদান করে। ১৯৭৮ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান 'জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট' গঠন করেন। এ ফ্রন্টে যোগদানের প্রশ্নে মুসলিম লীগ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি অংশ শাহ আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টে যোগ দেয়। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান বিএনপি গঠন করলে এ অংশটি বিএনপির সঙ্গে একীভূত হয়। শাহ আজিজুর রহমান পরবর্তীতে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন ও সরকারের মন্ত্রীত্ব পদ লাভ করেন। অপর অংশ সবুর খানের নেতৃত্বে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে থাকে। সবুর খানের নেতৃত্বে এ দলটি ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনে আইডিএল (IDL)-এর সঙ্গে যৌথভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এ নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও আইডিএল (IDL) মোট ২০টি আসন লাভ করতে সমর্থ হয়। তার মধ্যে মুসলিম লীগ পায় ১৪টি আসন। তবে মুসলিম লীগ দলীয় সংসদ সদস্যগণ সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর পক্ষে ভোট প্রদান করেন।[২৩] ১৯৮২ সালে খান এ সবুর মৃত্যুবরণ করলে দলটি চারটি উপদলে পৃথক হয়ে যায়। যেমন: (ক) মুসলিম লীগ [বদরুদ্দীন আহমেদ সিদ্দিকী (বি.এ. সিদ্দিকী), এ.এন.এম ইউসুফ, তোফাজ্জল আলী

প্রমুখ)], (খ) মুসলিম লীগ (কাজী কাদের ও আবুল মতিন), (গ) মুসলিম লীগ (আবু আলী ও আমিনুল ইসলাম), (ঘ) মুসলিম লীগ (প্রিন্সিপাল রিয়াজউদ্দীন আহমেদ ও ফায়েজ বক্স)।[২৪]

এরপর ১৯৮৫ সালে বি. এ. সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ জেনারেল এরশাদের জাতীয় ফ্রন্টে যোগ দেয় এবং পরবর্তীতে জাতীয় পার্টির সঙ্গে একীভূত হয়ে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব লাভ করে। ১৯৮৬ সালে কাজী আব্দুল কাদেরের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের উপদলসমূহ পুনরায় একত্রিত হয় এবং ১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে মোট ৪টি আসন লাভ করে। মুসলিম লীগের নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ এ পর্যায়ে সংবিধানের ৭ম সংশোধনীর পক্ষে ছিলেন। বাংলাদেশ মুসলিম লীগ মূলত একটি বুর্জোয়া মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল। তাদের অবস্থান ভাষাভিত্তিক অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে। আর তারা সমাজতন্ত্রেরও ঘোর বিরোধী। তারা মনে করে যে, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের পূর্ণ বাস্তবায়ন। কারণ, লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি না হলে বাংলাদেশ হতো না।[২৫]

ইসলামী ঐক্য আন্দোলন

ইসলামী ঐক্য আন্দোলন দলটির পূর্বের নাম ছিল আইডিএল (IDL)। গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জিহাদ বা ইসলামি বিপ্লব করার মানসে ১৯৮৩ সালের ২৪ অক্টোবর দলের (আইডিএল-এর) একটি জাতীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কাউন্সিলে 'গণতন্ত্র থেকে বিপ্লবে উত্তরণ'-এর পক্ষে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সে প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৮৪ সালে 'ইসলামী ঐক্য আন্দোলন' দলটি আত্মপ্রকাশ করে। গণতন্ত্রকে ভ্রান্ত মতবাদ হিসেবে আখ্যা দিয়ে 'গণতন্ত্র নয় পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব', 'প্রচলিত রাজনীতি নয় জেহাদই কাম্য'- এ দু'টি শ্লোগান নিয়ে তারা তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করে। ইসলামী ঐক্য আন্দোলন-এর লক্ষ্য হচ্ছে- বাংলাদেশে আল্লাহর দ্বীন পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহর ও রাসুল (সা.)-এর আনুগত্য প্রকাশ করা, ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করা, অন্যায়ের প্রতিরোধ করা প্রভৃতি। তাদের উল্লেখযোগ্য সাংগঠনিক কর্মসূচির মধ্যে ছিল দাওয়াত ও তাবলীগ, তালিম, তারাবিয়াত ও তাজকিয়াহ, অর্থনৈতিক অধিকার, সমাজসেবা প্রভৃতি।[২৬] ভারতের সঙ্গে পানি চুক্তি ও ট্রানজিট প্রদানের বিরোধিতা, ইরানে ইঙ্গ-মার্কিন আগ্রাসন, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ায় অশ্লীলতা বন্ধ প্রভৃতি ইস্যুতে বিভিন্ন সময় দলটি মিটিং-মিছিল করেছে এবং বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন

১৯৮১ সালের ২৯ নভেম্বর মাওলানা আহমদউল্লাহ হাফেজ্জী হুজুর 'বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন' নামে একটি নতুন ধর্মীয় রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। এ দলটি জনগণকে সর্বাগ্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের (সা.) নির্দেশিত পথে চলার নির্দেশ প্রদান করে। তারা মনে করে একমাত্র আত্মশুদ্ধির মাধ্যমেই জাতীয় মুক্তি সম্ভব। এজন্য তারা শরীয়তী শিক্ষা, মনের পবিত্রতা ও জিহাদের শিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করে। তারা সকল প্রকার অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান ও সামাজিক সমতার কথাও প্রচার করে। বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে- (১) সমগ্র বিশ্বব্যাপী খেলাফত আন্দোলনের তৎপরতা বৃদ্ধি করা এবং (২) আল্লাহর জমিনে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা।[২৭] দলটি ১৯৯০ সালে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যুতে দলটি সভা-সমাবেশ করে ও বক্তব্য-বিবৃতি প্রদান করে। ১৯৮৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটির পক্ষ থেকে ৩৯ জন প্রার্থী অংশগ্রহণ করে, কিন্তু সে নির্বাচনে কেউ জয়লাভ করতে পারেনি। এরশাদ সরকারের রাষ্ট্রধর্ম বিলকে তারা প্রথমে সমর্থন করলেও শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ধর্মের ব্যবহারের বিষয়টি বুঝতে পেরে পরবর্তীতে তারা এর বিরোধিতা করে। ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ দল থেকে মোট ৪৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এবং সকলেই পরাজিত হয়। ১৯৯১ সালের পর দলটি অন্যান্য কয়েকটি ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যৌথভাবে 'ইসলামী ঐক্যজোট'- এর ব্যানারে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। দলটির প্রতিষ্ঠাতা হাফেজ্জী হুজুরের মৃত্যুর পর নেতৃত্বের কোন্দলকে কেন্দ্র করে দলটি চারটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। খেলাফত আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন হাফেজ্জী হুজুরের বড় ছেলে মাওলানা আহমদউল্লাহ আশরাফ। আর শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক, চরমোনাই পীর মাওলানা ফজলুল করিম এবং হাফেজ্জী হুজুরের জামাতা মাওলানা ফজলুল হক আমিনী পৃথক পৃথক তিনটি দল গঠন করেন। নতুন এ দলগুলো খেলাফত আন্দোলন থেকেও বেশি শক্তিশালী দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। পরবর্তীতে খেলাফত আন্দোলন রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা না রাখতে পারলেও দলটি বাংলাদেশের ইসলামি রাজনীতিতে একটি নতুন ধারার সূচনা করে। সেটি হলো কওমী মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষকরা ইসলামি রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হয়।[২৮]

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

১৯৮৯ সালের ৮ ডিসেম্বর 'বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ' দলটি গঠন করা হয়। বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলনের একাংশ এবং ইসলামী যুব শিবির একত্রিত হয়ে এ দলটি গঠন করে। পবিত্র

কোরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে এবং খোলাফায়ে রাশেদিনের দৃষ্টান্ত অনুসারে বাংলাদেশে একটি ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা তথা আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সমগ্র দুনিয়ায় আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা ছিল এ দলের মূল লক্ষ্য। এ দলের মোট নয়টি মৌলিক কর্মসূচি ছিল। নিম্নে সেগুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

বাংলাদেশে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক সংখ্যক জনগণকে 'জেহাদ ফি-সাবিলিল্লাহর' জন্য সচেতন ও সংঘবদ্ধ করা; দ্বীনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটানো; খেলাফত মজলিসের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠার উপযুক্ত কর্মী হিসেবে গড়ে তোলা; বাংলাদেশের জন্য একটি ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং জনগণের সকল প্রকার মৌলিক মানবিক ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা; শোষিত, বঞ্চিত, মজলুম নারী, পুরুষ ও শিশুদের সকল প্রকার ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম করা; দেশ পরিচালনার জন্য জনগণের আস্থাভাজন হক্কানী ওলামা, দ্বীনদার রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীসহ দ্বীনদার ব্যক্তিবর্গের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা; সংখ্যালঘু সম্প্রদায়সমূহের মৌলিক মানবিক অধিকার ও ধর্মীয় অধিকারসমূহ সংরক্ষণ এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা; মুসলিম উম্মাহর সকল প্রকার বিরোধ-বিভেদ অবসান এবং ইসলামের জন্য কর্মরত বিভিন্ন দল, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গকে ঐক্যবদ্ধ করা; সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরোধিতা, মজলুম জাতিসমূহের পক্ষাবলম্বন এবং সমমর্যাদার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার পক্ষে বিশ্ব জনমত গঠন।[২৯]

স্বৈরাচার এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস দলটি অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনী রাজনীতিতেও এ দলের অংশগ্রহণ ছিল। ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ঐক্যজোটের ব্যানারে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সিলেট-৫ আসন থেকে এ দলের একজন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। আওয়ামী লীগ সরকারের (১৯৯৬-২০০১) আমলে নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে এ দলটি সোচ্চার ছিল। এছাড়া দলটি তাদের দৃষ্টিতে ইসলাম বিরোধী যে কোন কার্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছে। শিখা চিরন্তন, শিখা অনির্বান ও ভাস্কর্য নির্মাণকে তারা পৌত্তলিকতার সঙ্গে তুলনা করে এগুলোর নির্মাণে বিরোধিতা করেছে। ভারতে বাবরী মসজিদ ভাঙার প্রতিবাদে ১৯৯৩ সালের ২ জানুয়ারি তারা ভারত অভিমুখে লংমার্চ কর্মসূচি পালন করেছে। এছাড়া পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাতিলের জন্যও তারা ১৯৯৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর একটি লংমার্চ কর্মসূচি পালন করে। এছাড়াও প্রথাবিরোধী প্রখ্যাত লেখিকা তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে তারাই প্রথম আন্দোলন-সংগ্রাম শুরু করে।

শেষ পর্যন্ত তসলিমা নাসরিন দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। কিছু এনজিও-এর ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড ও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এ দলটি কখনো এককভাবে, আবার কখনো জোটগতভাবে আন্দোলন সংগ্রাম করেছে। বর্তমানে দেশের প্রতিটি জেলায় এ দলটির শাখা রয়েছে।[৩০]

ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন

১৯৮৭ সালের ৩ মার্চ 'ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন' নামে নতুন একটি ইসলামি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করা হয়। খেলাফত আন্দোলনের সাবেক নেতা মাওলানা সৈয়দ ফজলুল করিম (যিনি চরমোনাই পীর নামে অধিক পরিচিত) এ দলের প্রতিষ্ঠাতা। শুরুতে দেশের বহু আলেম-ওলামা এ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল নিম্নরূপ : (১) ইসলামি শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা। (২) দেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা এবং (৩) দেশের প্রচলিত অনৈসলামিক নীতি ও জাহেলী সমাজের পরিবর্তন সাধন করে ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া এ সংগঠনটির দু'টি মূলনীতি ছিল । যথা: (১) আন্দোলনের সকল কর্মকাণ্ড শরীয়তসম্মত শুরায়ী নিযামের ভিত্তিতে পরিচালিত হবে। (২) সংগঠনের আক্বীদা হবে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের সর্বসম্মত আক্বীদা। (উল্লেখ্য যে, আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের আক্বীদা হলো আল্লাহ আমাদের রব, হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, কিয়ামত ধ্রুব সত্য। কোরআন আল্লাহর নাযিলকৃত সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশী গ্রন্থ। সাহাবায়ে কিরাম সত্যের মাপকাঠি।)[৩১]

এ সংগঠনটির মোট দশটি কর্মসূচি রয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলো প্রশিক্ষণ, দাওয়াত, সমাজ সংস্কার ও গণআন্দোলন। ইসলামি শাসনতন্ত্র আন্দোলনের মোট ৩টি অঙ্গ সংগঠন রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে মুজাহিদ কমিটি, ছাত্র আন্দোলন এবং যুব আন্দোলন। সারাদেশেই এ সংগঠনটির কর্মকাণ্ড চালু রয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ সংগঠনটি বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইস্যুতে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। তাদের আন্দোলন-সংগ্রাম ও মিটিং-মিছিলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল স্বৈরাচার এরশাদ সরকার বিরোধী আন্দোলন, কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, শিখা চিরন্তন প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা, তদের দৃষ্টিতে ভাস্কর্যের নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে মূর্তি স্থাপনের বিরোধিতা, ভারতকে ট্রানজিট প্রদানে বিরোধিতা, ভারতের সঙ্গে পানি চুক্তির বিরোধিতা, পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিরোধিতা, মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, সালমান রুশদীর ফাঁসির দাবি, যাত্রীবাহী ইরানী

বিমানে মার্কিন ক্ষেপনাস্ত্র হামলার প্রতিবাদ, সৌদি হজ নীতি ও কোটা প্রথা বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ, মার্কিন হামলার দু'টি লিবিয়ান বিমান ধ্বংসের প্রতিবাদ প্রভৃতি।[৩২]

নির্বাচনী রাজনীতিতেও এ দলটির অংশগ্রহণ ছিল উল্লেখ করার মতো বিষয়। ১৯৯১ সালে তারা ইসলামী ঐক্যজোটের সঙ্গে যৌথভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়। ১৯৯৬ সালের সংসদ নির্বাচনে তারা এককভাবে অংশ নেয়। ২০০১ সালের নির্বাচনে তারা জাতীয় পার্টির সঙ্গে ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের ব্যানারে অংশগ্রহণ করে। ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলটি আবার এককভাবে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু তারা এ পর্যন্ত কোন আসনে জয়লাভ করতে পারেনি।

জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলামী

১৯০৯ সালে উপমহাদেশের ওলামাদের প্রথম সংগঠন 'নিখিল ভারত জমিয়তে উলামা' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৩১ সালে 'জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ' নাম ধারণ করে সংগঠনটি মূল ধারার রাজনীতি শুরু করে। দলটি 'অখণ্ড ভারত' নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের পর মওলানা আশরাফ আলী থানবী, মওলানা শাব্বির আহমদ ওসমানী প্রমুখের উপস্থিতিতে 'পাকিস্তান' দাবি আদায়ের লক্ষ্যে 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম' সংগঠনটি গড়ে তোলা হয়। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে 'জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম' কার্যক্রম শুরু করে। তখন শর্ষীনার পীর মওলানা নেছার উদ্দিনকে এ দলের সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনকে সামনে রেখে 'নেজামে ইসলামী' নামে জমিয়তের একটি রাজনৈতিক সেল গঠন করা হয়। যুক্তফ্রন্টের শরিক দল হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নেজামে ইসলামী ব্যাপক সফলতা লাভ করে। উক্ত নির্বাচনে ২০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তারা ১২টি আসনে জয়লাভ করতে সমর্থ হয়। এরপর থেকে নেজামে ইসলামী স্বতন্ত্রভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করে। ১৯৬৫ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় নেজামে ইসলামী, মুসলিম লীগ (কাউন্সিল), আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, জামায়াতে ইসলামী ও এনডিএফ একত্রিত হয়ে কপ (কমবাইন্ড অপজিশন পার্টিস) [COP (Combined Oppsition Parties)] গঠন করে এবং ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন প্রদান করে। এরপর থেকে নেজামে ইসলামী স্বতন্ত্রভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করে। কিন্তু ১৯৭১ সালে নেজামে ইসলামী মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করে। ফলে ১৯৭২ সালে অন্যান্য ইসলাম ধর্মপন্থী দলের সঙ্গে এ দলটিরও কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে নেজামে ইসলামী পুনরুজ্জীবন লাভ করে। আর ১৯৮১ সাল থেকে জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম দলটি নেজামে ইসলামী থেকে পৃথকভাবে

সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু করে। জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম দলটির মূল লক্ষ্য হলো বাংলাদেশে মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ও ইসলামি আদর্শ বাস্তবায়ন করা। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে দলটি হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে 'খেলাফত সংগ্রাম পরিষদের' ব্যানারে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। ১৯৯১ সাল থেকে দলটি ইসলামী ঐক্যজোটের ব্যানারে কাজ করছে এবং বিভিন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ দলের কেন্দ্রীয় নেতা মওলানা মুফতি মুহাম্মদ ওয়াক্কাস যশোর থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। [৩৩]

উল্লেখ্য যে, ১৯৭৬ সালে যখন নেজামে ইসলামী দলটি আবার পুনরুজ্জীবন লাভ করে তখন দলটির নামকরণ করা হয় 'বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি'। এ পার্টিটির মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে দেশের সামগ্রিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা। দলটির কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা, জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা, বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করা প্রভৃতি। ১৯৮১ সালে এ দলের সভাপতি নির্বাচিত হন মাওলানা সিদ্দিক আহমদ এবং সেক্রেটারী নির্বাচিত হন এ্যাডভোকেট মঞ্জুরুল আহসান। পরবর্তীতে মঞ্জুরুল আহসান দলের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৮৬ সালে মঞ্জুরুল আহসান মৃত্যুবরণ করলে জনাব আজাদ এ দলের সভাপতি মনোনীত হন। পরবর্তীতে বার-বার এ দলে ভাঙন দেখা দেয়। দলটি তখন তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। যথা:

(১) বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি (সাঈদ)

এ দলের নেতা ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন জনাব খাজা সাঈদ শাহ। এ দলটির লক্ষ্য ছিল দেশে ইসলামি আইন-কানুন প্রতিষ্ঠা করা।

(২) বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি (বদরপুরী)

এ দলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন মাওলানা আব্দুল জব্বার বদরপুরী। দেশের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটানোই ছিল দলটির প্রধান লক্ষ্য।

(৩) বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি (আশরাফ)

মাওলানা আশরাফ আলী ছিলেন এ দলের প্রেসিডেন্ট। এ দলটি সমাজতন্ত্র ও নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের বিরোধী ছিল। দলটি পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামি আদর্শ বাস্তবায়নের কথা প্রচার করতো।[৩৪]

ফরায়েজী জামায়াত বাংলাদেশ

বাংলা ১৩৮০ সালে (ইংরেজি ১৯৮৬ সালের ১৯ মার্চ) 'ফরায়েজী জামায়াত বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দলটির মূল লক্ষ্য ছিল আল্লাহর জমীনে দ্বীন ইসলাম কায়েম করা এবং বাংলাদেশে খেলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। দলটি মানবতা বিরোধী সংস্কৃতি ও শিরক-বিদায়াতসহ অনৈসলামিক কার্যকলাপ, কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়াশীলতা দূর করার জন্য ব্যাপক ইসলামি আন্দোলনের মাধ্যমে সুস্থ, সুন্দর ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠন করার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে দেশের ১৩টি জেলায় দলটির কার্যক্রম চালু রয়েছে। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে দলটি ইসলামী ঐক্যজোটের সঙ্গে যৌথভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। কেয়ারটেকার সরকারের দাবিতেও তারা সোচ্চার ছিল। এছাড়া দলটি আওয়ামী লীগ সরকারের (১৯৯৬-২০০১) বিরুদ্ধেও বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে বেশ তৎপর ছিল। বর্তমানে দলটি ইসলামী ঐক্যজোটের অন্যতম শরীক দল।[৩৫]

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

মেজর (অব.) আব্দুল জলিল ১৯৮৪ সালের অক্টোবর মাসে 'জাতীয় মুক্তি আন্দোলন' দলটি গঠন করেন। দলটির ২১ দফা মেনিফেস্টোর মধ্যে ৭ দফা ছিল ইসলামি আদর্শ ভিত্তিক। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে হাফেজ্জী হুজুরের নেতৃত্বে 'সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদের' ব্যানারে দলটি বেশ সক্রিয় ছিল। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে শরীক হওয়াও দলটির প্রধান মেজর (অব.) আব্দুল জলিলকে ১৯৮৫ সালে একমাস গৃহবন্দী রাখা হয়। এরপর বিশেষ নিরাপত্তা আইনে ১৯৮৭ সালের ৩০ ডিসেম্বর থেকে ১৯৮৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি কারাগারে আটক ছিলেন। মেজর জলিলের মৃত্যুর পর এ দলের কর্মকাণ্ড স্তিমিত হয়ে যায়। তবে তার এবং মাওলানা ভাসানীর অনুসারীরা পরবর্তীতে 'জাতীয় গণমুক্তি আন্দোলন' নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছেন।[৩৬]

ইসলামী মোর্চা বাংলাদেশ

১৯৯৪ সালের ২০মে ঢাকায় 'কোরআন মিছিল' (কোরআনের ইজ্জত রক্ষার শপথ)-এর মধ্য দিয়ে এ সংগঠনটির ভিত্তি রচিত হয়। অতঃপর ৩০মে (১৯৯৪) জামেয়া কোরআনিয়া (লালবাগ, ঢাকা) মাদ্রাসায় দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামা-মাশায়েখদের নিয়ে ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা প্রতিরোধের লক্ষ্যে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি সমন্বয় কমিটি করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক করা হয় মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে আর যুগ্ম আহ্বায়ক করা হয় মুফতি ফজলুল হক আমিনীকে। পরবর্তীতে ১৬ জুন (১৯৯৪) মাওলানা মুহিউদ্দীন খানকে সভাপতি ও মুফতি ফজলুল হক আমিনীকে মহাসচিব করে

‘ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা প্রতিরোধ মোর্চা’ গঠিত হয়। পরবর্তীতে এর সংক্ষিপ্ত নামকরণ করা হয় ‘ইসলামী মোর্চা বাংলাদেশ’।[৩৭] ইসলামী মোর্চা বাংলাদেশের ৭ দফা দাবিনামা রয়েছে। সেগুলো হলোঃ রাষ্ট্রীয়ভাবে পূর্ণাঙ্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠা, ইসলাম বিরোধী সকল তৎপরতা আইন করে নিষিদ্ধ ঘোষণা, নাস্তিক-মুরতাদ, ইসলাম ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের গ্রেফতার করে শরিয়তের বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা, কাদিয়ানিদের সরকারিভাবে অমুসলিম ঘোষণা, এনজিও ও খ্রিস্টান মিশনারীদের দেশ, ইসলাম ও মানবতা বিরোধী সকল তৎপরতা বন্ধ করা, ইসলাম বিদ্বেষী সকল পত্র-পত্রিকা ও প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা এবং রেডিও টেলিভিশনসহ যাবতীয় প্রচার মাধ্যমে ইসলামি আকিদা ও বিশ্বাস বিরোধী প্রচারণা থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করা। উপরিউক্ত দাবিগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংগঠনটি বিভিন্ন সময় আন্দোলন সংগ্রাম করেছে। এছাড়া ইসলামী মোর্চার নেতা মুফতি ফজলুল হক আমিনী আওয়ামী লীগ সরকারের (১৯৯৬-২০০১) বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে অংশ নেন।[৩৮]

বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন (বিটিএফ)

সৈয়দ নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারি ২০০৫ সালে ‘বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন’ দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এ দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। এর আগে তিনি বিএনপি-এর আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। দলের ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হলেন শাহজাদা সৈয়দ রেজাউল হক চাঁদপুরী। এ দলটির মূল লক্ষ্য হলো পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে সংবিধান প্রণয়ন ও দেশ পরিচালনা করা। এ দলের উপদেষ্টা ও প্রেসিডিয়াম সদস্য হলেন আলহাজ সৈয়দ মুনঈম হোসাইন চিশতী, শাহজাদা সৈয়দ গোলাম মোসাব্বির হোসাইন চিশতী এবং আলহাজ সৈয়দ হাবিবুল বশর মাইজভাণ্ডারি প্রমুখ।[৩৯]

বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টি

ফরমান উল্লাহ খান এ দলটি গঠন করেন। দলটির মূল আদর্শ হলো দেশের শাসন ব্যবস্থায় ইসলামের বিধান প্রয়োগ করা। অবশ্য দলটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পদ্ধতিতেও বিশ্বাস করে।

বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (গাফফার)

মাওলানা আব্দুল গাফফার বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন দল থেকে বের হয়ে এসে ১৯৮৬ সালের প্রথম দিকে এ দলটি গঠন করেন। এ দলের মূল লক্ষ্য ছিল জেহাদের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। দলটি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, সাত দলীয় ও আট দলীয় জোটের সমালোচনা করে।

আওয়ামী উলেমা পার্টি

মাওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী ছিলেন এ দলের প্রেসিডেন্ট। ১৯৭২ সালে তিনি দলের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯৭২ সালের পর তিনি আর রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন না। পরবর্তীতে তিনি প্রেসিডেন্ট জেনারেল জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচি সমর্থন করেন। তিনি ১৯৭৮ সালে সিরাজুল হুদার নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় দলে যোগ দেন। ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং পরাজিত হন। এরপর ১৯৮০ সালে তিনি তার দলকে পুনরুজ্জীবিত করেন। দলটির মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা। বিভিন্ন ইসলামি ইস্যুতে দলটি যুক্তফ্রন্ট গঠনের পক্ষপাতী ছিল। ১৯৮৪ সালে এ দলটি ১৬ দলীয় ইসলামী যুক্তফ্রন্টে যোগ দেয়। এ ইসলামী যুক্তফ্রন্টেরও প্রেসিডেন্ট ছিলেন মাওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী।[৪০]

বাংলাদেশ আওয়ামী ইসলামী পার্টি

১৯৮৬ সালের ৮ জুলাই ধর্মপন্থী এ রাজনৈতিক দলটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মোহাম্মদ শাহজাহান ছিলেন এ দলের আহ্বায়ক। ইসলাম ধর্মপন্থী একটি আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তোলাই ছিল এ দলটির মূল লক্ষ্য। দলটি বহুদলীয় গণতন্ত্র ও প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিল।

মুসলিম জাতীয় দল

আইনজীবী এম. এ. লতিফ মজুমদার ১৯৮৪ সালের ৩ নভেম্বর এ দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। দলটি মুসলিম জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সামাজিক ন্যায় বিচারের আদর্শে বিশ্বাসী ছিল।

মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল

এ দলটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন অধ্যক্ষ সিরাজুল হক গোড়া। প্রথমে তিনি ন্যাপ করতেন। ১৯৮১ সালে তিনি প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল (প্রগশ) প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে এ দলটির নতুন নামকরণ করা হয় 'মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল'। দলটি কট্টর ভারত বিরোধী ছিল। দহগ্রাম, আঙ্গরপোতা, তালপট্টি প্রভৃতি ইস্যুতে দলটি বেশ সোচ্চার ছিল।

ইসলামিক পিপলস কংগ্রেস

এ দলটির আহ্বায়ক ছিলেন এ্যাডভোকেট শেখ আব্দুল লতিফ। দলটির লক্ষ্য ছিল শরীয়তী আইন ও ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া দেশ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি ও পতিতাবৃত্তি উচ্ছেদের পক্ষে দলটি সোচ্চার ছিল।

বাংলাদেশ ইসলামিক রাজনৈতিক পার্টি

সালাহউদ্দীন চৌধুরী ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে এ দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। এ দলটির লক্ষ্য ছিল কোরআন ও হাদীসের আলোকে দেশ পরিচালনা করা। এছাড়া দলটি শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী মানুষের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের পক্ষপাতী ছিল।

জাতীয় উলেমা দল

১৯৮০ সালে মাওলানা রুহুল আমিন এ দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। দলটির লক্ষ্য ছিল ইসলামি রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করা। এ দল আধিপত্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের বিরোধী ছিল। দলটির প্রথম সভাপতি ছিলেন এ. কে. এম. ফারুক। পরবর্তীতে এ. কে. এম. ফারুককে সরিয়ে দিয়ে দলের নেতা হন মাওলানা রুহুল আমিন। উল্লেখ্য যে, মাওলানা রুহুল আমিন একসময় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কর্মী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি বাকশাল ও বিএনপি-এর সক্রিয় সমর্থক ছিলেন।[৪১]

বাংলাদেশ লেবার পার্টি (মোতালেব)

ডা. আব্দুল মোতালেব সিকদার ছিলেন এ দেলের চেয়ারম্যান। দলটি ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর (রা.)-এর শাসনের অনুকরণে ‘উমর-ই সাম্যবাদ’ প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিল। মূলত ইসলামি আদর্শই ছিল দলটির আদর্শ।

বাংলাদেশ জাতীয় দল (হুদা)

সৈয়দ সিরাজুল হুদার নেতৃত্বে ১৯৭৬ সালে এ দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দলটি মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাসী ছিল। তাদের অন্যান্য নীতি ছিল প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায় বিচার, বিচার বিভাগের নিরপেক্ষতা প্রভৃতি।

বাংলাদেশ জমিয়ত-ই-উলুম-ই ইসলামী

এ দলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাওলানা শামসুদ্দীন কাশ্মিরী। দলটির লক্ষ্য ছিল ইসলামিক রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করা। দলটির অন্যতম নীতি হচ্ছে ধর্মকে হীনস্বার্থে ব্যবহার না করে জনকল্যাণের স্বার্থে ব্যবহার করা।

জনশক্তি পার্টি

আইনজীবী আব্দুল্লাহ আল নাসের ১৯৮৪ সালের ২৬ মার্চ এ দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন দলের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ফাতেমা খাতুন। ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা দলটির

প্রধান লক্ষ্য। এছাড়া দলটি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও মুক্ত অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। উল্লেখ্য যে, দলটির সভাপতি ছাত্রজীবনে ইসলামী ছাত্র শিবিরের রাজনীতি করতেন। তিনি পরে জাতীয় দলে যোগ দেন। এর পরবর্তীতে তিনি জাতীয় দল ত্যাগ করে জনশক্তি পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। এ দলটি জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টের শরিক দল ছিল।

ইসলামী ঐক্য আন্দোলন

ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল) (IDL) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৬ সালে। ১৯৮৪ সালের ২৮ নভেম্বর এ দলটির নতুন নামকরণ করা হয় 'ইসলামী ঐক্য আন্দোলন'। দলটির চেয়ারম্যান ছিলেন মাওলানা আব্দুর রহীম এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ব্যারিস্টার কোরবান আলী। দলটির মূল লক্ষ্য ছিল কোরআন ও হাদীস ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা। এছাড়া দলটি ইসলামি খেলাফত প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিল। দলটি ইরানের বিপ্লবের মডেলে দেশে ইসলামি বিপ্লব সংঘটিত করতে চায়। উল্লেখ্য যে, এ দলের চেয়ারম্যান ইতোপূর্বে জামায়াতে ইসলামী- এর নেতা ছিলেন।[৪২]

ইসলামী সংহতি পরিষদ

১৯৮৩ সালে এ দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দল গঠনে নেতৃত্বে দেন দলের সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ এবং মাওলানা মোহাম্মদ শিবলী ফোরকানী। ইসলামি সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা ছিল এ দলের অন্যতম লক্ষ্য। এছাড়া দলটি ইসলামপন্থী দলগুলোর ঐক্যের পক্ষপাতী ছিল।

বাংলাদেশ ইসলামী পার্টি (মালেক)

১৯৭৯ সালের ২৪ এপ্রিল এ দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দলের সভাপতি ছিলেন এ্যাডভোকেট এম. এ. মালেক এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এ্যাডভোকেট আজিজুল্লাহ। দলটির মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামি রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা এবং কোরআন-হাদীস ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা। দলটি গণতন্ত্রেও বিশ্বাসী ছিল। তবে এ দলটি রাশিয়া ও ভারত বিরোধী ছিল। উল্লেখ্য যে, এ দলের সভাপতি পূর্বে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং বাংলাদেশ ছাত্র শক্তির সদস্য ছিলেন। এসব দল পরিত্যাগ করে তিনি আইডিএল (IDL)-এ যোগ দেন এবং সবশেষে বাংলাদেশ ইসলামী পার্টি (মালেক) প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৩]

বাংলাদেশ ইসলামী পার্টি (আশরাফ)

ইসলাম পন্থী এ দলটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন শেখ আশরাফ হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মসিউল ইসলাম। দলটির প্রধান লক্ষ্য ছিল জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলামি আদর্শ ও ভাবধারা প্রতিষ্ঠা করা। দলটি ইহুদিবাদ, আধিপত্যবাদ, সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ বিরোধী ছিল।

বাংলাদেশ ইসলাহুল মুসলেমিন

পীর আলহাজ্ব মাওলানা আব্দুল বাশার এ দলের নেতা (প্রতিষ্ঠাতা)। দলটি ধর্ম-কর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করে দেখার পক্ষপাতী নয়। ইসলামি আদর্শ ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা দলটির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ দলটি মনে করে যে, দেশে অতি শীঘ্রই ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লব পরিষদ

কোরআন ও হাদীস ভিত্তিক ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার জন্য এ দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের প্রধান কর্মসূচি ছিল সুদ প্রথা রহিত করা, কৃষির উপর গুরুত্ব প্রদান, ইসলামি আদর্শ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা প্রভৃতি। দলটির চেয়ারম্যান ছিলেন শেখ মোহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ বিন সৈয়দ জালালাবাদী এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আশরাফ আহমদ।

বাংলাদেশ গণমুসলিম লীগ

এ দলের সভাপতি ছিলেন কাজী আবুল বাশার। দলটির নেতৃবৃন্দ নিজেদেরকে প্রগতিশীল রাজনীতির ধারক-বাহক বলে প্রচার করে। ভূমির মালিকানার সিলিং নির্দিষ্ট করা এবং বেকার ভাতা প্রদান করা ছিল দলটির অন্যতম দাবি।

বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন

এ দলটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মেজর (অব.) জয়নাল আবেদিন এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন শহীদুল্লাহ সাহিত্যরত্ন। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা ছিল দলটির প্রধান লক্ষ্য। এছাড়া কোরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা ও সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা দলটির অন্যতম লক্ষ্য ছিল। দলটি পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসি এবং দারুল ইসলামের নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। উল্লেখ্য যে, দারুল ইসলাম হলো সে রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রে নির্বিঘ্নে ইসলাম ধর্ম পালন করা যায় এবং ইসলামি শাসন ব্যবস্থা চালু আছে। এছাড়া দারুল ইসলামে খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও শিক্ষার সুযোগ রাষ্ট্র থেকে দেয়া হয়।[৪৪]

বাংলাদেশ যুব মুসলিম সোসাইটি

মেজবাহুর রহমান চৌধুরী ছিলেন এ দলের চেয়ারম্যান। দলটির লক্ষ্য ছিল ইসলামি আদর্শ ভিত্তিক রাষ্ট্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। দলটি মনে করে যে, সমাজের অশুভ দিকগুলোকে দূর করতে হলে যুব মুসলিমদের সচেতন হওয়া ও জেহাদ ঘোষণা করা প্রয়োজন।

ভোটার মজলিশ

এ দলটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন কে এম কামাল এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন আইনজীবী দলিল উদ্দীন। দলটি ইসলামি মূল্যবোধ ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। দলটির দাবি ছিল কৃষিকে জাতীয়করণ, শিক্ষার সার্বজনীনতা, বিনামূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তন, মুক্ত অর্থনীতি প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে, এ দলটি ছিল মূলত একটি নির্বাচনমুখী দল। শুধু নির্বাচনকে সামনে রেখেই এ দলের সীমিত কার্যক্রম লক্ষ্যণীয়।

লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি

১৯৭৯ সালে এ দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দলটির সভাপতি ছিলেন এ কে এম শামসুল হুদা এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন। দলটি ছিল ইসলামি আদর্শ ও পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের সমর্থক। কৃষি ও শিল্পের অগ্রগতি দলটির অন্যতম কর্মসূচি ছিল। এছাড়া দলটি নারীর সমান অধিকারে বিশ্বাসী ছিল।

বাংলাদেশ লেবার পার্টি (মতিন)

মাওলানা আব্দুল মতিনের নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালের ৬ নভেম্বর এ দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দলটির মূল লক্ষ্য ছিল হযরত উমর (রা.)-এর শাসন ব্যবস্থায় অনুকরণে ‘উমর-ই-সাম্যবাদ’ প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া বাংলাদেশকে একটি অসাম্প্রদায়িক ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করা তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। সর্বোপরি দলটি গণতন্ত্র, পালার্মেন্টারি সরকার পদ্ধতি, মুসলিম জাতীয়তাবাদ, শোষণ-নিপীড়নের অবসান, গরিবের মুক্তি প্রভৃতি নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। পরবর্তীতে দলটি প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত ‘জাতীয়তাবাদী ফ্রন্টে’ যোগ দিয়েছিল। বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে দলটি রাশিয়া ও ভারতের বিরোধী ছিল।[৪৫]

বাংলাদেশ লেবার পার্টি (মোস্তফা)

গোলাম মোস্তফা খান ১৯৮০ সালে এ দলটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পূর্বে মাওলানা আব্দুল মতিনের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশ লেবার পার্টি (মতিন)-এর সদস্য ছিলেন। এ দলটিরও লক্ষ্য ছিল

হযরত উমর (রা.)-এর শাসনব্যবস্থার ন্যায় 'উমর-ই-সাম্যবাদ' প্রতিষ্ঠা করা। দলটি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করতো। আর দলটি রাশিয়া ও ভারতের প্রচণ্ড বিরোধী ছিল।

বাংলাদেশ মেহনতী দল

১৯৮৪ সালের ২৫ অক্টোবর এ দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দলটির আহ্বায়ক ছিলেন মোহাম্মদ এস্কান্দার আলী। দলটির মূল লক্ষ্য ছিল- মহান আল্লাহর উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে সকল অন্যায়, নির্যাতন, দারিদ্রতা, যুদ্ধ ও অপচয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। দলটির কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে ভূমি বন্টন করা, বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করা, রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবার প্রতিপালন অনুযায়ী বেতন প্রদান, গরিব ও নির্যাতিত লোকদের জন্য ভর্তুকি প্রদান প্রভৃতি।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেবার পার্টি

বাংলাদেশ লেবার পার্টি (মতিন)-এর মধ্যে ভাঙনের ফলে এ দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দলটির প্রতিষ্ঠাতা প্রসিডেন্ট ছিলেন ডা. শাহাবুদ্দিন আহমদ। এ দলটিরও অন্যতম লক্ষ ছিল হযরত উমর (রা.)-এর শাসন নীতি অনুযায়ী 'উমর-ই-সাম্যবাদ' প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়া দলটির কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠা, শোষণমুক্ত সমাজ গঠন, সমাজে সকল শ্রেণির সহাবস্থান প্রভৃতি। এ দলটিও রাশিয়া ও ভারতের ঘোর বিরোধী ছিল।[৪৬]

বাংলাদেশ জাস্টিস পার্টি

মেজর (অব.) আফসার উদ্দিন ছিলেন এ দলটির প্রেসিডেন্ট এবং কবি শহীদুল্লাহ ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। দলটির মূল নীতি ছিল দেশে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা চালু করা। এছাড়া এ দলের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি ছিল ন্যায় বিচার ও শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।

প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি

এ দলটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন শাহরিয়ার রশিদ খান এবং সাধারণ সম্পাদক ছিলেন ওয়াহিদুজ্জামান। দলটির লক্ষ্য ছিল মুসলিম বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা ও কোরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সমাজ গঠন করা। দলটি রাশিয়া ও ভারত বিদ্বেষী ছিল। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে যারা হত্যা করেন, তাদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন শাহরিয়ার রশিদ খান। এ দলটির কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কাজ, স্বাধীনতা, একতা, অধিকার, সংগ্রাম প্রভৃতি।[৪৭]

কৃষক-শ্রমিক পার্টি (সোলায়মান)

শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক ১৯৩৭ সালে 'কৃষক-শ্রমিক পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৯ সালে এ এস এম সোলায়মানের নেতৃত্বে এ দলের পুনরুজ্জীবন ঘটে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সোলায়মান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আব্দুল মোতালেব মালেকের মন্ত্রীসভায় কিছুদিন মন্ত্রীত্ব করেন। ১৯৭২ সালে তিনি কলাবরেটর হিসেবে চিহ্নিত হন। ১৯৭৬ সালের পর আবার নতুন করে দলটির পুনরুজ্জীবন ঘটে। দলটির মূলনীতিগুলো ছিল নিম্নরূপ: (১) ধর্মভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন, (২) শোষণমুক্ত ও জনকল্যাণমূলক অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, (৩) বাংলাদেশের অখণ্ডত্ব, সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষা এবং (৪) বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সকল প্রকার আধিপত্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা।[৪৮]

বাংলাদেশ ওলামা সমিতি

১৯৮৫ সালে এ দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। দলটির আহ্বায়ক ছিলেন মাওলানা জামাল উদ্দীন সিরাজী। দলটির প্রধান লক্ষ্য ছিল সকল প্রকার শোষক ও জালিমের বিরুদ্ধাচারণ করা।

ফ্রীডম পার্টি

১৯৮৭ সালের ৩ আগস্ট এ দলটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দলের চেয়ারম্যান ছিলেন কর্নেল ফারুক এবং কো-চেয়ারম্যান ছিলেন কর্নেল রশিদ। দলটির মূল লক্ষ্য ছিল আল্লাহর আদেশ ও নির্দেশ বাস্তবায়ন করা। দলটি রাশিয়া ও ভারত বিরোধী ছিল। দলটির নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগকে দেশের শত্রু বলে মনে করতো। তারা সমাজতন্ত্রেরও বিরোধী ছিল। উল্লেখ্য যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যে সকল সামরিক কর্মকর্তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল কর্নেল ফারুক ও কর্নেল রশিদ।[৪৯]

জাকের পার্টি

১৯৮৯ সালের ১৪ অক্টোবর 'জাকের পার্টি' প্রতিষ্ঠিত হয়। আলহাজ মোস্তফা আমির ফয়সাল মোজ্জাদ্দেদী এ দলটির চেয়ারম্যান। দলটির নীতিমালা নিম্নরূপ: (১) জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা, (২) গণতান্ত্রিক অধিকার ও মূল্যবোধ সমুন্নত ও সুরক্ষিত করা, (৩) ইসলামের তাসাউফ শিক্ষার প্রভাবে আত্মিক পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষকে অন্যায় থেকে নিবৃত্ত রাখা এবং (৪) দেশের বৃহত্তর স্বার্থে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা।

দলটি বর্তমানে ২৯টি অঙ্গ সংগঠন নিয়ে সারাদেশে তাদের কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। দলটির উল্লেখযোগ্য অঙ্গ সংগঠন হচ্ছে যুব ফ্রন্ট, ছাত্র ফ্রন্ট, ছাত্রী ফ্রন্ট, মহিলা ফ্রন্ট, আইনজীবী ফ্রন্ট, শ্রমিক ফ্রন্ট, কৃষক ফ্রন্ট, বাস্তুহারা ফ্রন্ট, স্বেচ্ছাসেবী ফ্রন্ট, ব্যবসায়ী ফ্রন্ট, ওলামা ফ্রন্ট প্রভৃতি।[৫০]

এছাড়াও আরো কিছু ইসলাম ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল আছে, যেগুলোর শুধু নাম এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সভাপতি বা আহ্বায়কের অথবা সম্পাদকের নাম পাওয়া যায়। দলগুলোর ইসলামি নাম থাকলেও তাদের লক্ষ্য ও কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত তেমন কিছু জানা যায়নি। নিম্নে সেসকল দলের নাম উল্লেখ করা হলো :

(১) ইসলামী খেলাফত পার্টি (মোখলেস)- দলটির সাধারণ সম্পাদক মৌ. মো. মোখলেসুর রহমান, (২) ইসলামী খেলাফত পার্টি (মাহবুব)- এ দলের চেয়ারম্যান মাওলানা মাহবুবুল আলম, (৩) নয়া ইসলামী পার্টি, (৪) ইসলামী সাম্যবাদী দল, (৫) বাংলাদেশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি- এ দলের প্রধান নেতা ছিলেন মাহবুব আলী। দলটি ইহুদিবাদের বিরোধী ও পিএলও- এর সমর্থক, (৬) জামায়াত-ই-রাব্বিনিয়া-ই-আম্মা পার্টি, (৭) ইউনাইটেড রিপাবলিকান পার্টি- এ দলের সভাপতি মাজেদুর রহমান খান এবং সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস হোসেন মোস্তাজী, (৮) জামায়াত-ই-তালিমুদ্দিন- দলটির সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা আমির, (৯) ইসলামী বাস্তুহারা পার্টি- আফতাব উদ্দিন মাস্টার এ দলটির সভাপতি, (১০) ইসলামী কৃষক পার্টি- দলটির আহ্বায়ক আব্দুল ওহাব, (১১) বাংলাদেশ জিকিরুল্লাহ পার্টি- আমির হোসেন খান এ দলের সভাপতি, (১২) ন্যাশনাল ইসলামী পার্টি- এ দলের সভাপতি হাফিজুদ্দীন চৌধুরী, (১৩) ইসলামী মুজাহিদ পার্টি- ডা. কামাল আহমেদ এ দলের আহ্বায়ক, (১৪) ন্যাশনাল ইসলামী পার্টি- এ দলটির আহ্বায়ক মাওলানা মাযহারুল ইসলাম, (১৫) জাতীয় ইসলামী দল- দলটির আহ্বায়ক হচ্ছেন মাওলানা আলী হোসেন, (১৬) মুসলিম রিপাবলিকান পার্টি- এ টি এম শহীদুল হক এ দলের আহ্বায়ক, (১৭) ইসলামী গণ আন্দোলন- ডা. নজরুল ইসলাম চৌধুরী এ দলটির চেয়ারম্যান, (১৮) তাজদিদ-এ-ইসলাম- মাওলানা মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ এ দলটির সভাপতি, (১৯) ইসলামী মুক্তি আন্দোলন- ডা. মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন এ দলের সভাপতি, (২০) বাংলাদেশ ওলামা সমিতি- আব্দুল কাদের শরিয়তপুরী এ দলের সভাপতি, (২১) মজলিশে তাহাফুজে খতমে নবুয়ত- এ দলটির সভাপতি হযরত মাওলানা আব্দুল জব্বার, (২২) খাদেমুল ইসলাম জামায়াত- মাওলানা হোসেন আহমেদ এ দলের সভাপতি, (২৩) ইসলামী গণতন্ত্রী দল- এ দলটির সভাপতি শেখ মোহাম্মদ সাঈদ, (২৪) বাংলাদেশ ওলামা পার্টি- মাওলানা ইব্রাহিম খলিল আজাদী এ দলের সভাপতি, (২৫) ইসলামী সেবক দল- এ দলটির

সভাপতি মাওলানা জালালাবাদী, (২৬) হুকুমতে রব্বানী পার্টি (হাবিবুল্লাহ)- কাজী হাফেজ মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ এ দলটির সভাপতি, (২৭) হুকুমতে রব্বানী পার্টি (সিদ্দিকুল্লাহ)- এ দলটির সভাপতি কে.এম. সিদ্দিকুল্লাহ, (২৮) ইসলামী ডেমোক্রেটিক পার্টি- এ দলের সভানেত্রী মোহ্তারেমা আলেয়া বেগম, (২৯) খাকসার পার্টি- আব্দুল হাফিজ এ দলের সভাপতি, (৩০) জাতীয় সেবক দল- এ দলের সভাপতি মাওলানা এনায়েতুল্লাহ টুকেরবাজারী, (৩১) বাংলাদেশ ন্যাশনাল ওলামা পার্টি- মাওলানা মোহাম্মদ শাহবুদ্দিন এ দলের সভাপতি, (৩২) বাংলাদেশ তানজিমুল ওলামা পার্টি- এ দলটির সভাপতি ক্বারী রুহুল আমিন ।[৫১] উল্লেখ্য যে, এ দলগুলোর তেমন কোন রাজনৈতিক কর্মসূচির উল্লেখ পাওয়া যায় না।

ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের জোট

বাংলাদেশের ইসলামপন্থী দলগুলো বিভিন্ন কারণে জোটবদ্ধভাবেও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে। বাংলাদেশের ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের জোটগুলো নিম্নরূপঃ (১) সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ, (২) ইসলামী ফ্রন্ট, (৩) ইসলামী যুক্তফ্রন্ট (জালালাবাদী), (৪) ইসলামী যুক্তফ্রন্ট (সোলায়মান) এবং (৫) ইসলামী ঐক্যজোট।

ইসলামি দলগুলো বৃহত্তর পরিসরে তাদের রাজনৈতিক ব্যাপ্তি ঘটানোর জন্যই এ জোটগুলো গঠন করেছে। এ জোটগুলোর প্রায় সকলেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে পবিত্র কোরআন ও হাদীস ভিত্তিক ইসলামি বিধান মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করা। তবে এগুলোর মধ্যে একমাত্র ইসলামী ঐক্যজোট ছাড়া বাকী জোটগুলোর কর্মকাণ্ড শুধু কাগজ-কলম ও বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ। নিম্নে ইসলামপন্থী জোটগুলোর পরিচয় তুলে ধরা হলো :

সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ

সর্বমোট ১১টি দল ও সংগঠনের সমন্বয়ে এ জোট গঠিত হয়। এ জোটের শরিক দলগুলো হচ্ছে নিম্নরূপঃ (১) ইসলামী যুব শিবির (কাদের), (২) মজলিশে দাওয়াতুল হক (আবদুল হাই), (৩) বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (হাফেজ্জী হুজুর), (৪) ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ, (৫) জাতীয় মুক্তি আন্দোলন (মেজর জলিল), (৬) খেলাফতে রব্বানী পার্টি (আবুল কাসেম), (৭) নেজামে ইসলাম পার্টি ও জমিয়ত ওলামায়ে ইসলাম (মালেক-হালিম), (৮) ইসলামিক রিপাবলিকান পার্টি (হাবিবুল্লাহ), (৯) মজলিশে তাহাফুজ খতমে নবুয়ত (জব্বার), (১০) খাদেমুল ইসলাম জামায়াত (হোসেন আহমেদ), (১১) ইসলামী যুব আন্দোলন (হেমায়েত উদ্দিন)। উল্লেখ্য যে, উপরে বর্ণিত

দলগুলোর সবকটিই রাজনৈতিক দল নয়, এর মধ্যে কতগুলো গণসংগঠনও রয়েছে। যেমন, ইসলামী যুব শিবির, ইসলামী যুব আন্দোলন ইত্যাদি।

ইসলামী ফ্রন্ট

২০টি দল ও সংগঠনের সমন্বয়ে এ ইসলামী জোট গঠিত হয়েছে। এ জোটের শরিক দলগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ: (১) বাংলাদেশ লেবার পার্টি (ওয়াহিদুল হক), (২) ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ দল (রোকন), (৩) মুসলিম ডেমোক্রেটিক লীগ (কাবিল আহমেদ), (৪) ন্যাশনাল ইসলামী পার্টি (মাযহারুল), (৫) বাংলাদেশ লেবার পার্টি (সিকদার), (৬) জামায়াতে তালিমুদ্দীন (মোস্তফা আমির), (৭) জাতীয় ওলামা পার্টি (আহমেদুল হক), (৮) জাতীয় ইসলামী দল (আলী হোসেন), (৯) মুসলিম রিপাবলিক পার্টি (শহিদুল হক), (১০) ইসলামী বাস্তুহারা পার্টি (আফতাব উদ্দিন), (১১) ইসলামী কৃষক পার্টি (ওয়াহাব), (১২) ইসলামী খেলাফত পার্টি (আলম), (১৩) ন্যাশনালিস্ট ইসলামী পার্টি (হাফিজউদ্দিন), (১৪) ইসলামী গণ আন্দোলন (নজরুল ইসলাম), (১৫) ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (হাওলাদার), (১৬) বাংলাদেশ জিকিরুল্লাহ পার্টি (আমীর হোসেন), (১৭) ইসলামী মুক্তি আন্দোলন (মোশাররফ), (১৮) ইসলামী মুজাহিদ পার্টি (কামাল), (১৯) তাজদিদে ইসলাম (হাফিজুল্লাহ), (২০) পল্লী ভূমিহীন সমিতি (আজাদ সুলতান)। এ ফ্রন্টের চেয়ারম্যান হচ্ছেন মফিজুর রহমান রোকন। উল্লেখ্য যে, তিনি ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ দলেরও সভাপতি।

ইসলামী যুক্তফ্রন্ট (জালালাবাদী)

মাওলানা শেখ ওবায়দুল্লাহ বিন সাঈদ জালালাবাদীর নেতৃত্বে পরিচালিত এ জোটের শরিক দলগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ: (১) ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (মেজর আফসার উদ্দীন), (২) বাংলাদেশ ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ (জালালাবাদী), (৩) মুসলিম জাতীয় দল (লতিফ), (৪) জাতীয় সেবক দল (এনায়েত উল্লাহ টুকেরবাজারী), (৫) আওয়ামী ওলামা পার্টি (যশোরী), (৬) প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি (প্রগশ) (আলতাব), (৭) খাকসার পার্টি (সামাদ), (৮) ইসলামী ন্যাশনালিস্ট পার্টি (হাফিজ), (৯) জাতীয় ওলামা দল (রুহুল আমিন), (১০) ইসলামী ডেমোক্রেটিক পার্টি (আলেয়া বেগম), (১১) ইসলামী সেবক দল (নেতৃত্বের নাম জানা যায় না), (১২) ইসলামী গণতন্ত্রী দল (সাঈদ), (১৩) হুকুমতে রব্বানী পার্টি (সিদ্দিকুল্লাহ), (১৪) ন্যাশনাল প্রগ্রেসিভ পার্টি (আব্বাস), (১৫) বাংলাদেশ ওলামা পার্টি (আজাদী), (১৬) কৃষক সমিতি (ভাসানী) (নূরুদ্দীন খান)।

ইসলামী যুক্তফ্রন্ট (সোলায়মান)

মালেক মন্ত্রীসভার প্রাক্তন মন্ত্রী এ এস এম সোলায়মানের নেতৃত্বে এ ফ্রন্টটি গঠন করা হয়। এ ফ্রন্টের শরিক দলগুলো হচ্ছে নিম্নরূপঃ (১) বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক পার্টি (সোলায়মান), (২) বাংলাদেশ গণমুসলিম লীগ (বশার), (৩) নেজামে ইসলাম পার্টি (আকিল), (৪) বাংলাদেশ ওলামা পার্টি (শাহাবুদ্দিন), (৫) বাংলাদেশ ওলামা সমিতি (শরিয়তপুরী), (৬) হুকুমতে রব্বানী পার্টি (হাবিবুল্লাহ), (৭) বাংলাদেশ ইসলাহুল মুসলিম পার্টি (আবুল বশার), (৮) ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (শফিকুর রহমান), (৯) প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি (হারুনর রশীদ), (১০) ইসলামী সংহতি পরিষদ (সাদেক), (১১) রিপাবলিকান পার্টি (শরাফত), (১২) বাংলাদেশ তানজিমুল ওলামা পার্টি (রুহুল আমিন), (১৩) ওলামা ফ্রন্ট (হাবিবুল্লাহ), (১৪) বাংলাদেশ জাতীয় দল (সিদ্দিক), (১৫) বাংলাদেশ ভূমিহীন সমিতি (মজিবুল হক) (১৬) কৃষক সমিতি (ভাসানী)।[৫২]

ইসলামী ঐক্যজোট

১৯৯০ সালে এরশাদ সরকারের পতনের পর 'ইসলামী ঐক্যজোট' গঠন করা হয়। এ জোটে দলের সংখ্যা মোট ৭টি। দলগুলো হচ্ছে নিম্নরূপঃ (১) জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম, (২) বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি, (৩) ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, (৪) ফরায়েজী জামায়াত, (৫) খেলাফত আন্দোলন, (৬) খেলাফত মজলিস এবং (৭) ইসলামী আন্দোলন।[৫৩]

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, বাংলাদেশে ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোর যে ৫টি জোট রয়েছে, তার মধ্যে শুধু ইসলামী ঐক্যজোটই রাজনীতিতে সক্রিয় রয়েছে। নিম্নে এ জোট সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তি গড়ে তোলার জন্য এ জোটটি গঠিত হয়। মূলত এটি ছিল ১৯৯১ সালের ৫ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বৃহত্তর পরিবেশে একটি ইসলামি নির্বাচনী জোট। আত্মপ্রকাশের সময় জোটের লক্ষ্য ছিল দেশের সকল মুসলিম শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামি শক্তিকে জয়যুক্ত করা।[৫৪] ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান ছিলেন শায়খুল হাদীস মাওলানা আজিজুল হক। জোটের শরিক দলগুলোর উদ্দেশ্য ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা ইতোপূর্বে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মূলত সেসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করার জন্যই তারা বৃহত্তর এ প্লাটফর্মে একত্রিত হয়। এছাড়া ইসলামী ঐক্যজোট বিএনপি সরকার (১৯৯১-১৯৯৬) এবং আওয়ামী লীগ সরকার (১৯৯৬-২০০১)-এর সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি পালন করেছে। এর মধ্যে

উল্লেখযোগ্য ছিল: ভারতে ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ ভাঙার প্রতিবাদে লং মার্চ কর্মসূচি পালন (১৯৯৩ সালের ২-৪ জানুয়ারি); নারীবাদী লেখক তসলিমা নাসরিনের ফাঁসির দাবি, ব্লাসফেমী আইন প্রণয়ন, এনজিওদের ইসলাম বিরোধী তৎপরতা বন্ধ, কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা, জনকণ্ঠ ও আজকের কাগজসহ ইসলাম বিদ্বেষী পত্রিকাগুলো নিষিদ্ধ করার দাবিতে অন্যান্য ইসলামপন্থী দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে হরতাল পালন (১৯৯৪ সালের ৩০ জুন); পবিত্র কোরআন ও মহানবী (সা.)-এর অবমাননার প্রতিবাদে ইহুদী চক্র ও তাদের এ দেশীয় দোসর দেশের নাস্তিক-মুরতাদদের শাস্তির দাবিতে হরতাল পালন (১৯৯৪ সালের ১৫ জুলাই); কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল ও তাদের দৃষ্টিতে ভাস্কর্যের নামে ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে মূর্তি স্থাপনের প্রতিবাদে ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউতে মহাসমাবেশ (১৯৯৭ সালের ২২ আগস্ট); মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ, জনগণের ধর্মীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিকে ধ্বংসের প্রতিবাদে ৭২ ঘন্টা হরতাল পালন (১৯৯৯ সালের ২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি); পার্বত্য শান্তি চুক্তির বিরোধিতা করে লং মার্চ কর্মসূচি পালন (১৯৯৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর); ২০০১ সালের ১ জানুয়ারি মহামান্য হাইকোর্টের দেয়া 'ফতওয়া নিষিদ্ধ' রায়ের বিরুদ্ধে পল্টনে বাংলাদেশ উলামা সমাজ ও ঐক্যজোটের ঐতিহাসিক উলামা-মাশায়েখ সম্মেলন (২০০১ সালের ২ ফেব্রুয়ারি) প্রভৃতি।[৫৫] এছাড়াও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের ষড়যন্ত্র, পবিত্র কোরআনের অবমাননা, শিখা চিরন্তন ও শিখা অনির্বাণ বন্ধ, মঙ্গল প্রদীপ, রাখি বন্ধন, ভারতকে ট্রানজিট দেওয়া প্রভৃতির বিরুদ্ধে তারা বিভিন্ন সময় আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে।

এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ছিল জোটটির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৮ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সকল জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ঐক্যজোট অংশগ্রহণ করেছে। তবে তারা উল্লেখযোগ্য কোন সফলতা লাভ করতে পারেনি। ১৯৯১ সালে তারা ১টি আসন ও ০.৭৯% ভোট পায়। ১৯৯৬ সালে তারা ১টি আসন ও ১.০৯% ভোট পায়। ২০০১ সালের নির্বাচনে তারা ২টি আসন ও ০.৬৮% ভোট পায়। আর ২০০৮ সালের নির্বাচনে তারা ১টি আসন ও ০.৬৯% ভোট পায়।[৫৬] এ পরিসংখ্যানটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইসলাম ধর্মপন্থী এ জোটটি জনগণের গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

এছাড়া বাংলাদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী কিছু রাজনৈতিক দল রয়েছে। যেমন- বাংলাদেশ হিন্দু লীগ (১৯৮৪), বাংলাদেশ সংখ্যালঘু ঐক্যফ্রন্ট, বাংলাদেশ তফসিল ফেডারেশন, বাংলাদেশ হিন্দু ঐক্য ফ্রন্ট (১৯৮৪), জাতীয় হিন্দু পরিষদ, বাংলাদেশ হিন্দু পরিষদ ও বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু পার্টি (১৯৮৬)। কিন্তু এ দলগুলোর লক্ষ্য ও আদর্শের মধ্যে রাজনীতিতে তাদের ধর্মের ব্যবহারের কোন

পদক্ষেপ পরিলক্ষিত হয় না। নামেই শুধু তারা হিন্দু ধর্মপন্থী দল। ধর্মীয় ভাবাদর্শে এ দেশে তাদের কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি নেই। এ দলগুলো মূলত গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, সংখ্যালঘুদের অধিকার, মানবতাবাদ প্রভৃতি বিষয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সংগ্রাম করে আসছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে বসবাসরত খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কোন রাজনৈতিক দল নেই। 'বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ- খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ' নামক সংগঠনের ব্যানারে তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিভিন্ন অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করছে। ঐক্য পরিষদের মূল লক্ষ্য একদিকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বৈষম্য বঞ্চনার অবসান, অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের মূল চেতনা ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের মূলনীতি অনুযায়ী সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও সকল ধর্মের সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও সংহতিকে জোরদার করা।[৫৭]

উপরিউক্ত আলোচনায় বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল ও জোটসমূহের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, দেশে প্রায় ৭৭টি ইসলামি দল ও ৫টি ইসলামি জোট রয়েছে। কিন্তু এগুলোর মধ্যে মোটামুটিভাবে ২০টি দল ও ১টি জোটের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়। বাকী দল ও জোটগুলো নামসর্বস্ব। উক্ত দলগুলো সাধারণত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রয়োজনে বিশেষ সময়ের জন্য গঠন করা হয়েছিল। তাদের কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও কর্মসূচি ছিল না। উল্লেখ্য যে, ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন আবশ্যক করা হলে নির্বাচন কমিশন ইসলাম ধর্মপন্থী মাত্র ১২টি দলকে নিবন্ধিত করে। বাংলাদেশে ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মতৎপরতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাদের সবারই মূল লক্ষ্য হলো ইসলামি আইনানুযায়ী দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা। তবে ধর্মীয় নীতি ও আদর্শের কথা বললেও তারা নিজেদের অবস্থানে অনড় থেকে ধারাবাহিকভাবে রাজনীতি করতে পারেনি। সহজেই অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া যেন তাদের স্বভাবজাত। আর এ সুযোগে বিভিন্ন সময় দেশের অন্যান্য প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো (আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি) ক্ষমতার যাবার বাহন হিসেবে বা সরকার বিরোধী আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য তাদেরকে সুবিধামত ব্যবহার করেছে। আবার কখনো ক্ষমতায় বসে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ধর্মপন্থী দলগুলোকে কাছে টেনেছে, ছোট-বড় বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছে। এসব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তারা বিভিন্ন সময় শাসক শ্রেণি ও বড় দলগুলোর হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, স্বাধীনতার পর বেশ কয়েকবার বিভিন্নভাবে দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হয়েছে। সামরিক বাহিনীর কিছু উচ্চাভিলাষী কর্মকর্তা এর নেপথ্যে কাজ করেছেন। তাদের ক্ষমতার বৈধতা আদায় ও অন্য সকল দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টায় তারা বার-বার ধর্মের

পিছনে ছুটেছেন। এরপর গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় এসে যেসব শাসকগোষ্ঠী দেশ শাসন করেছে, তারাও তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করেছে। এরশাদের পতনের পর ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় এবং জামায়াতে ইসলামীর সহযোগিতায় বিএনপি তখন সরকার গঠন করে। এরপর আওয়ামী লীগ দলটি বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করেছিল, জামায়াতে ইসলামী দলটি তখন আওয়ামী লীগের কৌশলগত মিত্র ছিল। এরপর ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসে। পরবর্তীতে বিএনপি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য জামায়াতে ইসলামী, ইসলামী ঐক্যজোটসহ অন্যান্য দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি ঐক্যজোট গঠন করে। এরপর ২০০১ সালের জাতীয় নির্বাচন উপলক্ষ্যে গঠিত বিএনপি ও চার দলীয় ঐক্যজোটের অন্যতম শরীক দল ছিল জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ঐক্যজোট। এ নির্বাচনে ধর্মপন্থী দলগুলো বিশেষত জামায়াতে ইসলামী তুলনামূলকভাবে ভালো ফলাফল অর্জন করতে সক্ষম হয়। তারা এ নির্বাচনে মোট ১৭টি আসনে জয়লাভ করে। আর ২০০১ সালের নির্বাচনে বিএনপি ও চার দলীয় ঐক্যজোট সম্মিলিতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং সরকার গঠন করে। উল্লেখ্য যে, বিএনপি-এর নেতৃত্বাধীন এ সরকার পরিচালনায় প্রথমবারের মতো জামায়াতে ইসলামী অংশীদারিত্ব লাভ করে। তারা পর্যায়ক্রমে তিনটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পায়। বলা চলে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে এটিই ধর্মপন্থী কোন দলের প্রথম সাফল্য। কিন্তু ঐ সময় দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নানা ঘটনা প্রবাহের জন্ম হয়। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল প্রগতিশীল বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাঁধা প্রদান, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের উপর বিশেষত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন, আহমদিয়াদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন, তাদের মসজিদ ও প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া এবং সর্বোপরি নানারকম ধর্মীয় উম্মাদনা সৃষ্টি ও জঙ্গিবাদে পৃষ্ঠোপোষকতা করা। সরকারের ছত্রছায়ায় ধর্মীয় উগ্রপন্থী জঙ্গিবাদী সংগঠনগুলোর সন্ত্রাসী কর্মতৎপরতার খবর প্রকাশিত হতে থাকে। এসময় দেশের বেশ কয়েকটি স্থানে উগ্রপন্থীরা বোমা হামলা চালায় এবং এতে বহু লোক হতাহত হয়। তাদের এসকল সন্ত্রাসী ও উগ্রপন্থী কার্যক্রমের ফলে দেশে-বিদেশে সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। সর্বোপরি দেশের মানুষের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়। সাধারণ মানুষ ধর্মের নামে রাজনীতি করে এ ধরনের অপপ্রয়াস চালানোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এরপর ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ইসলামপন্থী দলগুলোর জোট বিএনপি-জামায়াত ও চার দলীয় জোট সাধারণ মানুষের ভোটে প্রত্যাখ্যাত হয়। মূলত তাদের উপরিউক্ত কর্মকাণ্ডের ফলে ধর্মপন্থী রাজনীতি আরো পিছিয়ে পড়ে।

এছাড়া স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, স্বাধীন বাংলাদেশে আইডিএল (IDL) গঠনের মধ্যদিয়ে ইসলাম ধর্মপন্থী কয়েকটি দল প্রথমে সমন্বিতভাবে রাজনীতি শুরু করে। কিন্তু সে দলগুলোর মধ্যেও পরে ভাঙন সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে আশির দশক থেকে ধর্মপন্থী দলগুলো আন্দোলনের পদ্ধতি, ধর্মের ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য, নেতৃত্বের প্রশ্নে মতবিরোধ এবং আন্তর্জাতিক ইসলামি রাজনীতির নানামুখী প্রভাবে বিভিন্নভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে; যদিও সকল দলেরই মূল লক্ষ্য ছিল চূড়ান্তভাবে দেশে ধর্মভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা। এছাড়া আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ধর্মপন্থী দলগুলো দেশে ইসলামি আদর্শ বাস্তবায়নের কথা বললেও তারা জনগণের সামনে সেরকম উল্লেখযোগ্য কোন কর্মসূচি নিয়ে উপস্থিত হতে পারেনি। বরং বিভিন্ন সময় সামরিক শাসক ও পরবর্তীতে তাদের (সামরিক শাসকবর্গের) প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল, ফ্রন্ট ও অন্যান্য বড় দলে যোগ দেয়ার ফলে বাস্তবে তারা নিজেদের ঘোষিত লক্ষ্য থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়।

এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ধর্মপন্থী বেশ কয়েকটি দল ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল এবং বহুবিধ মানবতা বিরোধী অপরাধে জড়িত ছিল। সামরিক শাসনামলে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য পেলেও তাদের সেসব অপরাধের কথা এদেশের মানুষ ভুলে যায়নি। ফলে পুরাতন ইসলামি দলগুলো ১৯৭৬ সালে যখন পুনরুজ্জীবিত হয় এবং এর পরবর্তীতে যে বহু সংখ্যক নতুন ইসলামি দল গড়ে উঠে তাদের প্রতি সাধারণ মানুষ সবসময় সন্দেহ ও ঘৃণা পোষণ করে। এছাড়া ধর্মনিরপেক্ষ ধারার রাজনৈতিক দলগুলোও স্বাধীনতা বিরোধী ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর অতীত ইতিহাসের বিষয়টি জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করতে থাকে। এসবের ফলশ্রুতিতে ইসলামি দলগুলো আপামর জনসাধারণের বিশ্বাস ও আস্থা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়। এ কারণে ক্রমাগত ধর্মের দোহাই এবং ইসলাম ধর্মের উত্তম আদর্শের কথা প্রচার করেও তারা অধিকাংশ মুসলিম জনগণের সমর্থন পায়নি। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনগুলোর ফলাফল বিশ্লেষণ করলে এ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ দেখা যায় যে, তাদের একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক সমর্থক গোষ্ঠী রয়েছে। আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ্য যে, দেশের ক্রিয়াশীল ইসলামী দল ও জোটগুলো বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে প্রচণ্ড মাত্রার ভারত বিরোধী। অবশ্য এর মূলে রয়েছে ধর্মভিত্তিক দ্বি-জাতিতত্ত্বের চেতনা ও ঐতিহাসিকভাবে হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষের ধারাবাহিকতা। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা বাংলাদেশের ধর্মপন্থীদের ভারত বিরোধিতার অন্যতম আরেকটি কারণ।

এছাড়া বাংলাদেশের ধর্মপন্থী দলগুলো বৃহত্তর রাজনৈতিক পরিসরের জন্য বিভিন্ন সময়ে মোট পাঁচটি জোট গঠন করেছিল। সেসব জোটগুলোর কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, একমাত্র ইসলামী ঐক্যজোট রাজনীতিতে কিছুটা সফলতা অর্জন করতে পেরেছে। বাকী জোটগুলো তেমন কোন রাজনৈতিক সুবিধা অর্জন করতে পারেনি। বস্তুত এসব জোটের তেমন উল্লেখযোগ্য কোন কর্মসূচিও ছিল না।

তবে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির চাপ, ধর্মের নিজস্ব ব্যাখ্যা-বয়ান, পরকালের ভীতি প্রদর্শন, জাতীয় নির্বাচনের সময় বড় রাজনৈতিক দলগুলোর ক্ষমতায় যাবার বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হওয়া ও বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠীর উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে ধর্মপন্থী দলগুলো নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। এছাড়াও কখনো ক্ষমতার অংশীদারিত্ব লাভ, বৈদেশিক সহযোগিতা, সর্বোপরি ধর্মের প্রতি জনগণের দুর্বলতার অনুভূতিকে কাজে লাগানোর মধ্য দিয়ে ধর্মপন্থী দলগুলো ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সমর্থক গোষ্ঠী নিয়ে রাজনীতিতে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

তথ্যসূত্র

১. মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৩ (তৃতীয় বর্ধিত সংস্করণ), পৃ. ৩৬৩-৩৬৬, ৩৭৮-৩৭৯; হাসানুজ্জামান চৌধুরী, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাজতন্ত্র*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৪০, ৪৬

২. Ali Riaz, *Bangladesh A Political History since Independence,* I.B. Tauris & Co. Ltd., London, 2016, p. 162

৩. মো. আব্দুল হালিম, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, (বৃটিশ শাসনব্যবস্থা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাসঙ্গিক বিষয়সহ)*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১২৭-১২৮

৪. অনুচ্ছেদ- ৮(১) এবং অনুচ্ছেদ- ১২, দ্বিতীয় ভাগ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ৪

৫. Hafeez Malik, *Moslem Nationalism in India and Pakistan,* Public Affairs Press, Washington. D.C., 1963, p. 278

৬. মো. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, *বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির তিন দশক (১৯৭১-২০০০),* অসডার পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৯১

৭. রফিকুল ইসলাম (বীর উত্তম), *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৪, (পরিমার্জিত নবম সংস্করণ), পৃ. ১৪

৮. Shamsul I Khan, S. Aminul Islam, M. Imdadul Haque, *Political Parties and the Democratic Transition in Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka, 2008, p. 63

৯. B.M. Monoar Kabir, "The Politics of Religion : The *Jamat-i-Islami* in Bangladesh", Rafiuddin Ahmed (ed.), *Religion, Nationalism and Politics in Bangladesh*, South Asian Publishers, New Delhi, 1990, p.125; মওলানা আবদুল আউয়াল, *জামাতের আসল চেহারা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৭৫

১০. B.M. Monoar Kabir, The Politics of Religion : The *Jamat-i-Islami* in Bangladesh *Ibid*, p.128 মো. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৭

১১. মো. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০

১২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩; আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১০ (দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ), পৃ. ৪২২-৪২৩ (জামায়াতে ইসলামীর পুনরুত্থান ও

বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, মো. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৫-২২১)

১৩. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২৩-৪২৪

১৪. মো. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৩

১৫. Ali Riaz, *op.cit.*, pp. 73-74

১৬. *Ibid*, Appendix 7

১৭. *Ibid*, p. 78

১৮. *Ibid*, Appendix 7

১৯. *Ibid*, Appendix 5

২০. এ দলের প্রষ্ঠিতা লাভের ইতিহাস সম্পর্কে দেখুন, এম.এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭-১৯৪৭*, ইষ্টার্ন প্রিন্টিং পাবলিশিং এন্ড প্যাকেজেস লি:, প্রেস, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ১৯৬-১৯৮; মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন [১৭০৭-১৯৪৭]*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১২৩-১২৫

২১. মো. মাহবুবর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৫-৩৬৬

২২. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২০

২৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৯-৪২০

২৪. Shamsul I Khan, S. Aminul Islam, M. Imdadul Haque, *op.cit.*, pp. 56-57

২৫. বিস্তারিত দেখুন, *Ibid*, pp. 53-60; আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২০

২৬. মো. এনায়েত উল্যা পাটোয়ারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯০-২৯১

২৭. দলটির উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, *প্রাগুক্ত*. পৃ. ২৪২-২৪৪

২৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৫-২৫১, ২৬০

২৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৫

৩০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৭-২৭৯

৩১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০-২৮১

৩২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮১-২৮২, ২৮৩-২৮৭

৩৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৮-২৮৯; শাহেদ ইকবাল মো. মাহবুব-উর-রহমান, *বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি : সমস্যা ও সম্ভাবনা*, অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ২৫

Dhaka University Institutional Repository

৩৪. শিউলী বেগম, *বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান : একটি পর্যালোচনা*, অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯, পৃ. ৭৫-৭৬

৩৫. মো. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮৯-২৯০

৩৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯১-২৯২

৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯২

৩৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৩

৩৯. শাহেদ ইকবাল মো. মাহবুব-উর-রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫-২৬

৪০. আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩২

৪১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২-৩৩

৪২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

৪৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩-৩৪

৪৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪

৪৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪-৩৫

৪৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

৪৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫-৩৬

৪৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

৪৯. *প্রাগুক্ত*

৫০. শিউলী বেগম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭-৭৮

৫১. আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬-৩৭

৫২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২-৬৩

৫৩. মো. এনায়েত উল্যা পাটওয়ারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৫

৫৪. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৫

৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৬৮-২৭৪

৫৬. Ali Riaz, *op.cit.*, Appindix 6,7

৫৭. আমজাদ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০-৩১; নীম চন্দ্র ভৌমিক, বাসুদেব ধর, *সাম্প্রদায়িক বৈষম্য কার স্বার্থে*, শাশ্বত প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ৩৭

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশে সামরিক শাসন ও রাজনীতি : প্রসঙ্গ ধর্মের ব্যবহার

তৃতীয় অধ্যায়ে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে যেসকল ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল ও জোটের উত্থান ঘটেছিল, সেসকল দল ও জোটের উত্থানের কারণ, তাদের পরিচিতি, আদর্শ ও কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে বাংলাদেশে সামরিক শাসনামলে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির মাধ্যমে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশ পাকিস্তানের প্রদেশ হিসেবে প্রায় ১৩ বছর সামরিক বাহিনীর শাসনাধীনে ছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশটিতে তখন নানা ধরনের রাজনৈতিক সংকট ও অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়। অসংগঠিত প্রশাসন ব্যবস্থায় নানা অনিয়ম, দুর্নীতি, সর্বোপরি দেশের ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থা কাটিয়ে উঠতে শাসক শ্রেণি হিমশিম খেতে থাকে। এরকম পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা লাভের মাত্র সাড়ে তিন বছর পরেই সামরিক বাহিনীর একটি অনিয়ন্ত্রিত অংশ দেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার মধ্য দিয়ে শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটায়। তারপর থেকে প্রায় ১৫ বছর বাংলাদেশে সামরিক শাসন বহাল ছিল। এর মধ্যে প্রথম সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় সামরিক শাসক জেনারেল এইচ.এম.এরশাদ ১৯৮২ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এসময়কালে সামরিক শাসকবর্গ তাদের সুবিধামতো সামরিক বিধি-বিধান ও সংবিধান লঙ্ঘন, অসাংবিধানিক পন্থায় সংবিধান পরিবর্তন ও সংশোধন, রাষ্ট্রধর্ম প্রবর্তন, রাষ্ট্র ও প্রশাসনে সামরিকীকরণ, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন রাজনৈতিক দলগঠনসহ নানাবিধ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছেন। এছাড়া বিশেষ করে তারা দেশের জনগণের ধর্মভীরুতাকে পুঁজি করে নানা কৌশলে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করে জনগণের গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করেছেন। উল্লেখ্য যে, জেনারেল জিয়াউর রহমান সর্বপ্রথম ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের সূচনা করেন এবং এর একটি শক্ত ভিত্তি স্থাপন করতে সক্ষম হন। আর তার উত্তরসূরী জেনারেল এইচ.এম. এরশাদ সেটির বহুগুণ বিস্তৃতি ঘটান। বর্তমান অধ্যায়ে বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থানের পটভূমি, সামরিক সরকারগুলোর ক্ষমতা গ্রহণ, সামরিক শাসনামলে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার এবং সে প্রেক্ষিতে সৃষ্ট সমস্যাগুলো ইতিহাসের নিরিখে বিশ্লেষণ ও পুনঃমূল্যায়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে।

বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থানের সংক্ষিপ্ত পটভূমি :

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ইতিহাস সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, সুদীর্ঘকাল ধরে এদেশের জনগণ পর্যায়ক্রমে ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি শাসক শ্রেণির শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। আর এ ক্ষেত্রে তারা তাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, একতা, প্রজ্ঞা ও চেতনাবোধের যথার্থ পরিচয় দিয়েছে। তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবেই তাদের সকল আন্দোলন- সংগ্রাম পরিচালনা করেছে। কিন্তু ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলকে বানচাল করে দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবর্গ পূর্ববাংলার জনগণের উপর সম্পূর্ণভাবে একটি অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে বাংলার আপামর জনসাধারণ সে যুদ্ধে জয়লাভ করে তাদের স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কিছু চক্র এ স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। তারা তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টায়ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে রুখতে পারেনি। এজন্য স্বাধীনতা লাভের পর কীভাবে বাংলাদেশকে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নিঃশেষ করে দেয়া যায়, তার পথ খুঁজতে থাকে। আর তাদের ষড়যন্ত্রের সে ধারাবাহিকতায় সেনাবাহিনীর কিছু বিপদগামী সদস্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারের নৃশংসভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে স্বাধীন দেশে প্রথম সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায়। নিম্নে বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থানের পটভূমি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

পাকিস্তানি শাসনামলে প্রায় তের বছর সামরিক বাহিনী এদেশে শাসনকার্য পরিচালনা করেছে। বাঙালি সেনাসদস্যরা ক্যু করে পাকিস্তানি সেনাদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ঐ সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ করেছেন। সামরিক ক্যু করার ঐ প্রক্রিয়া জানা থাকায় তাদের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মানসিকতা স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছিল। আর ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের পাশাপাশি সামরিক বাহিনীর নিয়মিত সদস্যদের অনেকে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। ফলে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সেনাসদস্যরা রাজনীতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। এসব কারণে তাদের মধ্যে এক ধরনের রাজনৈতিক ক্ষমতা-সচেতনতা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তীকালে তাদেরকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে প্রলুব্ধ করে। এছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সেনাবাহিনীর অবদান সম্পর্কে তারা সচেতন ছিলেন এবং তারা আশা করেছিলেন স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্র পরিচালনায় তারা কার্যকর ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থানে থাকবেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ১৯৭২ সাল থেকেই ক্ষমতা দখলে আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং বিভিন্ন এলিট গ্রুপের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন।[১] এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীভুক্ত বাঙালি সৈনিকদের

অনেকে ‘চেইন অব কমান্ড’ ভেঙে বিদ্রোহ করে এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে ভিন্ন এক ধরনের নজির ও মানসিকতার সৃষ্টি হয়, যা পরবর্তীকালে তাদের আচরণের উপর প্রভাব ফেলে।[২]

এছাড়া স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা-পাকিস্তান প্রত্যাগত সেনাসদস্য, সেনাবাহিনী-রক্ষীবাহিনী, প্রভৃতি দ্বন্দ্ব বিরাজমান ছিল। পাকিস্তান প্রত্যাগত সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ (বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যাদের সংখ্যা ছিল অর্ধেকের চেয়ে বেশি) সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। কারণ, তারা যে আঠারো মাস পাকিস্তানে আটক ছিলেন সরকার তখন তাদের বেতন দেয়নি। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনেক জুনিয়র অফিসারকে দ্রুত পদোন্নতি দেয়ার ফলে পাকিস্তান প্রত্যাগত অনেক অফিসার তাদের সিনিয়রিটি হারান।[৩]

আর সামরিক বাহিনীর অনেকে আওয়ামী লীগ সরকারের পররাষ্ট্র নীতি বিশেষ করে ভারতের সঙ্গে মৈত্রী নীতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। ঐতিহাসিক কারণে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সদস্যরা ভারত বিদ্বেষী ছিলেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অংশ হিসেবে বাঙালি সৈন্যরা ঐ একই মনোভাব পোষণ করতেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে একত্রে লড়াই করলেও তাদের সে মনোভাব দূরীভূত হয়নি। অপরদিকে আওয়ামী লীগ সরকার মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার কারণে ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের নীতি গ্রহণ করে। এ ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রীকে অনেকেই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী বলে মনে করে এবং তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অপসারণ করে ভারতের আধিপত্য থেকে মুক্ত হতে চায়। সহজ ভাষায় সেনা সদস্যদের ভারত বিরোধী মনোভাব বঙ্গবন্ধু বিরোধী মনোভাবে পরিণত হয়।[৪]

বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর একটি অংশ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর উত্তরাধিকারী হিসেবে রক্ষণশীল ইসলামী আদর্শের অনুসারী ছিল। তাদের প্রত্যাশা ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের জনগণের জাতীয় জীবনে ইসলাম ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করাকে তারা ইসলাম ধর্মের প্রতি অবমাননা বলে মনে করে।[৫]

এছাড়া বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দেশি-বিদেশি শক্তি কিছুতেই স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বকে মেনে নিতে পারেনি। বিশেষ করে পরাজিত রাজনৈতিক দল জামায়াতে

ইসলামীসহ ইসলাম ধর্ম ভিত্তিক কয়েকটি দলের নেতৃবৃন্দ নতুন করে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র শুরু করে। এজন্য তারা বিদেশি বিভিন্ন শক্তিবর্গে সঙ্গে লিয়াঁজো করে সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং সামরিক বাহিনীর কিছু সদস্যদের উপর ভর করে তারা এতে সফলতা লাভ করে।[৬]

এছাড়া আন্তর্জাতিক কিছু কারণও বঙ্গবন্ধু হত্যার পিছনে কাজ করেছে। যেমন, ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিনজারের অন্যতম শত্রু ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কারণ, কিসিনজারের বিরোধিতা সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে তিনি কুটনৈতিক পরাজয় বলে মনে করতেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকে বানচাল করার জন্য কিসিনজার খন্দকার মোশতাক আহমদের (যিনি ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের অন্যতম পরিকল্পনাকারী) মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টির চেষ্টা করেন। মোশতাক আহমদ বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে আপস করার জন্য কলকাতার মার্কিন মিশনের মাধ্যমে পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সঙ্গে গোপনে আলোচনার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু সে ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেলে প্রবাসী সরকার মোশতাক আহমদকে কার্যত গৃহবন্দি করে রাখে। ১৯৭৪ সালে মার্কিনীদের সঙ্গে মোশতাক চক্রের সে পুরনো সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয়। ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে মোশতাক গ্রুপের লোকজন অভ্যুত্থান সম্পর্কে ঢাকার মার্কিন দুতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। বিষয়টি জানাজানি হলে মার্কিন রাষ্ট্রদুত ডেভিড ইউজিন বোস্টার এ ধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য দুতাবাস কর্মকর্তাদের প্রতি কড়া নির্দেশ প্রদান করেন। এরপরও দুতাবাসের সিআইএ প্রধান ফিলিপ চেরির নেতৃত্বে একটি গ্রুপ গোপনে তৎপরতা অব্যাহত রাখে। ধারণা করা হয় যে, কিসিনজারের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সংকেত পেয়েই চেরি অগ্রসর হন। আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অভ্যুত্থানকারীরা ধারণা লাভ করে যে, তারা ব্যর্থ হলে যুক্তরাষ্ট্র তাদের চিনবে না, আর যদি সফল হয় তাহলে নতুন সরকারকে নীরবে সমর্থন দিয়ে যাবে।[৭] এ প্রসঙ্গে হারুন-অর-রশিদ যথার্থই বলেছেন যে, বঙ্গবন্ধু হত্যার কারণ ছিল ব্যক্তিগত আক্রোশ এবং দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র।[৮] আবুল বারকাতও এ বিষয়ে একমত পোষণ করে বলেছেন যে, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।[৯]

এছাড়া তৎকালীন বিশ্বপরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ ছিল সোভিয়েত ব্লকে। তখন দু'পরাশক্তির মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এর নির্মম শিকারে পরিণত হন।[১০]

১৫ আগস্ট অভ্যুত্থান সম্পর্কে একজন বিদেশি সাংবাদিক লরেন্স লিফসুজ (তিনি একজন আমেরিকান সাংবাদিক। ১৯৭৪ সালে তিনি ঢাকায় এবং ১৯৭৫ সালে দিল্লীতে *Far Estern Economic Review* পত্রিকার দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সংবাদদাতা ছিলেন।) একটি গুরুত্বপূর্ণ ও নিরপেক্ষ তথ্য প্রদান করেছেন। তার মতে, বাংলাদেশে বামপন্থী বিপ্লবীদের সাম্ভাব্য উত্থান রোধকল্পে আওয়ামী লীগ এবং সামরিক-বেসামরিক আমলাদের ডানপন্থী অংশ ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থান ঘটায়। মুজিব সরকারকে উৎখাত বা ক্ষমতা দখলই অভ্যুত্থানকারীদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক এজেণ্ডা ছিল। তারা পাকিস্তানি ভাবাদর্শে নতুন বাংলাদেশ গড়ার পক্ষপাতী ছিল। তারা পাকিস্তানের আজন্ম শত্রু ভারতের সঙ্গে মুজিব সরকারের বন্ধুত্বকে বিদেশি শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ এবং সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে ইসলাম ধর্মের প্রতি অবমাননাকর বলে মনে করে। তাই তারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর রাষ্ট্রীয় মূলনীতিকেও ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন করে দেয়। তারা ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের পুনরুত্থান রোধ করতে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী জাতীয় চার নেতাসহ বঙ্গবন্ধুর নিকট সহযোগীদের নির্মমভাবে হত্যা করে।[১১]

এছাড়া সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশটির সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত অবকাঠামো ও অব্যবস্থাপনাপূর্ণ অর্থনীতি, চারদিকে ছড়িয়ে থাকা অবৈধ অস্ত্র, তথাকথিত বিপ্লবের নামে বামপন্থী কিছু সংগঠনের সরকার উৎখাতের প্রচেষ্টা, প্রতিরক্ষা খাতে স্বল্প বরাদ্দ, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও আমলাতন্ত্রের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, স্বাধীনতার পর জনগণের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে সমন্বয়হীনতা প্রভৃতি বঙ্গবন্ধুর সরকারকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দু'ভাবেই দুর্বল করে ফেলে। আর এ পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর পথভ্রষ্ট কিছু সদস্য ১৫ আগস্ট তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করে।[১২] আর এ হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়েই এদেশে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার সূচনা ঘটে।

বাংলাদেশে প্রথম সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠা ও জেনারেল জিয়াউর রহমানের ক্ষমতারোহণ:

১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পর অভ্যুত্থানকারী নেতৃবৃন্দ বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য বিশ্বাসঘাতক খন্দকার মোশতাক আহমদকে রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি সারা দেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।[১৩] তিনি ২৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর তৎকালীন উপস্টাফ প্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে জেনারেল শফিউল্লাহর স্থলে স্টাফ প্রধান নিয়োগ করেন। মোশতাক আহমদ সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং

১৯৭৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। তিনি বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভার ২৭ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১৮ জনকে কৌশলে তার মন্ত্রীসভায় স্থান করে দেন। আওয়ামী লীগের একটি বৃহৎ অংশ মোশতাক আহমদ ও তার সহযোগীদের বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী বলে নিন্দা জানায় ও প্রত্যাখ্যান করে। অপরদিকে মোশতাক সরকার সেনাবাহিনীর পূর্ণ সমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। অভ্যুত্থানে নেতৃত্বদানকারী জুনিয়র সামরিক অফিসারগণ সামরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে তাদের ট্যাংক ও সামরিক বাহিনীর লোকজন নিয়ে বঙ্গভবনে অবস্থান ও কার্যত সরকার পরিচালনা করছিলেন বিধায় উর্ধ্বতন অফিসারদের অনেকেই ক্ষুদ্ধ ছিলেন। কিন্তু মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান, যিনি মোশতাক আহমদ কর্তৃক সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান নিযুক্ত হন, তিনি সামরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে অনীহা প্রকাশ করেন। এছাড়া অভ্যুত্থানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ব্যক্তিগত ও আদর্শগত দ্বন্দ্বের কারণে মোশতাক সরকার দুর্বল হয়ে পড়ে।[১৪] এ অবস্থায় তৎকালীন সেনাবাহিনীর উপ-প্রধান বিগ্রেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সামরিক অফিসারদের মধ্যে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে নিজে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। এ পরিস্থিতিতে মোশতাক আহমদকে পদচ্যুত করে (১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বর) তার স্থলে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করা হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমানকে স্টাফ প্রধানের পদ থেকে সরিয়ে গৃহবন্দী করা হয়। খালেদ মোশাররফ নিজে স্টাফ প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মন্ত্রীসভা ও জাতীয় সংসদ ভেঙে দেয়া হয়। কিন্তু ৭ নভেম্বর খালেদ মোশাররফ পাল্টা বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। বিদ্রোহীরা জেনারেল জিয়াউর রহমানকে বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে সেনাবাহিনীর স্টাফ প্রধান পদে পুনঃঅধিষ্ঠিত করে।[১৫] জিয়াউর রহমান প্রথমে নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করলেও সামরিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাজমান দ্বন্দ্ব ও অস্থিরতার কারণে তিনি উক্ত পদ থেকে সরে দাড়ান এবং একজন নিরপেক্ষ নির্দলীয় ব্যক্তি হিসেবে বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে মেনে নেন। এরপর ১৯৭৫ সালের ৮ নভেম্বর এক সামরিক ঘোষণার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম নিজে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং সেনা, বিমান ও নৌ-বাহিনীর প্রধানগণকে ডেপুটি সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেন। তিনি সামরিক আইন আদেশ সাপেক্ষে সংবিধান বহাল রাখেন এবং ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণার কথা পুনব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে থাকলেও সামরিক কর্মকর্তাদের ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন ইচ্ছা বা পরিকল্পনা কোনটাই ছিল না। এছাড়া এসময় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে মত পার্থক্য ও স্বার্থের দ্বন্দ্বের কারণে দলগুলো সঠিকভাবে

সংগঠিত হতে পারেনি। এমতাবস্থায় ১৯৭৬ সালের ৩০ নভেম্বর বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল জিয়াউর রহমান নিজেই প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল রাষ্ট্রপতির পদে অধিষ্ঠিত হন।[১৬] আর এসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এদেশে প্রথম সামরিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর জেনারেল জিয়াউর রহমান তার সরকারের বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য পর্যায়ক্রমে ১৯৭৭ সালে গণভোট, ১৯৭৮ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও ১৯৭৯ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। এছাড়া তিনি রাজনৈতিক দল গঠনেরও নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যেমন, ১৯৭৮ সালে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) গঠন, জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট নামে জোট গঠন এবং সর্বশেষ ১৯৭৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিএনপি (বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল) গঠন করেন। উল্লেখ্য যে, জেনারেল জিয়াউর রহমান সংবিধান ও সেনা আইন লঙ্ঘন করে উপরিউক্ত কাজগুলো করেছেন।[১৭] আর এসময় প্রশাসন পরিচালনা সকল ক্ষেত্রে তিনি সামরিক বাহিনীর লোকদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বাংলাদেশের সামরিক শাসকদের রাজনীতিতে ধর্মকেন্দ্রিকতার মূল কারণসমূহ :

বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর সামরিক শাসকবর্গ ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতির সূচনা করেন। নিম্নে বাংলাদেশের সামরিক শাসকদের রাজনীতিতে ধর্মকেন্দ্রিকতার মূল কারণসমূহ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

(i) সামরিক বাহিনীর লোকেরাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু নিঃসন্দেহে কারিশম্যাটিক নেতা ছিলেন। তিনি দীর্ঘদিন আন্দোলন সংগ্রাম করে জাতিকে স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত করেছিলেন। জাতির জন্য তার এক ধরনের বিশেষ বার্তা ছিল। কিন্তু যারা বঙ্গবন্ধুর হত্যা পরবর্তী সময়ের সামরিক নেতা, তাদের পক্ষে জাতির জন্য কোন বিশেষ কিছু করে তাদের সংগঠিত করা ও আনুগত্য অর্জন করা সম্ভব ছিল না। এজন্য তারা জনগণের সমর্থন পাওয়ার লক্ষ্যে তাদের আবেগ অনুভূতিকে ব্যবহার করে ধর্মের কথা বলেছেন।

(ii) সামরিক শাসকবর্গ মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তিকে (যাদের রাজনীতি ছিল মূলত ধর্মকেন্দ্রিক) নিজেদের সামরিক তাবুতে টেনে নেয়ার চেষ্টা করেন। এটি মূলত সরাসরি রাজনৈতিক আহ্বান ছিলনা, ছিল ধর্মের ছায়ায় পরোক্ষ রাজনৈতিক আহ্বান।

(iii) ক্ষমতাসীন প্রশাসকের ক্ষমতায় অধিষ্ঠানের বৈধতার পরিমাণ যতো কম থাকবে সে প্রশাসন ততো বেশি ধর্মের উপর নির্ভর করবে। এটিও সামরিক শাসকবর্গের রাজনীতিতে ধর্মকেন্দ্রিকতার একটি বড় কারণ। এ কারণে '৮২ থেকে '৯০– এর যে প্রশাসন সে প্রশাসনের ধর্মের উপর নির্ভরতা মাত্রাগত দিক থেকে '৭৫ থেকে '৮২– এর প্রশাসন অপেক্ষা বেশি ছিল এবং তা সঙ্গত কারণেই।[১৮] Mohammad A. Hakim এ প্রসঙ্গে বলেন-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর দুই সামরিক শাসক জিয়া ও এরশাদ উভয়ই ইসলামকে তাদের ক্ষমতা বৈধকরণের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেন।[১৯]

সামরিক অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে সর্বপ্রথম ধর্ম ব্যবহারের প্রচেষ্টা :

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের প্রথম ব্যবহারের চেষ্টা করা হয় ১৫ই আগস্ট অভ্যুত্থানের পর-পরই। বঙ্গবন্ধুর ঘাতকরা তাকে (মুজিবকে) হত্যার পর-পরই ধর্মীয় বিষয়টি জনগণের মধ্যে প্রচার করে। ঢাকা বেতার থেকে বঙ্গবন্ধুর হত্যার খবর প্রচারের সময়ই তারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি ইসলামিক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে। কিন্তু খুনী চক্রের অন্যতম উপদেষ্টা খন্দকার মোশতাক আহমদ দেশের এ নাম বদলে বাঁধা দেন। খুনী মেজররা মোশতাক আহমদকে গদিতে বসিয়ে দেয়ার পর, তিনি দেশের নামের সঙ্গে 'ইসলামি' শব্দটি আর ব্যবহার করেননি। অথচ 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' যেদিন 'মুসলিম' কথাটি বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ 'আওয়ামী লীগ' হলো তার প্রতিবাদে সে দিনই তিনি ঐ সংগঠন থেকে ইস্তফা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যান। এখন প্রশ্ন হলো তাহলে দেশের নামের সঙ্গে 'ইসলামি' কথাটি তিনি বর্জন করলেন কেন? এর অন্য কারণ আছে এবং সেটি রাজনৈতিক। তিনি ভালোভাবেই বুঝেছিলেন যে, বঙ্গবন্ধুর হত্যার সঙ্গে সঙ্গে দেশের নামটি পরিবর্তন করলে তাতে জটিলতা বাড়বে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে তার সরকারের স্বীকৃতি আদায়ে অসুবিধা হবে। সম্ভবত এসব বিবেচনা থেকেই মোশতাক আহমদ তার প্রাথমিক অবস্থান থেকে সরে আসেন। বঙ্গবন্ধুর ঘাতক খুনীরা তখন সে বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। তাই পরবর্তীতে ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে বঙ্গবন্ধু হত্যার অন্যতম সদস্য মেজর (পরে কর্নেল) ফারুক এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে বলে যে- 'খন্দকার মোশতাক ইসলামি প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে ঘোষণা জারি না করে, মেজরদের (মুজিব হত্যাকারীদের) সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।'[২০]

জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনামলের ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার :

জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো বাংলাদেশের রাজনীতিতে এসময়ে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির আনুষ্ঠানিক পুনরুত্থান ঘটে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সালে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এ চারটি মূল বিষয়কে নির্ধারণ করে এদেশের সংবিধান রচিত হয় এবং সাংবিধানিকভাবে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার এবং কোন বিশেষ ধর্মপালনকারীর প্রতি বৈষম্য বা তার উপর নিপীড়ন নিষিদ্ধ করা হয়।[২১] কিন্তু জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের গুরুত্বকে বড় করে দেখেন এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে পুনরায় রাজনীতি করার সুযোগ প্রদান করেন।[২২] এ প্রসঙ্গে তালুকদার মনিরুজ্জামান বলেন- ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর নতুন সামরিক সরকার কর্তৃক ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি প্রত্যাখ্যাত হয়।[২৩] ফলে দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়। জামায়াতে ইসলামীসহ দক্ষিণপন্থী ইসলামি রাজনৈতিক গোষ্ঠীসমূহ স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। সঙ্গত কারণেই তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের বিরোধী ছিল। অর্থাৎ বাংলাদেশের মূল সংবিধানের (৭২-এর সংবিধান) সাথে কখনই তাদের একমত হবার কথা নয়। তাই তাদের জন্য সুযোগ এসে যায় জেনারেল জিয়াউর রহমানের ক্ষমতা গ্রহণের সময়। মূল সংবিধানে যেখানে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। জিয়াউর রহমান সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে এসব নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে দেন। এর ফলে সংবিধানের যে শর্ত ছিল ‘ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সংগঠন করার অধিকার কোন নাগরিকের থাকবে না’- এ সংশোধনীর মাধ্যমে তা বিলুপ্ত হয়। এছাড়া ৫ম সংশোধনীতে সংবিধানের শুরুতে “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম” যুক্ত করা হয়।[২৪] উল্লেখ্য যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশে প্রথম সামরিক শাসন জারি করা হয়। ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তা প্রত্যাহার করা হয়। সামরিক শাসন জারির পর রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফরমান/ আদেশ ইত্যাদি জারি করা হয়। এসময়ে সংবিধানেও সংশোধনী আনা হয়। উল্লিখিত ফরমানসমূহ এবং সংবিধানের সংশোধনীসমূহ পঞ্চম সংশোধনী দ্বারা অনুমোদিত হয়। আর বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী হিসেবে পরিচিত হবেন বলে ঘোষণা করা হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অপর মূলনীতি সমাজতন্ত্রকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার অর্থে গ্রহণ করা হয়।[২৫] এসবের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বা ধর্মীয় রাজনীতির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো এদেশে

পুনরায় রাজনীতি করার সুযোগ লাভ করে। জিয়াউর রহমানের এ উদ্যোগ গ্রহণের কারণেই জামায়াতে ইসলামী তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কা থেকে মুক্তি পেয়েছিল। আর তার শাসনামলেই জামায়াতে ইসলামী নতুন করে দল গঠনের অনুমতি পায়। তবে তারা প্রথমে 'ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ' নামে আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৯৭৯ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জোটবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইসলামি রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে ছিল। তাই সুযোগ বুঝে এবার তারা ইসলামি শাসন প্রবর্তনের জন্য জিয়া সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করে। মাওলানা ভাসানী ও তদানীন্তন বিমান বাহিনী প্রধান এম.জি তাওয়াব ইসলামি সংবিধানের দাবি সমর্থন করেন। উল্লেখ্য যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় তাওয়াব জার্মানিতে ছিলেন, একবার কলকাতায় এসে যুদ্ধে যোগ দিলে তার পদমর্যাদা ও বেতন কি হবে, সে নিয়ে দরদাম করে আবার জার্মানিতে ফিরে গিয়েছিলেন। পরে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে তাকে বিমান বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করেন।[২৬] অর্থাৎ এসময় থেকে বাংলাদেশকে মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে *Bangladesh, Domestic Politics* গ্রন্থে বলা হয়েছে-

> A significant development in the present day (during Zia regime) politics in Bangladesh has been the ascendency of the communal forces. It may be recalled that Sheikh Mujib's Government had taken stringent measures to eradicate communalism and had made principles of his politics. But the present regime has not only allowed communal politcal forces to be active in Bangladesh politics, they are being also given special position in the Government. Many bureaucrats, army officers and soldiers and politicians who had been prematurely retired or dismissed or blacklisted by the Mujib Government owing to their known pro-Pakistani commitment or act of collaboration, have been restored with full honour and benefits. Secularism has been dropped frm the preambles of the Constitution. The regime is openly describing Bangladesh as a "Muslim Country.""[২৭]

আর এদিকে তেল সমৃদ্ধ সাহায্যদাতা মুসলিম দেশগুলোও এসময় ইসলামি শাসন ব্যবস্থার জন্য চাপ প্রয়োগ করে।[২৮] ফলে একদিকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর সাহায্য সহযোগিতা লাভ, অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ প্রগতিশীল সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিয়ে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকে রাষ্ট্রীয় সকল কাজের ভিত্তি' বলে ঘোষণা

করা হয়।[২৯] এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণের এক পর্যায়ে বলেন "শাসনতন্ত্রে কিছু কিছু মৌলিক আদর্শ ও বিধান সম্পর্কে জনমনে যথেষ্ট অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। তাই দেশের মানুষের মন ও মানসিকতা, আশা ও আকাঙ্খার বাস্তব প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় শাসনতান্ত্রিক সংশোধন জারি করা হচ্ছে।"[৩০] এ মোতাবেক ১৯৭৭ সালে সংবিধান সংশোধন করা হলো এবং অন্যান্যের সাথে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সংবিধান থেকে বাদ দেয়া হলো। যদিও এর পিছনে পূর্বে উল্লিখিত কারণগুলোও দারুনভাবে কাজ করেছে। মূলত জেনারেল জিয়াউর রহমান তোয়াবের 'ইসলামী জলসা'কে গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছিলেন, রাজনীতিতে ধর্মকে টেনে আনলে তিনি আজীবন রাষ্ট্রপতি হিসেবে টিকে থাকতে পারবেন।[৩১] এ প্রসঙ্গে Anthony Mascarenhas বলেন-

> Once he beccame President he wanted to remain President for life..... Zia's Proclamation (Amendment) order, 1977, which gave the Constitution a distinctly Islamic tinge without really changing its broadly socialist and secular aspect, went a long way to win him public acclaim....... The Proclamation neatly excised all reference to 'Secularism' and qualified the word 'Socialism' to mean 'economic and social justice'. It was cosmetic surgery at its best because the amendments did not really change any of the operative clauses of the Constitution. But they did answer an emotional need."[৩২]

এছাড়া ১৯৭২ সালের সংবিধানে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের সাথে যোগসাজশের দায়ে দোষী ব্যক্তিদেরকে (এদের বেশিরভাগই ছিল ইসলামি দলগুলোর সদস্য ও সমর্থক) ভোটাধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছিল। ১৯৭৯ সালের পঞ্চম সংশোধনী দ্বারা জিয়াউর রহমান তাদের সে বিলুপ্ত অধিকারও ফিরিয়ে দেন। অর্থাৎ- একথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে, বাংলাদেশ পর্বে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের পুনরুত্থান ঘটে এ সময়কালে। মূলত স্বাধীনতা বিরোধী ধর্মীয় দল ও নেতৃবর্গের পুনর্বাসন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে সামরিক শাসনের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়।[৩৩] পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় তা আরো বিকশিত হয়ে বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক জীবনে নানা ঘটনা প্রবাহের জন্ম দিয়েছে।

এছাড়া জিয়াউর রহমান-এর সময় মুসলমানদের দু'টি ধর্মীয় উৎসবের (দুই ঈদের দিন) সময় রাস্তার দু'পাশে ও জনবহুল জায়গায় 'ঈদ মোবারক' লেখা ফেস্টুন লাগানোর রীতি চালু করা হয়। রেডিও এবং টেলিভিশনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সময় আযান দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অর্থাৎ তার সময়ে প্রচার মাধ্যমে ইসলামি ভাবধারা প্রচার করা শুরু হয়। এসময় নতুন করে ধর্ম সংক্রান্ত একটি মন্ত্রণালয় খোলা হয় এবং এ বিষয়ে একজন পূর্ণ মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। এছাড়া এসময় থেকে তিনি তার বিভিন্ন বক্তৃতার শুরুতে প্রকাশ্যে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলা চালু করেন। সর্বোপরি তার সময় মুসলিম দেশসমূহের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করা হয় এবং বাংলাদেশ তার নেতৃত্বে ওআইসি-এর গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে আবির্ভূত হয়।[৩৪]

এখানে আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে জিয়াউর রহমান কর্তৃক 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' স্থলে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ' চালু করা।[৩৫] তার এ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তিও ছিল ধর্ম। ভৌগলিক অবস্থান, অভিন্ন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক ঐক্য এবং অভিন্ন ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হচ্ছে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি। আর এগুলোর সঙ্গে ধর্ম যে তার বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের অন্যতম উপাদান ছিল, তা তার নিম্নোক্ত বর্ণনায় সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন, "আমাদের দর্শনের মধ্যে ধর্মীয় দর্শনও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। খালি ইহজগতের কথা ভাবলেই চলবে না, পরলোকের কথাও ভাবতে হবে। সুতরাং আমরা মানুষকে যে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের দর্শন দিচ্ছি, তাতে তিন ধরনের খোরাক আছে। যেমন, (১) ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য অন্ন সংস্থানের জন্য উৎপাদন বৃদ্ধির আহবান, (২) স্বাবলম্বী জীবন যাপনের জন্য অনুপ্রেরণা এবং (৩) পারলৌকিক জগতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে আত্মার শান্তি অর্জনের প্রচেষ্টা। এ কারণেই আমরা বলছি ধর্মের এলিমেন্ট যদি রাজনীতিতে না থাকে তবে সেটা ভুল হবে।"[৩৬] অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর বাঙালি জাতীয়তাবাদের স্থলে জিয়াউর রহমান বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে স্থান করে দেন। তবে এ দু'ধরনের জাতীয়তাবাদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। বঙ্গবন্ধুর বাঙালি জাতীয়তাবাদ হলো সকল সম্প্রদায়ের বাঙালির সমন্বিত জাতীয়তাবাদ। অর্থাৎ দেশের মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান প্রভৃতি ধর্ম-সম্প্রদায় সম্মিলিতিভাবে যে ইতিহাস ও ঐতিহ্য গড়ে তুলেছে বাঙালি জাতীয়তবাদ হলো সে গৌরবের ঐতিহ্যের অনুসারী। বাঙালি জাতীয়তাবাদ বদ্ধ জলাশয়ের মতো কোন ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা সূর্যের আলোর মতো প্রসন্ন, প্রশস্ত একটি উদার পটভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু জেনারেল জিয়াউর রহমান উল্লিখিত বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান দেশ। মোট জনসংখ্যার শতকরা নব্বই ভাগই ইসলাম

ধর্মাবলম্বী। আর জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ হলো সে বৃহৎ মুসলিম সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদ। অর্থাৎ ইসলামি জাতীয়তাবাদ।[৩৭] মূলত জিয়াউর রহমান এ ব্যাপক সংখ্যক মুসলিম জনগণকে লক্ষ্য করেই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ চালু করেছিলেন। জিয়াউর রহমানের এ বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের আবরণে আমাদের জাতীয় জীবনে ধর্মীয় সম্প্রদায়িকতা বেগবান হয়।[৩৮] তার (জিয়াউর রহমানের) বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন "---- বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন তুলে আমাদের বাঙ্গালি মানষ ও সংস্কৃতি তথা বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে একটা অকল্যাণকর দুষ্ট পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এর সুযোগ নিয়েই স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তিগুলি আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতার উজ্জ্বল চেতনা ম্লান ও ধূসর হয়ে তার জায়গায় ধর্মান্ধতার কালো মেঘ শিক্ষাঙ্গনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুস্থ চিন্তাকে আচ্ছন্ন করতে বসেছে। পায়তারা চলছে দেশটাকে একটা মৌলবাদী, পশ্চাদমুখী, সাম্রাজ্যবাদ ঘেষা 'মিনি পাকিস্তানে' পরিণত করার।"[৩৯] তিনি আরো বলেন যে, "বাঙ্গালি জাতীয়তাবাদ হলো আমাদের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ বলে কিছু নেই। যেমন ছিল না পূর্ব জার্মান জাতীয়তাবাদ বা পশ্চিম জার্মান জাতীয়তাবাদ বলে কিছু। ----- বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের মতো উদ্ভট তত্ত্ব ও সংকীর্ণ বর্জন নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, রাজনৈতিক স্থুল স্বার্থবুদ্ধি এবং উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোন রাষ্ট্রীয় বা প্রশাসনিক ফরমান উপরোক্ত বিকাশ ধারাকে ত্বরান্বিত ও মসৃন না করে তাকে বিভ্রান্ত, পঙ্গু ও বিকৃত করবে।"[৪০]

বাঙালি ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের অধিনায়ক জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী বলেন, "নাগরিক হিসেবে আমরা বাংলাদেশী হতে পারি, কিন্তু জাতীয়তার বিবেচনায় আমরা বাঙালি। ---- আমাদের ভুললে চলবে না যে, বাঙালি জাতীয়তার ভিত্তিতে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর জাতীয় পরিচয় বাঙালি। এই পরিচয় শত-শত বছরের। পাকিস্তান আমলে শত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই পরিচয় মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতেও তা সম্ভব হবে না।"[৪১]

এছাড়া জিয়াউর রহমান সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধেও ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করার প্রয়াস চালান। তিনি বলেন, "সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদ কিছু নয়। ----- আজ যা প্রয়োজন তা হচ্ছে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা। ইসলাম আমাদেরকে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে অনুপ্রাণিত করে।"[৪২] এসব ঘটনা

বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক ও সাংবিধানিকভাবে ইসলামি রাজনীতির সুযোগ করে দেন।

অনেকের মতে- রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রতি জিয়াউর রহমানের ইতিবাচক মনোভাব তার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ ছিল। এ ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক নয়। জিয়ার জনপ্রিয়তার কারণ হলো- সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশটিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার সঙ্গে অর্থনৈতিক দৈন্যতার সকল দায়ভার পড়েছিল আওয়ামী লীগ সরকারের উপর। তাছাড়া স্বাধীনতার লাভের পর বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল তার সঙ্গে বাস্তবতার অপেক্ষাকৃত কম মিল ছিল। কিন্তু জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অংশীদারী হন। এছাড়া দেশ পরিচালনার জন্য স্বাভাবিকভাবেই তার নিজস্ব কিছু প্রচেষ্টা ছিল। তবে সবকিছুর মূলে ছিল একজন অবৈধ সামরিক শাসক হিসেবে ধর্মভিত্তিক নিষিদ্ধ রাজনৈতিক দলগুলোকে রাজনীতি করার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে এবং রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে নিজের অবস্থান ধীরে ধীরে শক্ত করা যায় সে প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা।[৪৩]

১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে অবস্থানকালে সেনাবাহিনীর প্রায় ২০ সদস্যের একটি বিদ্রোহী গ্রুপের হাতে নিহত হন। কিন্তু তার মৃত্যুর ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জেনারেল আবুল মঞ্জুরের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে যায়। জেনারেল মঞ্জুর পালিয়ে ভারত যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সরকারের নির্দেশে পলায়নরত মঞ্জুরকে ধরে চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি থানায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে মূলত মঞ্জুরের আগ্রহে থানার কর্মকর্তা তার একটি জবানবন্দি টেপরেকর্ড করেন। তবে তার ঐ রেকর্ডকৃত বিবৃতি কখনও প্রকাশ করা হয়নি। সম্ভবত সেটি নষ্ট করে দেয়া হয় কিংবা হারিয়ে যায়। জেনারেল মঞ্জুর তাকে চট্টগ্রাম কারাগারে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ করেন। কিন্তু তা না করে পুলিশ দুজন বিদ্রোহী সেনা অফিসারসহ মঞ্জুরকে চট্টগ্রাম সেনানিবাসে প্রেরণ করেন এবং সেনানিবাসে প্রবেশের পরপরই এক রহস্যময় পরিস্থিতিতে তাদেরকে হত্যা করা হয়।[৪৪]

এসব হত্যাকাণ্ডের বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, স্বাধীনতার পর যাদের দেশ গঠনে মনোযোগী ও নিবেদিত হবার কথা ছিল, তারাই হয়েছে অন্ধকার পথের দিশারী। এ সামরিক বাহিনীর লোকেরাই সর্বপ্রথম সপরিবারে হত্যা করেছে স্বাধীন দেশের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আর তাদের ক্ষমতা ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে খুন হয়েছেন সামরিক রাষ্ট্রপতি জেনারেল জিয়াউর রহমান। স্বাধীন দেশে একটি ডিসিপ্লিনিড বাহিনীর এ হত্যার

রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পিছনে মূলত তাদের (সামরিক বাহিনীর) ক্ষমতার (রাজনৈতিক) অভিলাষকে দায়ী করা যায়।

জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণ :

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আব্দুস সাত্তার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং সামরিক কর্মকর্তাগণ আনুষ্ঠানিকভাবে 'নিয়মতান্ত্রিক সরকারের' প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে বিচারপতি আব্দুস সাত্তারের নিকট থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। তিনি রাষ্ট্রের সংবিধান স্থগিত, নির্বাচিত জাতীয় সংসদ বাতিল ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং সামরিক স্বৈরাতন্ত্র চালু করেন। উল্লেখ্য যে, ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে এইচ. এম. এরশাদ জিয়াউর রহমানের প্রদর্শিত পথেই সংবিধান ও সেনা আইন লঙ্ঘন করেছেন। এরশাদ তার ক্ষমতা দখলের যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে বিপন্ন জাতীয় অর্থনীতি, ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে ক্ষমতার কোন্দলে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিঘ্নত, খাদ্যের সমস্যা, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে অসমর্থ বেসামরিক সরকার ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দারুন অবনতির কথা উল্লেখ করেন।[৪৫] তিনি বলেন যে, জনগণ চরম হতাশা ও নৈরাজ্যে নিমজ্জিত, দেশ ও জনগণের প্রতি দায়িত্বের অংশ হিসেবেই সশস্ত্র বাহিনী সারা দেশে সামরিক আইন জারি করেছে।[৪৬] তার সামরিক আইন জারির ঘোষণাপত্রটি নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

> যেহেতু দেশে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটেছে, যখন দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, বেসামরিক প্রশাসন কার্যকর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হচ্ছে, সকল স্তরে সীমাহীন দুর্নীতি জীবনের অংশ হয়ে ওঠায় জনগণের জন্য দুর্বিষহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি সম্মানজনক জীবন যাপন, শান্তি, স্বস্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করে তুলেছে। রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালনকে উপেক্ষা করে ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের মধ্যে ক্ষমতার কোন্দলে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন হয়ে উঠেছে, যেহেতু দেশের জনগণ চরম দিশেহারা অবস্থা ও অনিশ্চতয়তার মধ্যে নিপতিত, যেহেতু জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আমাদের কষ্টার্জিত দেশকে সামরিক আইনের আওতায় আনার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে এবং দেশ ও জনগণের প্রতি তাদের দায়িত্ববোধের অংশ হিসেবে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর উপর দায়িত্ব বর্তেছে। যেহেতু আমি লে. জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য ও রহমত এবং আমাদের মহান দেশপ্রেমিক জনগণের আশীর্বাদ নিয়ে ২৪শে মার্চ ১৯৮২ বুধবার হতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল ও সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করছি এবং এ মুহূর্ত থেকে সমগ্র বাংলাদেশকে সামরিক আইনের আওতাভুক্ত বলে

ঘোষণা করছি। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে আমি বাংলাদেশের সকল সশস্ত্র বাহিনীর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করছি।[৪৭]

জেনারেল এরশাদ তার পূর্বসুরি জিয়াউর রহমানের মতোই দলগঠন, গণভোট, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে তার সরকারকে বৈধ করণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু এরশাদের দুর্ভাগ্য যে তিনি বৈধতা লাভে ব্যর্থ হন। ১৯৮৫ সালের গণভোট, ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচন ও ১৯৮৮ সালের সংসদ নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সকল বিরোধী দল অংশগ্রহণ করেনি এবং অংশগ্রহণকারী ভোটারের সংখ্যাও ছিল নগণ্য। ফলে সেগুলো একরতফা প্রদর্শনীতে পরিণত হয়। যদিও ১৯৮৬ সালের সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি দল অংশগ্রহণ করে। তবে মাত্র ১৪ মাস পর আওয়ামী লীগ ও জামায়াতে ইসলামী দল দু'টির সংসদ সদস্যগণ সংসদ থেকে পদত্যাগ করে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়। শেষ পর্যন্ত ১৯৯০ সালে ৬ ডিসেম্বর এক ছাত্র-গণঅভুত্থানের মধ্য দিয়ে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে।[৪৮] উল্লেখ্য যে, এরশাদ ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি 'জাতীয় পার্টি' প্রতিষ্ঠা করেন। এর পূর্বে তার পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮ দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিষদ, জনদল (১৯৮৩), জাতীয় ফ্রন্ট (১৯৮৫) গঠিত হয়।[৪৯] এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সামরিক শাসন জারি করার পর জেনারেল এরশাদ ৫টি লক্ষ্য ঘোষণা করেন। সেগুলো হচ্ছেঃ (১) ৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন, (২) সরকারি খাতে অপচয় কম, (৩) বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহ দান, (৪) খাদ্যে স্বনির্ভরতা অর্জন, (৫) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ও বাস্তব পন্থা গ্রহণ করা।[৫০] তবে তিনি এ লক্ষ্যগুলোর কথা বললেও তার শাসনামলের দীর্ঘ ৯ বছরের মধ্যে এর কোনটিই অর্জিত হয়নি।

জেনারেল এইচ. এম. এরশাদের সামরিক শাসনামলে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার :

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার তথা নানা উপায়ে রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সমন্বয় ঘটে এ সময়ে। পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, এরশাদ তার শাসনের বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম চলতে থাকে এবং দিন দিন তার স্বৈরশাসনের প্রতি মানুষ বিদ্রোহী হয়ে উঠে। কিন্তু এরশাদ অত্যন্ত কূটকৌশলতার সাথে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন এবং আন্দোলনের মোড় ঘুরিয়ে ভিন্ন পথে নেয়ার চেষ্টা শুরু করেন। এরই ধারাবাহিকতায় তিনি এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নেন এবং তাদের সহানুভূতি পাবার জন্য রাষ্ট্রধর্মের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত নানান বক্তব্য দিতে শুরু করেন।[৫১] ১৯৮৩ সালের ১৪ জানুয়ারি ঢাকায়

মাদ্রাসা শিক্ষকদের এক সম্মেলনে তিনি বলেন- ইসলামের আদর্শ ও রীতি-নীতি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিফলিত করতে হবে। এ সম্মেলনে তিনি আরও বলেন- দেশের ভবিষ্যৎ সংবিধানে ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। ইসলামের যারা শত্রু, আমাদের সংগ্রাম চলবে তাদের বিরুদ্ধে, আমরা বাংলাদেশকে করবো একটি ইসলামি রাষ্ট্র।[৫২] ১৯৮৩ সালের ১৫ জানুয়ারী *'দৈনিক ইত্তেফাক'* প্রত্রিকায় এরশাদের একটি বক্তব্য ছাপা হয়। তাতে তিনি বলেন, "ধর্ম হিসেবে ইসলাম থাকবে সকলের শীর্ষে। বাংলাদেশ মুসলমানদের দেশ। .... এবারের সংগ্রাম দেশকে ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করার সংগ্রাম।"[৫৩] এছাড়াও তিনি ঘোষণা করেন যে, আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে ধর্মের প্রতিফলন সুনিশ্চিত করাও ছিল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য।[৫৪]

এরপর এরশাদ ১৯৮৩ সালে স্কুলের শিক্ষা কারিকুলামে ইংরেজি ও আরবি বিষয়কে বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে চালু করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ১৯৮৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এরশাদের এ নীতির প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেন। ছাত্র সমাজের প্রতিবাদের মুখে তিনি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন।[৫৫]

এরপর এরশাদ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন ১৯৫২ সালে ভাষা শহীদদের স্মৃতিতে নির্মিত ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের উপর। একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনার প্রাঙ্গণ ও এর সিড়ির উপর এবং এর আশে-পাশের দেওয়ালে নানা ধরনের আল্পনা আঁকাকে তিনি ইসলামি সংস্কৃতি ও রীতি-নীতির বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন এবং এটি হিন্দু রীতি থেকে এসেছে বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া তিনি শহীদ দিবসের অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন শরীফ পাঠ করার আদেশ জারি করেন।[৫৬] কিন্তু একথা সবার জানা যে, একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে যারা প্রাণ দিয়েছেন, এ হলো তাদের স্মরণ অনুষ্ঠান। এ ভাষা আন্দোলনের প্রভাবই পরবর্তী পর্যায়ে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়। কাজেই এটি শুধু ভাষা আন্দোলন নয়, সম্মিলিত বাঙালি জাতির জাতীয় আন্দোলন। এজন্য এরশাদের এ আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ১৯৮৩ সালের গোড়ার দিকে দেশের বিরোধী দলগুলোর ২৩ জন বিশিষ্ট নেতা এক যুগ্ম বিবৃতিতে বলেন যে, সামরিক প্রশাসন ধর্মকে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করছে। তারা রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পরিবর্তন করছে, বাঙালি জাতিকে তাদের এ অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।[৫৭] এছাড়া ১৯৮৩ সালের ৯ জুলাই এক খবরে জানা যায় যে, ঢাকায় একটি 'ইসলামী ব্যাংক' খোলা হয়েছে। শীঘ্রই এ ব্যাংকের আরো দশটি শাখা খোলা হবে। ঐ

খবরে আরো প্রকাশ পায় যে, আগস্ট মাসে (১৯৮৩ সালে) প্রস্তাবিত (জেনারেল জিয়াউর রহমানের সময় প্রস্তাবিত) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শুরু হবে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০০ শিক্ষার্থীর শিক্ষা লাভের সুযোগ থাকবে।[৫৮]

জেনারেল এরশাদের এ সকল কর্মকাণ্ডের বৈধতা আদায়ের জন্য ও তার জনমুখীতার জন্য তার দলের লোকজন তাকে আল্লাহর একজন বিশেষ আর্শীবাদপুষ্ট ব্যক্তি বলে প্রচার চালায়। ১৯৮৭ সালের ১০ মার্চ জাতীয় সংসদ সদস্য বেগম হোসন আরা আহসান পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে জাতীয় সংসদে জানান, 'যারা সর্বশক্তিমান আল্লাহর আর্শীবাদ লাভ করেছেন, তাদের সমালোচনা করা ঠিক নয়।' তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট এরশাদকে আল্লাহ্ পছন্দ করেছেন। তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। সুতরাং তার সমালোচনা করা হবে ইসলাম বিরোধী কাজ। সংসদ সদস্যের এ বক্তব্য সংসদের কার্যবিবরণীতে সংযোজিত হয়েছে।[৫৯]

এরপর এরশাদ মনোযোগ দেন কীভাবে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা যাবে? ১৯৮৮ সালের ১৩ মার্চ বরিশালের শর্ষিনায় এক সমাবেশে তিনি বলেন- বাংলাদেশের অধিবাসীদের শতকরা ৯০ জনই মুসলমান। সুতরাং ইসলামকেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম করা উচিত। তিনি ঘোষণা করেন- নতুন সংসদ পবিত্র কোরআনকে ভিত্তি করে আইন প্রনয়ণ করবে। ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদ ১৬ বছর আগে তৈরী ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান সংশোধন করবে।[৬০] বাংলাদেশকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হবে কিনা, সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে এরশাদ জানান দেশের আইন-কানুন মুসলমানদের ধর্মীয় বিধি নিষেধের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার।[৬১]

এরই ধারাবাহিকতাকে ১৯৮৮ সালের ১১ মে ক্ষমতাসীন এরশাদের দল জাতীয় পার্টি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্মের মর্যাদা দেবার লক্ষ্যে জাতীয় সংসদে একটি বিল উত্থাপন করে। ৭ জুন সংসদে তা গৃহীত হয়। এভাবে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী সম্পন্ন করা হয়। এ সংশোধনীতে বলা হয় যে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাবে।[৬২]

তবে এ রাষ্ট্রধর্ম বিল পাশ হওয়ার পর চারদিক থেকে প্রতিবাদ শুরু হয়। ঢাকা শহরে ছাত্র-জনতা এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। পুলিশের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। সে সংঘর্ষে ঢাকা শহরেই

শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। উত্তেজিত জনতা ডজনখানেক সরকারি ও বেসরকারি গাড়ি পুড়িয়ে দেয়।[৬৩]

এ বিল সম্পর্কে আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, ক্ষমতার ভিত্তি মজবুত করতেই এরশাদ সরকার এ বিল উত্থাপন করেছেন। উদ্দেশ্য, ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে সুড়সুড়ি দিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলা।[৬৪]

অমুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকেও এ রাষ্ট্রধর্ম বিলের বিরোধিতা করা হয়। মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্ত এ বিলের বিরোধিতার জন্য 'হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ' গঠন করেন। ঐ পরিষদের নেতারা বলেন- এ 'বিল' মুক্তিযুদ্ধের ঐক্য চেতনার বিরোধী। এ বিল আইনে পরিণত হলে জাতীয় ঐক্য চেতনাকে ধ্বংস করতে পারে।[৬৫]

এছাড়া এরশাদ ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর সংবিধানের সপ্তম সংশোধনী আইন পাশ করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তারিখে বাংলাদেশে দ্বিতীয়বার সামরিক আইন জারি করেন। ১৯৮৬ সালের ১০ নভেম্বর তা প্রত্যাহার করা হয়। এ সময়ের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য তিনি যেসব ফরমান/আদেশ জারি করেছিলেন, সেগুলো সপ্তম সংশোধনীতে অনুমোদন করিয়ে নেন।

এরশাদ কর্তৃক সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা খুব সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা সম্পর্কে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান বলেন, "এরশাদের মতো দুরাচার স্বৈরশাসক সরলপ্রাণ মুসলমানদের দৃষ্টিভ্রম ঘটাবার কৌশল হিসেবে অষ্টম সংশোধনী জারি করে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করল। তাতেই এক শ্রেণীর মওলনা সাহেবেরা বগল বাজিয়ে বাহবা দিতে লাগলেন। কেউ খতিয়ে দেখলেন না যে, এরশাদ তার হাজার রকমের দুর্নীতি ও অনাচার আড়াল করার কু-মতলবে রাষ্ট্রের গায়ে ইসলামের লেবেল মেরেছে।"[৬৬] এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন- জিয়া ও এরশাদ আমলে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের রাজনৈতিক পুনর্বাসন এবং ধর্মের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক ব্যবহারের চুড়ান্ত রূপ ছিল ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা। সংবিধানে যত দিন এ সংশোধনী থাকবে ততোদিন বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা যাবে না। কারণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোন রাষ্ট্রধর্ম থাকে না।[৬৭] তবে এ বিষয়ে এরশাদ তার *সময়ের কথা এবং আত্ম বিশ্লেষণ* গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

"এদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ, ধর্মরিপেক্ষতার নামে ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা বা ধর্মহীনতা তারা মেনে নিতে পারে না। সে জন্যই ঐ সংশোধনীর প্রয়োজন হয়েছিল। আমি সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম সংযোজন করেই কি রাষ্ট্রের সেকুলার চরিত্র ধ্বংস করেছি? ধর্মের মর্যাদা দেয়া কিংবা ধর্মকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দেয়া যদি দেশদ্রোহিতা হয় এবং তার জন্য যদি আমার বিচার বা শাস্তি পেতে হয়, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে ইসলামী দুনিয়ায় দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছি। এটা আমার রাষ্ট্রনায়ক জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ম বলে মনে করি। এটা যদি খারাপ কাজ হয় এবং জনগণ যদি তা গ্রহণ না করে, তাহলে আমার পরে সেকুলার রাজনীতির প্রবক্তারা ক্ষমতায় এসে এটা বদলালেন না কেন?"[৬৮]

এছাড়াও এরশাদ ধর্মের নানারকম অপব্যবহার করেছেন। যেমন, ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে নিজের ধার্মিকতা বা মুসলমানিত্ব জাহির করতে শুক্রবারে টুপি মাথায় দিয়ে টেলিভিশন (বাংলাদেশ টেলিভিশন) কর্মীদের নিয়ে নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে যাওয়া ও টেলিভিশনে তা প্রচার করা। তারপর নানারকম ওয়াজ মাহফিলে যাওয়া, বিভিন্ন রকমের পীরদের দরবারে যাওয়া প্রভৃতি। আর সেসব জায়গায় গিয়ে এরূপ বক্তব্য রাখা যে, তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে সেখানে গেছেন। উল্লেখ্য যে, তিনি পিরোজপুরের শর্শিনা পীরের দরবারে এবং ফরিদপুরের আটরশি পীরের দরবারে বার্ষিক ওরশ মাহফিলে নিয়মিত যেতেন। এ প্রসঙ্গে আরও উল্লেখ্য যে, ১৯৮৯ সালে এরশাদ তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোকে নিয়ে জয়পুর হাটের এক পীরের দরবারে সাক্ষাৎ করেন। সেই পীর মুজিবুর রহমান অবশ্য ২০০৮ সালে গুলশানে তার ভক্তদের ছুরিকাঘাতে নিহত হন। এরশাদ এসব কাজ করেছেন এ কারণে যে, তিনি জনগণকে বোঝাতে চেয়েছেন ব্যক্তিগতভাবে তিনি একজন ধার্মিক লোক এবং একজন ধার্মিক লোককে ধর্মপ্রাণ জনগণ সমর্থন করুক। মূলত তার স্বৈরাচারী শাসনের জনমুখীতা ও জনসমর্থনের সাংঘাতিক ইমেজ সংকট ছিল। সে সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য তাকে এসব করতে হয়েছে।[৬৯]

জেইনস ডিফেন্স উইকলিতে ১৯৯০ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর উপর তথ্য সমৃদ্ধ একটি সংবাদ নিবন্ধ ছাপা হয়েছিল। নিবন্ধটি লিখেছিলেন পত্রিকাটির পাকিস্তানি সংবাদদাতা মুশাহিদ হোসেন। ঐ লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রদানকালে এরশাদ বাংলাদেশের সেনাবাহিনী, তার ক্ষমতালাভ, সামরিক-বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থাসহ নানাবিধ বিষয়ে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। তবে সাংবাদিক লেখক এক পর্যায়ে এরশাদকে প্রশ্ন করেন- বঙ্গবন্ধু ও জিয়াউর রহমানকে সামরিক বাহিনীর লোকেরা হত্যা করেছে? কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলে এরশাদ তাকে বলেন- 'সর্বশক্তিমানের ইচ্ছার উপর তার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে।' এছাড়াও এরশাদ তাকে আরও বলেন, আমি

নিজের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত নই। কোন সামরিক অফিসার আমাকে হত্যা করবে না। কারণ আমি তাদেরই একজন।'[৭০]

এছাড়াও ঐ সংবাদিককে এরশাদ আরো বলেন- বাংলাদেশের সামরিক বাহিনী অত্যন্ত রাজনীতি সচেতন এবং আমার সময়ে সৈন্যদের পবিত্র কোরআন শরীফ শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। আমাদের মেসে মদ্যজাতীয় পানীয় গ্রহণ নিষিদ্ধ। আমাদের সৈন্যদের আরবের বিভিন্ন দেশে পাঠানোর প্রয়োজন হতে পারে বিবেচনা করে মধ্যপদস্থ ও সিনিয়র অফিসারদের জন্য আরবি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ব্যবস্থা আছে।[৭১]

এরশাদ সাংবিধানিকভাবে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে রাষ্ট্রীয়ভাবে হিন্দু, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট চালু করেন। তার শাসনামলে রাষ্ট্রীয় খরচে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হয়। তিনি মসজিদ, মন্দির ও বৌদ্ধ বিহারের বিদ্যুতের বিল স্থায়ীভারে মওকুফ করে দেন। মুসলমানদের জু'মার নামাজ পড়ার সুবিধার জন্য তিনি রবিবারের পরিবর্তে শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি প্রবর্তন করেন। বায়তুল মোকাররমকে জাতীয় মসজিদের মর্যাদাসহ বহু নতুন মসজিদ নির্মাণ, ঈদগাহ প্রতিষ্ঠা ও পুরোনো মসজিদের সংস্কার করেন। নামাজের সময় রেডিও-টিলিভিশনে আযান প্রচারের ব্যবস্থা এরশাদের উদ্যোগে প্রবর্তিত হয়। এছাড়া এরশাদ যাকাত বোর্ড গঠন করেন। আর তার সময়েই শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনকে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়।[৭২] এছাড়াও হিন্দু-মুসলিমসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সরকারি অনুদান দেয়ার রীতিও এরশাদ চালু করেন।

এছাড়া এরশাদ তৎকালীন জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্রবেশমুখে, ঢাকা সেনা নিবাসের প্রবেশমুখের অদূরেসহ কয়েকটি স্থানে ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি খোদাই করে দেশের জনগণ ও বহিঃবিশ্বের লোকজনের কাছে এদেশের ইসলামি চিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। এর মাধ্যমে দেশের ধর্মভীরু জনগণের নিকট এবং বর্হিদেশীয় মুসলিম দেশসমূহের কাছে তিনি ইসলামি ব্যক্তিত্ব হিসেবে ও ইসলাম ধর্মের সেবক রূপে নিজেকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এরশাদ তার শাসনামলে রাষ্ট্রীয় খরচে বেশ কয়েকবার হজব্রত পালন করেছিলেন। মূলত এরশাদ মনে করতেন যে, ধর্মের ভাষায়, ধর্মের আবেদনে জনগণের কাছে পৌঁছাতে পারলেই একটা বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা যায়, একটা বৈধতা অর্জন করা যায়।[৭৩] এরশাদের উপরিউক্ত কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, তার সময়ে ব্যাপক মাত্রায় ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়।

সাম্প্রতিককালে (০১ ফেব্রুয়ারি ২০১০) সংবিধানের পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী নিয়ে মহামান্য আদালত (বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ) যে রায় ঘোষণা করেছেন সে পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয় সম্পর্কিত ঐতিহাসিক মূল্যায়নগুলোও নতুন করে বিচার বিশ্লেষণের সুযোগ তৈরী হয়েছে। আদালতের রায়ের যে পর্যবেক্ষণ সেটি হলো- "সামরিক ফরমানের মাধ্যমে সংবিধানের মূল কাঠামোয় পরিবর্তন করা হয়েছে।" মূলত সামরিক ফরমান জারির মধ্য দিয়েই সংবিধানের মূল অংশ পরিবর্তন করা হয়, যার মধ্যে ধর্মীয় রাজনীতির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে পঞ্চম সংশোধনীতে সেটি পাশ করিয়ে নেয়া হয়। এর ফলে বাংলাদেশে ধর্মীয় রাজনীতির পুনরুত্থানের বিষয়টি সবসময় প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়ে রয়েছে। সামরিক শাসনামলে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার এবং ধর্মীয় আবেগকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের সহানুভূতি লাভের যে প্রচেষ্টা তা ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করা গেছে। এ বিষয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে পক্ষে - বিপক্ষে মতামতও রয়েছে। তবে মহামান্য উচ্চ আদালত কর্তৃক সংবিধানের পঞ্চম ও সপ্তম সংশোধনী বাতিলের যে রায় প্রদান করা হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সময়ে রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। এ রায়ে আরও প্রমাণিত হয় যে, তারা সেনা আইন লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন, অবৈধ উপায়ে সংবিধান স্থগিত রেখেছেন, সংশোধন করেছেন এবং সর্বোপরি ধর্মের বহুবিধ রাজনৈতিক ব্যবহার করেছেন। আর এ রায়ের মাধ্যমে এটাও প্রমাণিত হয় যে, বৃহৎ ত্যাগের মাধ্যমে এ দেশের মানুষ যে স্বাধীনতা অর্জন করল, মুক্তিযুদ্ধের যেসকল আদর্শের ভিত্তিতে সংবিধান প্রনীত হয়েছিল, সামরিক শাসকবর্গের উপরিউক্ত কর্মকাণ্ডের ফলে সংবিধানের সে অসাম্প্রদায়িক-গণতান্ত্রিক চেতনা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সম্প্রদায়িকতা উদ্ভব হয়েছে প্রভৃতি।[৭৪] সাধারণ মানুষ তখন এ বিষয়ে কোন মতামত প্রদান করতে পারেনি। ফলে দেশের অগ্রযাত্রা শুরুতেই বাঁধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে সামরিক বাহিনীর এসকল কর্মকাণ্ডের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা এভাবেও করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশই একমাত্র রাষ্ট্র যেখানে সামরিক ফরমানের মাধ্যমে ধর্মীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠীর রাজনীতিতে পুনর্বাসন ঘটেছে, যা পৃথিবীর ইতিহাসে ব্যতিক্রমী ঘটনা।

সামরিক শাসকদের ধর্মকেন্দ্রিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলাফল :

সামরিক শাসকদের ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতির বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, একটি অশুভ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সামরিক শাসকবর্গ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। ক্ষমতায় আসার চক্রান্তে তারা সপরিবারে হত্যা করে বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এরপর গণতন্ত্র নির্বাসিত হয়। দেশে চালু হয় সামরিক স্বৈরতন্ত্র। সামরিক শাসকবর্গ যেহেতু অবৈধ

পথে ক্ষমতা দখল করেন, তাই তারা তাদের ক্ষমতার বৈধতা লাভের আশায় এ দেশের সরল প্রাণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগান। রফিউদ্দিন আহমদ এ প্রসঙ্গে বলেন যে, সামরিক শাসকগণ জনগণের সমর্থন পাওয়ার জন্য ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করেছিলেন।[৭৫] অনুরূপভাবে আলী রীয়াজও বলেন- জেনারেল জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এরশাদ দু'জনেই রাজনৈতিক স্বার্থে ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করেন।[৭৬] নিজেদের হাজারো দুর্নীতি ও অপকর্মকে ঢাকার জন্য নানা উপায়ে তারা ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার শুরু করেন। তাদের পৃষ্ঠপোষকতার পুরাতন ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর পুনরুত্থান হয় এবং বহু নতুন ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়। তাদের এসকল কর্মকাণ্ডের ফলে বহু অসুবিধার সৃষ্টি হয়। যে অসাম্প্রদায়িক ও মুক্তবুদ্ধির চেতনা নিয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছিল, সেটি বাঁধাগ্রস্ত হয়। আর এর ফলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের নিরাপত্তাহীনতা, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব, সংঘ্যালঘু নির্যাতন প্রভৃতি নেতিবাচক কার্যক্রম ধীরে ধীরে সমাজ ও রাষ্ট্রে স্থান করে নিতে শুরু করে।

সামরিক শাসকবর্গের ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পরবর্তীতে আমরা দেখতে পারি। সেটি হলো সকল রাজনৈতিক দলগুলোর ব্যাপক মাত্রায় ধর্মনির্ভরতা। মূলত সামরিক শাসনামল থেকেই মানুষের আচার-আচরণে ইসলামের প্রভাব পড়া শুরু হয়।[৭৭] আর '৯০-এ স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের পতনের পর দেশে গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারা শুরু হলে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীদের মধ্যে ধর্মের প্রচ্ছন্ন প্রভাব পড়তে শুরু করে। এমনকি দলের স্বাভাবিক সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডেও ধর্মের প্রতিফলন দেখা যায়। বিশেষ করে নির্বাচন পূর্ববর্তী প্রচার-প্রচারণায় রাজনীতিবিদদের ধর্মকেন্দ্রিকতার সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে ২০০৮ সাল পর্যন্ত মোট ৪টি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল নির্বাচনে যে সকল দল ও জোট অংশগ্রহণ করেছে এবং ক্ষমতায় এসেছে, তারা সকলেই কোন না কোন কৌশলে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করেছে। সেটা তাদের নির্বাচনী পোস্টার, স্লোগান, বক্তব্য প্রভৃতি কর্মকাণ্ডে প্রকাশ পেয়েছে। ধর্মনির্ভর দল থেকে ধর্মভিত্তিক, ধর্মনিরপেক্ষ কোন দলই এ ব্যাপারে পিছপা হয়নি।[৭৮] এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে যে দেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেদেশে এখন ধর্মভিত্তিক ও ধর্মের নামে রাজনীতি বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। '৭৫ থেকে '৯০ পর্যন্ত সময়ে শাসকের বৈধতা সন্ধানের প্রেক্ষাপটে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পুনরুত্থান। কিন্তু তার আগে-পরে এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের কারণ রাজনৈতিক। '৯৬ সালের ১২ জুনের

নির্বাচনের সময় থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রধান দু'টি দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি 'বিসমিল্লাহ' উচ্চারণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত আছে।[৭৯]

আর '৯০-এর পরবর্তী গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আরেকটি বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, ক্ষমতাসীন দল বা বিরোধী দল ধর্ম বিষয়ে বা ধর্মনিরপেক্ষতা বিষয়ে নিজদের সুবিধামতো সময়-সুযোগে একপক্ষ অপরপক্ষকে কেবল বিষেধাগার করেছে। কিন্তু এ বিষয়ে তারা কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। এছাড়া সামরিক শাসকবর্গ যেসকল বিষয়ে ধর্মের ব্যবহার করেছেন, ধর্মের নামে যেসকল বিষয়ে সুযোগ-সুবিধা চালু করেছেন, পরবর্তীতে গণতান্ত্রিক সরকারগুলো ক্ষমতায় আহরণ করে সেসকল বিষয়ে কোন সংস্কার বা পরিবর্তন আনতে পারেন নি। কারণ, পিছনে তাদেরকে জনগণ ধর্ম বিরোধী ভাবতে পারে। আর এতে তাদের জনপ্রিয়তা হারানোর ভয় থাকে, ভোট হারানোর ভয় থাকে। আর যেসব রাজনৈতিক দল ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে, রাষ্টধর্মের বিপক্ষে কথা বলে তাদের জনসমর্থন কম, ভোটের রাজনীতিতে তাদের অবস্থান হালকা ও দুর্বল।

এছাড়া দেশে সামরিক শাসন ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি চালু থাকার ফলে 'গণতন্ত্র' ও 'রাষ্ট্রধর্ম' প্রসঙ্গ নিয়ে বহু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা জানি ধর্মনির্ভর রাজনীতি গণতান্ত্রিক প্রনোদনা বিরুদ্ধ। অর্থাৎ বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা হলেও সংবিধানের অষ্টম সংশোধনীর 'রাষ্ট্রধর্ম' বিষয়টি গণতন্ত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। সংবিধানে যতদিন এ সংশোধনী থাকবে ততোদিন বাংলাদেশকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা যাবে না। কারণ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কোন রাষ্ট্রধর্ম থাকে না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ।[৮০]

তবে ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর এসকল বিষয় সম্পর্কে নতুন করে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। সংবিধান সংশোধন নিয়ে কথা হচ্ছে। সংবিধান সংশোধনের জন্য বিশেষ কমিটি গঠিত হয়েছে। তারা আলোচনা-পর্যালোচনা করছেন। অতি সম্প্রতি সংবিধান সংশোধনীর বিশেষ কমিটির চেয়ারম্যান বিভিন্ন গণমাধ্যমে যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, "সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষতা দু'টিই বহাল থাকবে।" অথচ বিষয় দু'টি এমন যে একটি থাকলে অপরটি থাকতেই পারে না। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। নিম্নে কয়েকটি প্রতিক্রিয়া উল্লেখ করা হলো :

সংবিধান সংশোধন সম্পর্কে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মিজানুর রহমান ভিন্নমত পোষাণ করেছেন। তিনি বলেন যে, বর্তমান সংবিধানে একই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম সাংঘর্ষিক। তিনি মনে করেন, সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' এর পরিবর্তে 'পরম করুনাময় সৃষ্টিকর্তার নামে' উল্লেখ থাকলে কোন ধর্মকেই অবমাননা করা হবে না। তিনি আরো বলেন- রাষ্ট্রের কোন ধর্ম থাকতে পারে না, ধর্ম থাকে মানুষের।[৮১]

বিশিষ্ট রাজনীতি বিশ্লেষক অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন- সংবিধানে বিসমিল্লা এবং রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম উপহার দিয়েছিলেন যথাক্রমে- দুই স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমান এবং হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ। আর বর্তমান সরকার তাদের সে উপহারকে সাদরে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকতে হবে এমন কোন কথা নবীজী [হযরত মুহাম্মদ (সা.)] বলেননি। পবিত্র কোরআন শরিফে মানুষকে বিভিন্নভাবে 'হে মানব জাতি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 'হে মুসলিম জাতি' বলে উল্লেখ করা হয়নি। মানুষ এত মুর্খ নয় যে, সংবিধানে বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম রেখে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব এমন কথা বিশ্বাস করবে।[৮২]

বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দলের আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন- স্বৈরাচারী সরকারগুলো তাদের অবৈধ ক্ষমতাকে বৈধ করার জন্যই সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযুক্ত করে কিংবা ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করে। আর বর্তমান সরকার সে সিদ্ধান্তকে মেনে নিচ্ছে।[৮৩]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাব্বত খান বলেন- সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। এ বিধানের কোন আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক অন্য কোন আইন থাকতে পারে না। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, যে দেশের রাজনৈতিক নেতারা তাদের অবস্থান ঠিক রাখতে পারেন না সেখানে সাংঘর্ষিক বিষয়তো থাকবেই।[৮৪]

জাসদ সাধারণ সম্পাদক শরীফ নুরুল আম্বিয়া বলেন- ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম রাখা হলে ধর্মান্ধ গোষ্ঠীই এর সুযোগ নেবে।[৮৫]

বিএনপি-এর মুখপাত্র মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন- সংবিধান কোন অবস্থাতেই সংশোধন করা যাবে না।[৮৬]

এছাড়া ধর্মপন্থী দলগুলো সবসময়ই রাজনীতিতে ধর্মের আবশ্যকতার বিষয়টি প্রচার করে আসছে। সর্বোপরি তারা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি বন্ধেরও দাবি তুলছে।

অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ও ধর্মপন্থীরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতের পক্ষে প্রচার করছেন। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের ধর্মপন্থী রাজনীতি, ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি, জাতীয় উন্নয়ন, গণতন্ত্র, রাষ্ট্রধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে একটি সংকট তৈরি হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে একটি বড় সংকট। আর এর জন্য নিকট অতীতের সামরিক শাসকবর্গকে দায়ী করা যায়। কারণ, তারাই রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের সূচনা করেছেন এবং নানামাত্রায় ধর্মের ব্যবহার করেছেন।

উপরিউক্ত ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশে প্রথম সামরিক শাসন শুরু হয়। এরপর সুদীর্ঘ ১৫ বছর দেশে সামরিক শাসন অব্যাহত ছিল। মূলত সামরিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই বাংলাদেশে ধর্মপন্থী রাজনীতির সূচনা ঘটে। সামরিক শাসকবর্গ যেহেতু ক্যু করে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, এজন্য তাদের জনভিত্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। আর এ কারণেই মূলত তারা এদেশের ধর্মপ্রাণ জনগণের আনুকূল্য পাবার আশায় বিভিন্ন কৌশলে ধর্মের ব্যবহার করেছেন। মূলত বাংলাদেশের প্রথম সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে রাজনীতিতে ধর্মের গুরুত্বকে বড় করে দেখেন এবং তিনি '৭২-এর সংবিধানের মূল চেতনার পরিবর্তন করে স্বাধীনতার পর নিষিদ্ধ ঘোষিত ইসলামপন্থী দলগুলোকে রাজনীতি করার সুযোগ প্রদান করেন। এর ফলে নিষিদ্ধ ইসলামি দলগুলোর পুনরুত্থান ঘটে এবং বহুসংখ্যক নতুন ধর্মপন্থী দলের জন্ম হয়। আর এ দলগুলো যখন তাদের কার্যক্রম শুরু করে, তখন নানাভাবে এদেশের জনগণের সঙ্গে তারা সম্পৃক্ত হয় এবং ধীরে ধীরে সমাজ ও রাষ্ট্রে স্থান করে নিতে থাকে। আর পরবর্তী সামরিক শাসক জেনারেল এইচ.এম. এরশাদ তার পূর্বসুরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তিনি ব্যাপক মাত্রায় ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের প্রসার ঘটান। এক পর্যায় ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার ফলে রাষ্ট্রে আন্তঃধর্মীয় সম্পর্ক নষ্ট হয় এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বৈষম্যের স্বীকার হন। এ সুযোগে ইসলাম ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এছাড়া সামরিক শাসনামলে ধর্মীয় রাজনীতির কারণে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হয়েছে এবং জাতীয় উন্নয়ন ব্যহত হয়েছে। আর পরবর্তীতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হলে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর ধর্মনির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আর সামরিক শাসকদের এসকল কর্মকাণ্ডের ফলে ধর্ম বা রাজনীতি কোনটাই লাভবান হয়নি বা সঠিক পথে চলতে পারেনি। আর এসব প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এদেশের মানুষকে দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন

ধারায়-উপধারায় বিভক্ত করে শাসকগোষ্ঠী নিজেরা ক্ষমতার ভিত্তি শক্ত করেছেন, আর সম্পদের মালিক হয়েছেন। ফলে সাধারণ মানুষের ভাগ্যের প্রকৃত পরিবর্তন বা উন্নয়ন সম্ভব হয়নি।

তথ্যসূত্র

১. রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশ : সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ৪১-৪২

২. হারুন-অর-রশিদ, *বাংলাদেশ : রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১০, (পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ৩৪১

৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪১-৩৪২; আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১০, (দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ), পৃ. ১৬৯; এম এস এম নাসিরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতি*, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৩৬-৩৭

৪. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতি : সংস্কৃতির স্বরূপ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১৩৭

৫. আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০

৬. হারুন-অর-রশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪২

৭. *The Daily Star*, 15, 16, 17, 20 August, 2005; আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের রাজনীতি : সংস্কৃতির স্বরূপ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০

৮. হারুন-অর-রশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪০

৯. আবুল বারকাত, *বাংলাদেশে মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির*, মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ২২০

১০. হারুন-অর-রশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪২

১১. *The Daily Star*, 15, 16, 17 August, 2005; Lawrence Lifsehultz, Kai Bird, *Bangladesh : The Unfinished Revolution*, Zed Press, London, 1979, pp. 102-103

১২. এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, এম.এ. হামিদ, *তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১, (চতুর্থ সংস্করণ), পৃ. ১৩-৯০

১৩. Al Masud Hasanuzzaman, *Role of Opposition in Bangladesh Politics*, The University Press Limited, Dhaka, 1998, p. 67

১৪. Zillur R. Khan, *Martial Law to Martial Law : Leadership Crisis in Bangladesh*, The University Press Limited., Dhaka, 1984, p. 242; আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের রাজনীতি : সংস্কৃতির স্বরূপ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

১৫. ৩ নভেম্বর ও ৭ নভেম্বর এর সেনা অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থান ও তৎসংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Rounaq Jahan, *Bangladesh Politics : Problems and Issues*, University Press Limited, Dacca, 1980, pp. 197-198; Al Masud Hasanuzzaman, *op.cit.*, p.68; Shaikh Maqsood Ali, *From East Bengal to Bangladesh Dynamics and Perspectives*, The University Press Limited, Dhaka, 2017 (Second revised edition), pp. 406-407; এম. এ. হামিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২-১৮৮

১৬. বিস্তারিত দেখুন, Rounaq Jahan, *Ibid*, p. 205; Al Masud Hasanuzzaman, *Ibid*, p. 76; আবুল ফজল হক, ২০০৭, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১-১৪৪; আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম, *বঙ্গভবনে শেষ দিনগুলি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৭-৩৯ (বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ, অনুবাদক : মশিউল আলম)

১৭. এ সম্পর্কে দেখুন, Rounaq Jahan, *Ibid*, pp. 206-208; হাসান উজ্জামান, *বাংলাদেশ : রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরণ*, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৪৫-৪৭; রফিকুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯-৮৪; আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের রাজনীতি : সংস্কৃতির স্বরূপ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১-১৫১; এম এস এম নাসিরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২০-১৩৭

১৮. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৪

১৯. উদ্ধৃত, মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান, "নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্মীয় উপাদান", আল মাসুদ হাসানউজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে নির্বাচন*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৩৪

২০. পরেশ সাহা, *বাংলাদেশ : ষড়যন্ত্রের রাজনীতি (অখণ্ড)*, জ্যোৎসা পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৩৫৪

২১. Syed Anwar Husain, "Islamic Fundamentalism in Bangladesh Internal Variables and External Inputs", Rafiuddin Ahmed (ed.), *Religion, Nationalism and Politics in Bangladesh,* South Asian Publishers, New Delhi, 1990, pp. 137-138; অনুচ্ছেদ- ৮(১) এবং অনুচ্ছেদ- ১২, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ৪

২২. Ali Riaz, *Bangladesh A Political History since Independence*, I.B. Tauris & Co. Ltd., London, 2016, p. 72; Shaikh Maqsood Ali, *op.cit.*, p. 406

২৩. Talukder Maniruzzaman, "Bangladesh Politics : Secular and Islamic Trends", Rafiuddin Ahmed (ed.), *op.cit.*, p. 63

২৪. Harun-or-Rashid, "Desecularisation and the Rise of Political Islam in Bangladesh", *Journel of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum.)*, Vol.-57(1), Dhaka, 2012, pp. 32-33; মো. আব্দুল হালিম, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, (বৃটিশ শাসনব্যবস্থা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাসঙ্গিক বিষয়সহ)*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১২৭-১২৮

২৫. Al Masud Hasanuzzaman, *op.cit.*, p.77; মোহাম্মদ আলী, "বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিবর্তন", তারেক শামসুর রেহমান, (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর, প্রথম খণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ১৩৬

২৬. আনিসুজ্জামান, *নির্বাচিত প্রবন্ধ, (বাংলাদেশে ধর্ম, রাজনীতি ও রাষ্ট্র)*, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৪৯-১৫০

২৭. উদ্ধৃত, সা'দ উল্লাহ্, *ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৪২

২৮. এম জহিরুল হক শাকিল, "বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি", তারেক শামসুর রেহমান, (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, প্রথম খণ্ড*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ.১৮০

২৯. আনিসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০

৩০. সা'দ উল্লাহ্‌, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২০৭

৩১. *প্রাগুক্ত*

৩২. Anthony Mascarenhas, *Bangladesh : A Legacy of Blood*, Hodder and Stoughton, London, 1986, pp.124-125

৩৩. হাসান উজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২; এম এস এম নাসিরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ১৩৪

৩৪. Ali Riaz, "The Politics of Islamization in Bangladesh", Ali Riaz (ed.), *Religion and Politics in South Asia*, Routledge, New York, 2010, p. 57; Harun-or-Rashid, *op.cit.*, p. 33

৩৫. Ali Riaz, Bangladesh A Political History since Independence, *op.cit.*, p. 155

৩৬. উদ্ধৃত, এম জহিরুল হক শাকিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮১

৩৭. পরেশ সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৯

৩৮. আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের রাজনীতি : সংস্কৃতির স্বরূপ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮

৩৯. কবীর চৌধুরী, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ মুক্তবুদ্ধির চর্চা*, রাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশন্স, লন্ডন, ১৯৯২, পৃ. ৫১-৫২

৪০. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১-৫২

৪১. উদ্ধৃত, আবুল ফজল হক, ২০০৭, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬

৪২. *দৈনিক সংবাদ*, ৫ এপ্রিল ১৯৭৮

৪৩. Shantanu Majumder, "Secularism and Anti Secularism", Ali Riaz (ed.), *Routledge Handbook of Contemporary Bangladesh*, Routledge, New York, 2016, pp.41-43

৪৪. Marcus F. Franda, *Bangladesh : The First Decade*, South Asian Publishers Pvt. Ltd., New Delhi, 1982, pp.318-319: আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের রাজনীতি : সংস্কৃতির স্বরূপ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২; এম এস এম নাসিরুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ, ১৩৭

৪৫. Al Masud Hasanuzzaman, *op.cit.,* p. 104

৪৬. রফিকুল ইসলাম, *সামরিক জান্তার রাজনীতি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২, পৃ. ৮৫

৪৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫

৪৮. Al Masud Hasanuzzaman, *op.cit.,* pp. 133-135; আবুল ফজল হক, বাংলাদেশের রাজনীতি : সংস্কৃতির স্বরূপ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১

৪৯. হারুন-অর-রশিদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৫

৫০. রফিকুল ইসলাম, সামরিক জান্তার রাজনীতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০ (বিস্তারিত দেখুন, পৃ. ৯০-১০৩)

৫১. শিরীন মজিদ, *শেখ মুজিব থেকে খালেদা জিয়া*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৬২

৫২. পরেশ সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৫

৫৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৫ জানুয়ারী ১৯৮৩

৫৪. উদ্ধৃত, এম জহিরুল হক শাকিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ.১৮২

৫৫. Al Masud Hasanuzzaman, *op.cit.,* p. 106

৫৬. B.M. Monoar Kabir, "The Politics of Religion : The *Jamat-i-Islami* in Bangladesh", Rafiuddin Ahmed (ed.), *op.cit.*, p. 126; পরেশ সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৫-৩৫৬

৫৭. পরেশ সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৬

৫৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৬-৩৫৭

৫৯. *জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণী*, ১০ মার্চ, ১৯৮৭ (উদ্ধৃত, পরেশ সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৬)

৬০. আবুল কাশেম হায়দার ও সোহেল মাহমুদ, *বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাস : নওয়াব সলিমুল্লাহ থেকে খালেদা জিয়া*, প্যানোরমা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪২৯

৬১. *The Independent*, London, 15 March 1988

৬২. Talukder Maniruzzaman, *op.cit.*, p.90; Ali Riaz, Bangladesh A Political History since Independence, *op.cit.*, p.73 অনুচ্ছেদ- ২/ক, সংবিধানের অষ্টম সংশোধন আইন, ১৯৮৮, (১৯৮৮ সালের ৩০ নং আইন)-এর ২ ধারা বলে ২/ক অনুচ্ছেদ সন্নিবেশিত, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত), ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ.৪, ১০

৬৩. পরেশ সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৭

৬৪. *প্রাগুক্ত*

৬৫. *প্রাগুক্ত*

৬৬. আনিসুজ্জামান, *ক্রান্তিকালের নেত্রী শেখ হাসিনা*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১৯

৬৭. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন,"বাংলাদেশের রাজনীতি : প্রেক্ষাপট, প্রকৃতি ও প্রতিফলন", তারেক শামসুর রেহমান, (সম্পাদিত), ২০০৮, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

৬৮. উদ্ধৃত, এম জহিরুল হক শাকিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩

৬৯. Lailufar Yasmin, "Bangladesh-India Relations : Neighbourliness beyond Terroism" Imtiaz Ahmed (ed.), *Terrorism in the 21st Century Perspectives from Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka, 2009, p. 81; Ali Riaz, The Politics of Islamization in Bangladesh, *op.cit.*, p. 57; Harun-or-Rashid, *op.cit.*, p. 34; বদরুদ্দীন উমর, *বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার*, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৮৩-৮৪; সা'দ উল্লাহ্, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩; মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৪-১৩৫

৭০. পরেশ সাহা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬২

৭১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৩ (ঐ সাক্ষাতকারটি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, পৃ. ৩৫৯-৩৬৩)

৭২. আবুল কাশেম হায়দার ও সোহেল মাহমুদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৩

৭৩. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের রাজনীতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

৭৪. Harun-or-Rashid, *op.cit.*, p. 37

৭৫. Rafiuddin Ahmed, "Introduction", Rafiuddin Ahmed (ed.), *op.cit.*, p. 29

৭৬. Ali Riaz, Bangladesh A Political History since Independence, *op.cit.*, p. 75

৭৭. Ali Riaz, The Politics of Islamization in Bangladesh, *op.cit.*, p. 49

৭৮. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, "বাংলাদেশের রাজনীতি : প্রেক্ষাপট, প্রকৃতি ও প্রতিফলন", তারেক শামসুর রেহমান, (সম্পাদিত), ২০০৮, *প্রাগুক্ত*, পৃ.২২

৭৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

৮০. *প্রাগুক্ত*

৮১. *দৈনিক সংবাদ*, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১ (ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে *সাপ্তাহিক বর্তমান সংলাপ*-এর ১৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত "সংবিধান অবমাননা" শীর্ষক মুক্ত আলোচনায় উক্ত মন্তব্য করা হয়।)

৮২. *প্রাগুক্ত*

৮৩. *প্রাগুক্ত*

৮৪. *প্রাগুক্ত*

৮৫. *প্রাগুক্ত*

৮৬. *প্রাগুক্ত*

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ধর্ম ব্যবহারের পদ্ধতি ও কৌশল

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সামরিক শাসনামলে বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। দীর্ঘ নয় মাস এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭২ সালে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র এ চারটি মূল বিষয়কে নির্ধারিত করে এদেশের সংবিধান রচিত হয় এবং সাংবিধানিকভাবে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার এবং কোন বিশেষ ধর্মপালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তার উপর নিপীড়ন নিষিদ্ধ করা হয়।[১] কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে এদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হয়। ১৯৭৬ সালে জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে পুনরায় রাজনীতি করার সুযোগ প্রদান করেন। এর ফলে সংবিধানের যে শর্ত ছিল 'ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক অন্য কোন সমিতি বা সংগঠন করার অধিকার কোন নাগরিকের থাকবে না'-এ বিষয়টি বিলুপ্ত হয়। উপরন্তু ৫ম সংশোধনীতে সংবিধানের শুরুতেই "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" যুক্ত করা হয়।[২] এর ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বা ধর্মীয় রাজনীতির দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে রফিউদ্দিন আহমদ বলেন যে, বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর সামরিক সরকারের সহায়তায় ইসলামি রাজনীতির পুনরুত্থান ঘটে।[৩] এসময় ক্রমান্বয়ে ধর্মকেন্দ্রিক কয়েকটি রাজনৈতিক দলের পুনরুত্থান ঘটে এবং বেশ কিছু নতুন ধর্মপন্থী দলের সৃষ্টি হয়। যেমন, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ (আইডিএল), জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (বর্তমানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী), মুসলিম লীগ (কাদের), মুসলিম লীগ (মতিন), মুসলিম লীগ (ইউসুফ), মুসলিম লীগ (জমির আলী), জাতীয় খেলাফত পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (মুফতি আমিনী), বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (আজিজুল হক), বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন, ইসলামী ঐক্য আন্দোলন, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, বাংলাদেশ হিন্দু লীগ, বাংলাদেশ সংখ্যালঘু ঐক্য ফ্রন্ট, বাংলাদেশ তফসিল ফেডারেশান, বাংলাদেশ হিন্দু-ঐক্য ফ্রন্ট, জাতীয় হিন্দু পরিষদ, বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু পার্টি, বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ প্রভৃতি।[৪] এছাড়া এসময় ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরেও বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের

সৃষ্টি হয়। যদিও সেগুলোর বেশির ভাগই ছিল নামসর্বস্ব। এ দলগুলো প্রকাশ্যে তাদের মতাদর্শের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে থাকে। শুরু হয় রাজনীতির নতুন মেরুকরণ। আর এসময় থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে নানাভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের অল্প কিছু দিন পর থেকেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করতে থাকে। বর্তমান অধ্যায়ে ১৯৭১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ধর্মের রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কিত দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রাজনৈতিক দলগুলোর শাসনকালের (সময়ের) ক্রমানুসারে বর্তমান অধ্যায়ের আলোচনা বিন্যস্ত করা হয়েছে। তবে আরেকটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট থেকে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত এদেশে সামরিক শাসন বহাল ছিল।[৫] ১৯৭৫ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত সময়কালে জেনারেল জিয়াউর রহমান এবং ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সময়কালে জেনারেল এইচ. এম. এরশাদ উক্ত সামরিক শাসনের নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। উপরিউক্ত সময়কালের প্রথমাংশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের পুনরুত্থানের সূচনা হয়েছে এবং শেষাংশে নানা উপায়ে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সেসকল বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এজন্য বর্তমান অধ্যায়ে ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সময়কালের আলোচনার পর-পরই ১৯৯১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সময়কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের রাজনীতিতে ধর্ম ব্যবহারের পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার কোন নতুন কথা নয়। মানব জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, শাসক-শোষক শ্রেণি সব সময়ই কোন না কোনভাবে ধর্মকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে এসেছে। এক একটি ধর্মের উত্থানের যুগে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে তাদের কিছু কিছু প্রগতিশীল ভূমিকা থাকলেও সে ধর্ম যখন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন তাকে (সে ধর্মকে) শাসক-শোষক শ্রেণি নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করে। এভাবে দাস যুগ থেকে শুরু করে সামন্ত যুগ পর্যন্ত প্রয়োজন মত ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার প্রত্যেক দেশে, প্রতিটি সমাজেই দেখা গেছে। পুঁজিবাদের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে ধর্মের এরূপ ব্যবহার পুঁজির এবং পুঁজিমালিক বুর্জোয়া শ্রেণির শ্রেণিগত বিকাশের ক্ষেত্রে বাঁধাস্বরূপ হওয়ায় বুর্জোয়া বিপ্লবের মাধ্যমে ইউরোপে ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিন্ন করা হয় এবং রাজনৈতিকভাবে ধর্মের ব্যবহার রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বন্ধ করা হয়। এভাবে সরাসরি রাজনৈতিকভাবে ধর্মের ব্যবহার বন্ধ করা হলেও শ্রমিক শ্রেণির ভয়ে ভীত বুর্জোয়ারাও পরবর্তীকালে সামন্তবাদের সঙ্গে কিছু আপোষ করে এবং তার ফলে ধর্মকে নতুনভাবে

তারা ক্ষেত্রবিশেষে কাজে লাগায়। তবে এসব সত্ত্বেও একটি উন্নত পুঁজিবাদী দেশে ধর্মের সরাসরি রাজনৈতিক ব্যবহার আজকের দিনে নেই বললেই চলে। অবশ্য একথা সত্য যে, এসকল উন্নত পুঁজিবাদী বা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো এখন নিজেদের দেশে ধর্মের কোন রাজনৈতিক ব্যবহার আগের মতো না করলেও বিশ্বের পশ্চাৎপদ, উপনিবেশিক ও নির্ভরশীল দেশগুলোতে তারা ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে থাকে। ভারতবর্ষের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বৃটিশ সরকার ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে আমাদের দেশের জনগণকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত করে এককে-অপরের বিরুদ্ধে পরিচালিত করেছিল, সেটা এ দেশের মানুষ খুব ভালোভাবে দেখেছে এবং তার বিষময় ফল ভোগ করেছে।[৬]

বৃটিশ আমল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাংলা ভূখণ্ডের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে ধর্ম বরাবরই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের জনগণ ধর্মের প্রশ্নে অত্যন্ত আবেগপ্রবন ও ধর্মভীরু। এদেশের রাজনীতিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়। কেননা জাতীয় রাজনীতির বিকাশ ধারায় ধর্ম বিভিন্নভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। অবশ্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্ম ব্যবহৃত হয়েছে ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষমতার ভিতকে শক্তিশালী করার মাধ্যম বা উপায় হিসেবে। অর্থাৎ বিভিন্ন ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দল তাদের নিজেদের স্বার্থে ধর্মকে নানাভাবে ব্যবহার করেছে। স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সময়কালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নানাভাবে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করেছে। নিম্নে এ বিষয়গুলো আলোচনা করা হবে।

আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর একটি পরিসংখ্যান, প্রধান- প্রধান রাজনৈতিক দলের মূল আদর্শ ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে সংক্ষেপে একটি ধারণা দেওয়া হলো: স্বাধীনতার পূর্বে পূর্ববাংলার প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ছিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, পিপলস পার্টি প্রভৃতি।[৭] কিন্তু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্মপন্থী দলগুলো পাকিস্তানের পক্ষালম্বন করায় স্বাধীনতা লাভের পর তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সরকার পরিচালনার কাজ করতে থাকে। এসময় থেকে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির কার্যক্রমও চালু হয়। এসময় জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের অল্প কিছুদিন পরেই (১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট) সামরিক বাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্য জাতির জনক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে। তারপর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে দেশে সামরিক শাসন জারি করেন এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এরপর জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে রাজনৈতিক দলবিধি জারি করেন। এতে বলা হয় যে, রাজনৈতিক দল গঠনের পূর্বে সরকারের অনুমতি লাগবে। এসময় ৬০টি দল আবেদন করলেও মাত্র ২১টি দলকে রাজনীতি করার অনুমতি দেয়া হয়। উল্লেখ্য যে, এসময় অন্যান্য দলের সঙ্গে স্বাধীনতার পর নিষিদ্ধ ঘোষিত ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলগুলো পুনরায় এদেশে রাজনীতি করার অনুমতি পায়। আরো উল্লেখ্য যে, এর আগে ১৯৭৬ সালের মে মাসে এক দাপ্তরিক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। এরপর ১৯৭৮ সালে জিয়াউর রহমান রাজনৈতিক দল বিধি প্রত্যাহার করে নেন। তখন দেশে নতুন রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। এক পর্যায়ে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যায়।[৮] এসময় থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিসংখ্যানে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বিভিন্ন রকম পাওয়া গেছে। যেমন, ১৯৮৬ সালের ১৭ জানুয়ারি প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক বিচিত্রায়' দেশে ১৬০টি রাজনৈতিক দলের কথা উল্লেখ করা হয়।[৯] ৫ জানুয়ারি ১৯৮৮ সালে 'দৈনিক ইনকিলাবে' প্রকাশিত একটি পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে, দেশে ১৩টি জোটভুক্ত প্রায় ২২৫টি রাজনৈতিক দল এবং জোট বহির্ভুত প্রায় ২০টি দল রয়েছে।[১০] উল্লেখ্য যে, ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১৪টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছিল। আর ১৯৭৯ সালে অংশগ্রহণ করেছিল ২৯টি রাজনৈতিক দল।[১১] এছাড়া ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৯০টি রাজনৈতিক দল বিভিন্ন প্রতীক নিয়ে অংশগ্রহণ করে।[১২] ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে মোট ৮১টি রাজনৈতিক দল।[১৩] ২০০১ সালের সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ৫৪টি পার্টি।[১৪] আর ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ৩৯টি দল অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে ১২টি ছিল ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল। তবে এ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর নিবন্ধন আবশ্যক ছিল এবং নির্বাচন কমিশনের অনুমতির প্রয়োজন ছিল। উল্লেখ্য যে, এসময় ১১৭টি দল নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছিল।[১৫]

তবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ দলগুলো হচ্ছে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (বর্তমানে বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী), বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, ন্যাপ (মোজাফফর), বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল এবং ওয়ার্কার্স পার্টি। এদের মধ্যে আওয়ামী লীগ দেশের সবচেয়ে পুরাতন রাজনৈতিক দল এবং গ্রাম পর্যায়ে তাদের সংগঠন বিস্তৃত রয়েছে।[১৬] স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি এ দলগুলোই ক্ষমতার সংস্পর্শে এসেছে,

এবং প্রতিটি দলেরই রয়েছে ধর্মকেন্দ্রিকতার নানা কৌশল ও পদ্ধতি। এছাড়া অন্যান্য বামপন্থী দলগুলো এবং ডানপন্থী দলগুলো কখনো নিজেরা স্বতন্ত্রভাবে, কখনো জোটবদ্ধভাবে, আবার কখনো উপরিউক্ত বড় দলগুলোর সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রাম করেছে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে এবং সরকার গঠনে অংশীদারিত্ব লাভ করেছে। এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে তার ছত্রছায়ায় ও পৃষ্ঠপোষকতায় 'বিএনপি' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। তিনি নিজেই এ দলের চেয়ারম্যান ছিলেন। আর জেনারেল এইচ.এম. এরশাদের সময় ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'জাতীয় পার্টি' নামে আরেকটি নতুন রাজনৈতিক দল। তিনিও তার পূর্বসূরীর মত নবগঠিত দলের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন।[১৭] ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।[১৮] আর ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।[১৯] যদিও এ দু'টি নির্বাচনে ভোট দানের প্রক্রিয়া ছিল ভিন্ন। মূলত ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে এ দু'টি নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে এ দু'টি দল (বিএনপি ও জাতীয় পার্টি) বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৯০ সালে স্বৈরাচার এরশাদ সরকারের পতনের পর দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত মোট চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত নির্বাচনগুলোতে দল দু'টি কখনো এককভাবে, আবার কখনো ভিন্ন ভিন্ন জোট গঠনের মাধ্যমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, কখনো ক্ষমতার অংশীদারিত্ব লাভ করেছে, আবার কখনো প্রধান বিরোধী দলে অবস্থান করেছে।

বাংলাদেশের প্রধান-প্রধান রাজনৈতিক দলের মূল আদর্শ

নিম্নে সংক্ষেপে বাংলাদেশের প্রধান-প্রধান রাজনৈতিক দলের মূল আদর্শ তুলে ধরা হলো :

(১) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তিতে তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। দলটি বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। সামাজিক মূল্যবোধগুলোর প্রতি তারা উদার মনোভাব পোষণ করে।

(২) বিএনপি

দলটি মুক্ত অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে ধর্মকে তারা প্রধান উপাদান হিসেবে মনে করে। সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি তারা শ্রদ্ধাশীল। দলটি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী।

(৩) জাতীয় পার্টি

এ দলটি মূলত বিএনপি-এর আদর্শকেই হুবুহু ধারণ করে। তবে দলটি রাজনীতিতে ধর্মের গুরুত্বকে বড় করে দেখে।

(৪) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

এটি ইসলাম ধর্মভিত্তিক প্রধান রাজনৈতিক দল। দলটি মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে। সামাজিক মূল্যবোধগুলোর ব্যাপারে তারা বেশ রক্ষণশীল। ধর্মীয় কিছু বিষয় বাদে তারাও মুক্ত অর্থনীতিতে বিশ্বাসী।

(৫) বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

দলটি সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। তবে তারা নিদের্শিত অর্থনীতিতে বিশ্বাসী। বিভিন্ন সামাজিক মূল্যবোধের প্রতি তারা বড় ধরনের উদারতায় বিশ্বাসী।

(৬) ইসলামী ঐক্যজোট

কট্টরপন্থী ইসলামী দল। নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে তারা বিশ্বাস করে। সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে তারা সাংঘাতিক রক্ষণশীল। আর বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী।

(৭) বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন

এটিও কট্টরপন্থী ইসলামী দল। মূলত ইসলামী ঐক্যজোট ও বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন একই ধরনের আদর্শে বিশ্বাসী।

(৮) জাসদ

বামপন্থী রাজনৈতিক দল। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি তাদের অন্যতম লক্ষ্য। সামাজিক মূল্যবোধগুলোর প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি উদার। তারা ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী।

(৯) বাসদ

এটিও বামপন্থী রাজনৈতিক দল। সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা তাদের মূল আদর্শ। সামাজিক বিভিন্ন ইস্যুতে তারা বেশ সরব। তবে তারা নির্দেশিত অর্থনীতিতে বিশ্বাসী।[২০]

(১০) বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি

এটিও বামপন্থী রাজনৈতিক দল। জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি তাদের অন্যতম লক্ষ্য। তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী।[২১]

উল্লেখ্য যে, দেশের জনগণের মৌলিক মানবিক অধিকার ও শ্রমিক শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বামদলগুলো সর্বদাই আন্দোলন সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের প্রধান-প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি

এম জহিরুল হক শাকিল বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোকে ধর্মের ভিত্তিতে একটি শ্রেণি বিন্যাস করেছেন। নিম্নে সেটি উল্লেখ করা হলোঃ

(১) ধর্মীয় জীবন বিধান বিরোধী রাজনৈতিক দল

ধর্মীয় আদর্শ ও বিধি বিধান দ্বারা দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি পরিচালিত হোক তারা এর বিরোধী পক্ষে। এ ধরনের দলগুলোর মধ্যে রয়েছে কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক দলগুলো। যেমন- জাসদ, বাসদ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি প্রভৃতি।

(২) ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দল

এরা নিজেরা ধর্মনিরপেক্ষতার দাবি করে। কিন্তু কার্যত নীতি ও আদর্শের দিক থেকে ধর্মীয় জীবন বিধানের বিপক্ষে তারা সহজে কিছু বলে না। আবার রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের পক্ষেও শক্ত অবস্থান নেয় না। যেমন, আওয়ামী লীগ, গণফোরাম, বিকল্পধারা, এনডিপি প্রভৃতি।

(৩) ধর্ম পরিচয় ভিত্তিক রাজনৈতিক দল

এ দলগুলো মূলত ইসলামের ধর্মীয় মূল্যবোধের পক্ষে কথা বলে। ইসলামি ঐতিহ্য রক্ষার কথা বলে এবং ধর্মাচারণমূলক অনেক কাজ করে। কিন্তু ইসলামি নিয়ম-নীতি ও বিধি-বিধান দ্বারা রাষ্ট্র ও সমাজের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হোক এবং সকল আইনের উৎস হোক কোরআন-সুন্নাহ, এ বিষয়টি তারা কৌশলে এড়িয়ে চলে। ধর্ম পরিচয় ভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- বিএনপি ও জাতীয় পার্টি।

(৪) ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল

ধর্মীয় নীতি-আদর্শ দ্বারা দেশের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করাই এদের প্রধান লক্ষ্য। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে রয়েছে- জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (বর্তমানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী), বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম পার্টি, খেলাফত মজলিশ, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, জাকের পার্টি প্রভৃতি। এ দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশই (বর্তমানে বাংলাদেশ জামায়েত ইসলামী) প্রধান। কারণ, ১৯৭৫ সালের পর থেকে সবগুলো সংসদ নির্বাচনে তাদের প্রার্থী ছিল এবং সংসদে কেউ না কেউ প্রতিনিধিত্ব করেছে।[২২]

নিম্নে ১৯৭১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত সময়কালে উপরিউক্ত দলগুলোর রাজনীতিতে ধর্মকে ব্যবহারের পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

আওয়ামী লীগ (১৯৭১-১৯৭৫)

১৯৭২ সালে যে চারটি (জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র) মূল বিষয়কে নির্ধারিত করে বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান রচিত হয়, ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল তার মধ্যে অন্যতম। বাহাত্তরের সংবিধান উত্থাপনের সময় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তার মূল কথা ছিল- ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্মহীনতা নয়। দেশের সব মানুষই ধর্ম পালন করবে। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

> Secularism does not mean absence of religion. The 75 million people of Bengal will have the right to religion. We do not want to ban religion by law. We have no intention of that kind. Secularism does not mean absence of religion. Muslims will observe their religion and nobody in this state has the power to prevent that. Hindus will observe their religion and nobody has the power to prevent that. Buddists and Christains will observe their respective religion and nobody can prevent that. Our only objection is that nobody will be allowed to use religion as a political weapon.[২৩]

এছাড়াও ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি ঘোষণা করেছিলেন- “বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র ‘বাংলাদেশ’ রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।”[২৪] মূলত বাহাত্তরের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে কেউ যেন ধর্মকে ব্যবহার করতে না

পারে। পাশাপাশি রাষ্ট্রে সকল ধর্মের সমান সুযোগ বহাল থাকে। উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো মহান মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। আর পাশাপাশি হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ প্রভৃতি মানবতা বিরোধী কাজে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এজন্য বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৩ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলের তালিকা দেখলেই প্রমাণিত হয় যে, ঐ নির্বাচনে কোন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেনি। উল্লেখ্য যে, এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ১১জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে।

১৯৭৩ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফল
(দলীয় অবস্থান)

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট (শতকরা হার)
আওয়ামী লীগ	২৮৯	২৮২	৭৩.২০
ন্যাপ (মোজাফফর)	২২৪	-	৮.৩৩
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	০৪	-	০.২৫
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	২৩৭	০১	৬.৫২
ন্যাপ (ভাসানী)	১৬৯	-	৫.৩২
কৃষক-শ্রমিক সমাজবাদী দল	০৩	-	০.২০
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী)	০২	-	০.১০
বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি	০৩	-	০.০৬
বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশন	০৩	-	০.০৯
বাংলা ছাত্র ইউনিয়ন	০১	-	০.০৪
জাতীয় লীগ	০৮	০১	০.৩৩
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ	১১	-	০.২৮
জাতীয় গণতন্ত্রী লীগ	০১	-	০.০১
জাতীয় কংগ্রেস	০৩	-	০.০২
নির্দলীয় প্রার্থী	১২০	০৫	৫.২৫
মোট	১০৭৮	২৮৯	১০০

[সূত্র : Muhammad A Hakim, *Bangladesh Politics : The Shahabuddin Interregnum*, The University Press Limited, Dhaka, 1993, p. 126 (Appendix-III); Al Masud Hasanuzzaman, *Role of Opposition in Bangladesh Politics*, The University Press Limited, Dhaka, 1998, p 48]

তবে আওয়ামী লীগ সরকারের এ পর্যায়ের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে বলা যায় যে, তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিতে তারা সম্পূর্ণভাবে অটুট থাকতে পারেনি।[২৫] ১৯৭২ সালের পর দেখা গেল যে, ব্রিটিশ আমল ও পাকিস্তান আমলে মাদ্রাসা শিক্ষার নামে ধর্মীয় শিক্ষাকে শিক্ষাক্ষেত্রে যেভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, স্বাধীন বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায়ও সে গুরুত্ব বহাল থাকল। উপরন্তু, মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় ব্যয় বরাদ্দ বাড়নো হলো। এভাবে শিক্ষার খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখায় ধর্মের প্রভাব এবং কুসংস্কারকে জিইয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হলো। অথচ ১৯৭২ সালের সংবিধানে আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষ থেকে জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এ চারটি বিষয়কে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও এসময় সরকারি খরচে মিলাদ মাহফিলের আসর, সরকারি ভবনে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, রেডিও টেলিভিশনে ‘খোদাহাফেজ’ ইত্যাদি বলার রেওয়াজ পুণরায় চালু করা হয়। মুসলমান প্রধান দেশ হিসেবে ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ভালো সম্পর্ক স্থাপন করা হয় ইত্যাদি। আর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক গোষ্ঠী শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস বাহিনী, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসর হয়ে আমাদের জনগণের উপর হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ প্রভৃতির মাধ্যমে মানবতা বিরোধী এক অবর্ণনীয় নির্যাতনের রাজত্ব কায়েম করেছিলো- যাদের বিরুদ্ধে অসংখ্য নির্দিষ্ট ক্রিমিনাল কেস বা অপরাধের মামলা ছিল, তাদের সেসব মামলা প্রত্যাহার করা হলো, তাদেরকে আটকাবস্থা থেকে মুক্তি প্রদান করা হলো এবং সর্বোপরি তাদের প্রতি দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগের উদাত্ত আহ্বান জানানো হলো। এ ধরনের নীতি ও বাস্তব কর্মতৎপরতা যে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির সঙ্গে পুরোপুরি অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কিন্তু এগুলো তাদের ঘোষিত নীতি সঙ্গে (১৯৭২ সালের সংবিধানের সঙ্গে) অসঙ্গতিপূর্ণ হলেও ক্ষমতাসীন শ্রেণি এ কাজগুলো করেছিল। এর ফলে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী গোষ্ঠীর হৃত শক্তি পুনরুদ্ধারের একটি সুযোগ শুরুতেই তৈরি হয়েছিল।[২৬]

এছাড়াও তৎকালীন সরকার প্রধান একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রধান হয়েও ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামি সম্মেলন সংস্থার বৈঠকে যোগদান করেন। ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এসময় মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। এছাড়া বায়তুল মোকাররম মসজিদের জায়গা রেজিস্ট্রি করে দেয়া হয় এবং তবলিগ জামায়াতকে বিশ্ব ইজতেমার জন্য জায়গা বরাদ্দ দেয়া হয়। উপরন্তু এসময় সরকারের পক্ষ থেকে দেশে মদ-জুয়া বন্ধের ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। এছাড়া এসময় ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষেধ থাকা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের

অনুসারী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সংগঠন 'আওয়ামী উলামা পরিষদ'কে তাদের কার্যক্রম চালাতে দেওয়া হয়। তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের একজন মন্ত্রী একটি বক্তৃতায় বলেন যে, বাংলাদেশ ইসলামি আদর্শ ও শিক্ষার প্রতি আস্থাশীল এবং তার দল ইসলামি আদর্শ, শান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবে।[২৭] তবে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ও গণমাধ্যমে ধর্মীয় এসব টার্ম ব্যবহার করা হলেও কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য আওয়ামী লীগ সরকার ঐ সময় এ কাজগুলো করেনি। দেশের প্রচলিত ধর্মীয় রীতি ও ঐতিহ্য অনুযায়ী তখন এ কাজগুলো করা হয়েছিল। তবে আওয়ামী লীগের এসকল কাজের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির বিচ্যুতি ঘটে। কারণ, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বিশেষ কোন ধর্মকে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয় না। ধর্ম সেখানে ব্যক্তিগত চর্চার বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়।

বিএনপি (১৯৯১-১৯৯৬)

১৯৯০ সালে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এরশাদ সরকারের পতন হলে নির্দলীয়-নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। ১৯৯১ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে প্রথমবার স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে বিএনপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ক্ষমতায় আসে। ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, বামপন্থী, ডানপন্থী সব দলই ধর্মকে ব্যবহার করেছে। এমনকি ইসলাম ধর্মভিত্তিক দল জাকের পার্টি ধীরেন বাগচী নামে একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিককে সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করেছিল। তবে নির্বাচনী প্রচারণায় ধর্মকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয় বিএনপি। ইসলাম ধর্মের ঈমানের মূল বিষয় কালেমা তাইয়্যেবাকে বিকৃত করে তারা প্রচার করে যে- 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ, ধানের শীষে বিসমিল্লাহ'।[২৮] এ নির্বাচন উপলক্ষে বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া তার নির্বাচনী অঙ্গীকারে সংবিধানে সংযোজিত ইসলামি নীতি বহাল ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার সমুন্নত রাখা এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রদান, জোট নিরপেক্ষতা, সার্কের উন্নয়ন, মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি প্রভৃতি বিষয়ে জোর দেন। উল্লেখ্য যে, জিয়াউর রহমানের ১৯ দফা কর্মসূচির মধ্যে উপরিউক্ত বিষয়গুলোর প্রাধান্য ছিল। এছাড়া তিনি তার অধিকাংশ নির্বাচনী ভাষণে আওয়ামী লীগের শাসনকালকে (১৯৭২-১৯৭৫) কালো অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং সে সময়ের দুর্ভিক্ষ ও একদলীয় শাসনের সমালোচনা করেন।[২৯] এছাড়াও তিনি তার প্রধান প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্মহীনতা বলে ভুল ব্যাখ্যা করে ব্যাপক প্রচারণা চালান। পাশাপাশি তিনি জনগণের মাঝে একথাও প্রচার করেন যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে

‘বিসমিল্লাহ’ এবং ‘ইসলাম’ এদেশ থেকে উঠে যাবে। এ ধরনের প্রচার-প্রচারণার ফলে দেশের সহজ সরল ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের ভোট বিএনপি-এর পক্ষে বেশি পড়ে।[৩০]

এ নির্বাচনে ডানপন্থী আরেকটি দল ফ্রিডম পার্টি (বর্তমানে বিলুপ্ত) তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় রাসুল মুহাম্মদ (স.)-এর নাম ব্যবহার করেছিল। তাদের নির্বাচনী স্লোগান ছিল- ‘ভোট দিলে কুড়ালে, খুশি হবে রাসুলে।’[৩১] ধর্মনিরপেক্ষ দল আওয়ামী লীগও এ নির্বাচনে ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের আকৃষ্ট করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। তারা নিজেদের একটা ধর্মীয় ভাবমূর্তি তুলে ধরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী পোস্টার থেকে আরম্ভ করে তাদের নেতাদের ব্যক্তিগত চাল চলনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়।[৩২]

এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ধর্মীয় শ্লোগান ছিল, ‘লা ইলাহা ইল্লালাহ, নৌকার মালিক তুই আল্লাহ।’ এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের অঙ্গীকার ছিল- বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচার, সংবিধানের চার মূলনীতি বাস্তবায়ন, সকল কালাকানুন বাতিল, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, জোট নিরপেক্ষ বিদেশ নীতি ও দক্ষ সামরিক বাহিনী গঠন। এছাড়া এ নির্বাচনে প্রচারণার সময় আওয়ামী লীগ পার্টি প্রধান শেখ হাসিনা জেনারেল জিয়াউর রহমান ও জেনারেল এইচ.এম. এরশাদের সামরিক শাসন ও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের সমালোচনা করেন এবং তাদের সময়ে প্রবর্তিত রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের পরিবর্তে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকার করেন।[৩৩]

আর ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর নির্বাচনী শ্লোগান ছিল ‘ভোট দিলে পাল্লায়, খুশি হবে আল্লায়।’[৩৪] এ নির্বাচনে তাদের অঙ্গীকার ছিল- পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে দেশে একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। আর জাতীয় পার্টি প্রচার করেছিল যে, তারা নির্বাচিত হলে সংবিধানে ‘বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ’ ও ‘রাষ্ট্রধর্ম’ ইসলাম বহাল রাখবে।[৩৫]

এছাড়া ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করেছে। যেমন, ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তৎকালীন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক ঢাকার পার্শ্ববর্তী একটি নির্বাচনী এলাকায় এমপি প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি তার নির্বাচনী পোস্টারের উপর ‘আল্লাহু আকবর’ লিখেছিলেন। মূলত তিনি সাম্প্রদায়িক লোক না হয়েও এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি সমর্থন না করেও মুসলমান ভোটারদের ভোট পাবার আশায় কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক হওয়া সত্ত্বেও নিজের নির্বাচনী পোস্টারে ‘আল্লাহু আকবর’ লিখেছিলেন।[৩৬]

রাজনৈতিক দলগুলোর ধর্মনির্ভর এ ধরনের প্রচারণা থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, দেশের সাধারণ জনগণের সার্বিক জীবনযাত্রার গুণগত পরিবর্তন সাধনের উপযোগী কোন কর্মপরিকল্পনা না থাকায় তারা প্রত্যেককেই মূলত ধর্মের দোহাই দিয়ে ভোটারদেরকে এ নির্বাচনে আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল।

১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের ফলাফল
(দলীয় অবস্থান)

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৩০০	১৪০	৩০.৮১
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬৪	৮৮	৩০.০৮
বাকশাল	৬৮	০৫	১.৮১
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৪৯	০৫	১.১৯
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)	৩১	০১	০.৭৬
গণতন্ত্রী পার্টি	১৬	০১	০.৪৫
জনতা মুক্তি পার্টি	০৮	০	০.০৯
জাতীয় পার্টি	২৭২	৩৫	১১.৯২
জামায়াত-ই-ইসলামী	২২২	১৮	১২.১৩
ইসলামী ঐক্য জোট	৫৯	০১	০.৭৯
জাকের পার্টি	২৫১	-	১.২২
খেলাফত আন্দোলন	৪৩	-	০.২৭
জাসদ (রব)	১৬১	-	০.৭৯
জাসদ (সিরাজ)	৩১	০১	০.২৫
জাসদ (ইনু)	৬৮	-	০.৫০
ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৫	০১	০.১৯
বাসদ (খালেকুজ্জামান)	১৩	-	০.১০
বাসদ (মাহবুব)	০৬	-	০.০৪
শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল	০৩	-	০.০২
ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ	২৬	-	০.৩২
ঐক্য প্রক্রিয়া	০২	-	০.০৩
ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি	২০	০১	০.৩৬
বাংলাদেশ জনতা দল	৫০	-	০.৩৫
ফ্রিডম পার্টি	৬৫	-	০.২৭
বাংলাদেশ মুসলিম লগী (চারটি উপদল)	৮২	-	০.৩৪
অন্যান্য দল	২১৮	-	০.৫৩
নির্দলীয় প্রার্থী	৪২৪	০৩	৪.৩৯
মোট	২৭৮৭	৩০০	১০০

(সূত্র : Al Masud Hasanuzzaman, *Role of Opposition in Bangladesh Politics*, The University Press Limited, Dhaka, 1998, p 142; আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতি : সংস্কৃতির স্বরূপ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১০৪]

এ নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ধর্মনির্ভর দল বিএনপি ৩০.৮১% ভোট এবং ১৪০টি আসন লাভ করে। ধর্মনিরপেক্ষ দল আওয়ামী লীগ পায় ৩০.০৮% ভোট ও ৮৮টি আসন।

ধর্মনির্ভর অপর একটি দল জাতীয় পার্টি ১১.৯২% ভোট ও ৩৫টি আসন লাভ করে। আর ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ পায় ১২.১৩% ভোট ও ১৮টি আসন। উল্লেখ্য যে, আসন সংখ্যা কম পেলেও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ছিল জাতীয় পার্টির চেয়ে বেশি। অতএব দেখা যায় যে, ধর্মনির্ভর ও ধর্মভিত্তিক দলগুলো এ নির্বাচনে অবস্থানগত দিক থেকে এগিয়ে যায়। তবে ধারণা করা হয় যে, এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয়ের অন্যতম একটি কারণ ছিল দলটির বিরুদ্ধে ভারতপন্থী ও ইসলাম বিরোধী শক্তি হিসেবে পরিচালিত প্রোপাগান্ডা।[৩৭]

১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে দলের চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া দেশের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ধর্মকে রাজনীতিতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেগম খালেদা জিয়া তার পূর্বসুরীদের নীতিকেই অনুসরণ করেন। তিনি তার বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিকে অত্যন্ত সুকৌশলে নিজের ও দলের পক্ষে রাখার চেষ্টা করেন। বিশেষ করে তিনি ক্ষমতায় আসার পর ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা এ বিষয়ে প্রচার-প্রচারনার উপর বেশি জোর দেন।[৩৮] ১৯৯৪ সালের ১ অক্টোবর ঢাকার মানিক মিয়া এভিনিউতে বিএনপি-এর উদ্যোগে এক মহাসমাবেশে বক্তৃতা প্রদানকালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিরোধীদল আওয়ামী লীগের প্রতি ধর্মীয় বিষেধাগার করে বলেন যে- বিরোধী দল ‘বিসমিল্লাহ’ খেয়ে ফেলতে চায়। বক্তৃতা প্রদানকালে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া সরাসরি নাম উল্লেখ না কারে বাংলাদেশের প্রধান ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সমালোচনা করে বলেন, “ইসলামের কথা বলে আরেকটি দল। তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করুন, যারা বলে আমরা ক্ষমতায় গেলে সংবিধান থেকে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম উঠিয়ে দেবো, চার মূলনীতি প্রতিষ্ঠা করবো, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করবো, তাদের সঙ্গে ঐক্য করে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম রক্ষা করতে পারবেন? ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দিতে পারবেন? ------আজ তারা এক হয়ে ইসলাম ও বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পর্যন্ত খেয়ে ফেলতে চায়।”[৩৯]

খালেদা জিয়ার এ পর্যায়ের শাসনকালে প্রথাবিরোধী মুসলিম লেখিকা তসলিমা নাসরিন তার লজ্জা উপন্যাস লেখার জন্য মৌলবাদীদের ক্রমাগত আন্দোলনের মুখে শেষ পর্যন্ত দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। এছাড়া এসময় ‘আহলে হাদীস’ নামের একটি নতুন ইসলামি সংগঠন ইসলাম ধর্মের ভিন্ন মতের অনুসারী আহমদিয়া সম্প্রদায়ের উপর সহিংস আক্রমণ করে। আর এক শ্রেণির উলেমাগণ আহমদিয়াদেরকে নন-মুসলিম (Non-Muslim) ঘোষণার দাবি জানান। এসময় এনজিওদের বিরুদ্ধে

উলেমা শ্রেণি বিভিন্ন ফতোয়া জারি করেন। উল্লেখ্য যে, এসময় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে।[৪০] অর্থাৎ এসময় ইসলাম পন্থীদের বিভিন্ন ধরনের আগ্রাসন পরিলক্ষিত হয় এবং তারা সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা লাভ করেন।

মূলত খালেদা জিয়ার স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি না থাকায় তিনি তার স্বামী জেনারেল জিয়াউর রহমানের রাজনৈতিক নীতি ও আদর্শ যথারীতি অনুসরণ করেছেন। তিনি ক্ষমতায় যাওয়া ও টিকে থাকার জন্য ইসলামের নামকে (ধর্মকে) আরো বেশি মাত্রায় কাজে লাগিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, তিনি জামায়াতে ইসলামীর বাংলাদেশ-এর সমর্থন নিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন। যে কারণে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে তিনি কিছু ছাড় দিয়েছিলেন। তবে খালেদা জিয়া ইসলামপন্থীদের প্রতি যথেষ্ট ছাড় দিলেও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ তাতে সন্তুষ্ট ছিল না। কারণ, দেশকে ইসলামীকরণের ব্যাপারে বা শরীয়া আইন চালু করার ব্যাপারে খালেদা জিয়া সরকার যথেষ্ট কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। সেজন্য খালেদা জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশও একত্রে আন্দোলন শুরু করে। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগও তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ভুলে গিয়ে ক্ষমতায় আসার স্বার্থে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সঙ্গে কৌশলগত ভালো সম্পর্ক রেখে আগামী নির্বাচনী বৈতরণী পার হবে।[৪১]

আওয়ামী লীগ (১৯৯৬-২০০১)

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯৬ সালের ১২ জুন দ্বিতীয়বার জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। এ নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মের বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করে। ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি-এর নির্বাচনী প্রচারণার অন্যতম উপাদান ছিল ধর্ম। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম ভোটারদের ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহার করার জন্য প্রচার করে যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ইসলাম বিপন্ন হবে, সংবিধান থেকে ইসলাম উঠিয়ে দেবে, মসজিদে আজানের পরিবর্তে উলুধ্বনি হবে প্রভৃতি।[৪২] মূলত এ নির্বাচনে বিএনপি তার পুরোনো কৌশল অবলম্বন করে এবং নির্বাচনী বক্তৃতা, শ্লোগান ও পোস্টারে ধর্মীয় উপাদান ব্যবহার করে। দলটির প্রধান বেগম খালেদা জিয়া বারবার মতামত ব্যক্ত করতে থাকেন যে, ‘ইসলাম’ আওয়ামী লীগের হাতে নিরাপদ হবে না। একটি নির্বাচনী বক্তৃতায় তিনি বলেন যে, ‘বিসমিল্লাহ রক্ষা করার জন্য ধানের শিষে ভোট দিন’। এছাড়া দলটি নিজেদের ভারতবিরোধী মনোভাবকেও কৌশল হিসেবে প্রচার করে। বিএনপি তার নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে ঘোষণা দেয় যে, তারা ভারত-বাংলাদেশের ২৫ বছরের মৈত্রী চুক্তি

বাড়াবে না। তারা এ প্রচারণাও চালায় যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে ভারতের কাছে দেশ বেচে দেবে।[৪৩]

তবে সপ্তম জাতীয় সংসদের এ নির্বাচনে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। নির্বাচনী প্রচারণায় তারা অত্যন্ত সুকৌশলে ধর্মকে পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করে। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনের কিছু দিন পূর্বে আওয়ামী লীগ পার্টি প্রধান পবিত্র ওমরাহ পালনে সৌদি আবর যান। আওয়ামী লীগের নির্বচনী পোস্টারে পার্টি প্রধানের উমরাহ পালনের সে ছবিটি ব্যবহার করা হয়।[৪৪] তাদের নির্বাচনী প্রচারে আরো অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন, কিছু সংখ্যক প্রার্থীকে পশ্চিমা পোশাকের পরিবর্তে পাঞ্জাবি-পায়জামা ও টুপি পরতে দেখা যায়। কেউ কেউ আবার প্রচারণার কৌশল হিসেবে হাজী পদবীর উপর গুরুত্ব দেন।[৪৫] এছাড়াও দলের নেতা-কর্মীরা নির্বাচনী প্রচারণায় (প্রচারপত্র, বক্তৃতা, পোস্টার ও ব্যানারে) কৌশলগত কারণে ইসলামি উপাদান ব্যবহার করেন। যেমন, প্রচারপত্র, পোস্টার ও ব্যানারে 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান' জাতীয় ধর্মীয় আনুগত্যের প্রতি আস্থাশীল লেখাগুলো ব্যবহার করা হয়। আর নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বক্তৃতার শুরুতে 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান' ও শেষে 'খোদা হাফেজ', 'ইনশাল্লাহ' শব্দগুলো ব্যবহার করেন। তৃণমূল পর্যায়ের প্রচারণায়ও এসব কৌশল প্রয়োগ করা হয়।[৪৬] নির্বাচনী প্রচারণায় আওয়ামী লীগের এ পথ অনুসরণ করার মূল কারণ হলো তাদের বিরোধী পক্ষ যেন তাদেরকে ধর্ম বিরোধী শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করতে না পারে। দলটির নির্বাচনী প্রচারণার অংশ ছিল এই যে, আওয়ামী লীগ কোন ইসলাম বিরোধী শক্তি নয় বরং ইসলামি মূল্যবোধে বিশ্বাসী। বামপন্থী দলগুলো ধর্মনিরপেক্ষতাকে পাশ কাটিয়ে ধর্মীয় প্রচারণার যে কোন কৌশলকে সমালোচনা করলেও নির্বাচনের ফলাফলে এর প্রভাব ছিল বলে অনেকে মনে করেন।[৪৭] এছাড়া এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তার তথাকথিত ভারতপন্থী ইমেজ (বিরোধী পক্ষ বিএনপি কর্তৃক অধিক প্রচারিত) নিয়ে সচেতন ছিল এবং নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে দলটি ঘোষণা দেয় যে, ভারত-বাংলাদেশের ২৫ বছরের মৈত্রী চুক্তির মেয়াদ তারা বৃদ্ধি করবে না।[৪৮]

এছাড়া ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনা ও বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়া সিলেটের হযরত শাহ জালাল (র.)-এর মাজার জেয়ারত করার মাধ্যমে নিজ নিজ দলের নির্বাচনী প্রচারনা শুরু করেন। যেহেতু বাংলাদেশের জনগণ ধর্মীয়ভাবে হযরত শাহ জালাল (র.)-এর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করে, তাই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ও সমর্থন লাভের আশায় দুই দলের নেত্রীই এ কাজটি করেন। এর আগের সংসদ নির্বাচনে বিএনপি প্রধান খালেদা

জিয়া তার নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করার পূর্বে হযরত শাহ জালাল (র.)-এর মাজার জেয়ারত করেন। আর আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে ঐ একই কাজই করে। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি করলেও নিজেদের দলীয় স্বার্থে ও ক্ষমতার আসার লক্ষ্যে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করেছে।

মূলত রাজনীতিতে ইসলামি মূল্যবোধকে ব্যবহার করেই এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ধর্মীয় অনুভূতিতে নাড়া দিতে সক্ষম হয় এবং ভালো ফলাফল লাভ করে সরকার গঠন করে।[৪৯] এ প্রসঙ্গে সা'দ উল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন যে, "এবার সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রচারে 'জয় বাংলা' ধ্বনি একমাত্র ৭ মার্চের মুজিবের ঐতিহাসিক ক্যাসেট ভাষণ ছাড়া আর কোথাও ধ্বনিত হয়েছে বলে কানে আসেনি।"[৫০] আওয়ামী লীগের ধর্মীয় প্রচারণা সম্পর্কে একজন সাংবাদিক লিখেছেন, "আসলে আওয়ামী লীগ এখন যে নীতি গ্রহণ করেছে তা একান্ত সাময়িক কিনা তা বলা না গেলেও একথা বলাই যায় যে, নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার কৌশল হিসাবে তারা এসব গ্রহণ করেছে।"[৫১]

১৯৯৬ সালের সপ্তম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল
(দলীয় অবস্থান)

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০০	১৪৬	৩৭.৪৪
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	৩০০	১১৬	৩৩.৬১
জাতীয় পার্টি	২৯৩	৩২	১৬.৩৯
জামায়াত-ই-ইসলামী	৩০০	০৩	৮.৬১
ইসলামী ঐক্যজোট	১৬৫	১	১.০৯
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)	৬৭	১	০.২৩
জাকের পার্টি	২৪১	-	০.৩৯
গণ ফোরাম	১০৪	-	০.১২
ফ্রিডম পার্টি	৫৪	-	০.০৯
বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন	৪৬	-	০.০৪
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি	৩৬	-	০.১১
বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি	৩৪	-	০.১৩
বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) (খালেকুজ্জামান)	৩১	-	০.০২
জাসদ (ইনু)	৩০	-	০.১২
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি	২৩	-	০.০১
বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট	২৩	-	০.০৫
বাংলাদেশ মুসলিম লীগ (জমির)	২১	-	০.০১
অন্যান্য দল	২২১	-	০.৪৮
নির্দলীয় প্রার্থী	২৮৫	০১	১.০৬
মোট	২৫৭৪	৩০০	১০০

(সূত্র : Al Masud Hasanuzzaman, *Role of Opposition in Bangladesh Politics*, The University Press Limited, Dhaka, 1998, p 208; আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতি : সংস্কৃতির স্বরূপ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১১১]

এ নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ধর্মনিরপেক্ষ আওয়ামী লীগ ৩৭.৪৪% ভোট পায় এবং ১৪৬টি আসন লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ধর্মনির্ভর বিএনপি ৩৩.৬১% ভোট পায় ও ১১৬টি আসন লাভ করে। ধর্মনির্ভর আরেকটি দল জাতীয় পার্টি ১৬.৩৯% ভোট পায় ও ৩২টি আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। অপরদিকে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ পায় ৮.৬১% ভোট ও ৩টি আসন। আর রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার বিরোধী দল জাসদ (রব) পায় ০.২৩% ভোট ও ১টি আসন। উল্লেখ্য যে, এ নির্বাচনে নির্দলীয় প্রার্থীরা ১টি আসন লাভ করে।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন না করলেও ধর্মীয় ব্যাপারে বেশ সাবধনতা অবলম্বন করে। কেউ যেন ধর্মের অপব্যবহার করতে না পারে সে ব্যাপারে দলটি বেশ সতর্ক ছিল। ১৯৯৮ সালের ২২ জানুয়ারি ঢাকায় ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধর্মব্যবসায়ীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সকলকে সতর্ক থাকার আহবান জানান। এ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, “আজ দেশে বিভিন্নভাবে ইসলামের অপব্যাখ্যা চলছে। ধর্ম সম্পর্কে আমাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ধর্ম ব্যবসায়ী স্বার্থ সন্ধানীরা ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে। তারা যাতে আমাদের ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য অবশ্যই আমাদের সঠিকভাবে ধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।”[৫২] আওয়ামী লীগের এ পর্যায়ের শাসনকালে ধর্মনিরপেক্ষ অনুষ্ঠানগুলোতেও ধর্মনির্ভর দলগুলোর মতো ইসলামি কায়দা অবলম্বন করা শুরু হয়। কোন মিটিং বা সভা শুরু করার আগে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করার রীতি শুরু হয় এবং আওয়ামী লীগের নেতারা ধর্মীয় পোষাকে সভা-সমিতিতে উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা দেওয়ার আগে ‘বিসমিল্লাহ’, ‘আল্লাহ্ সর্বশক্তিমান’ বলতে শুরু করেন। এসব সভার আলোচ্য বিষয় যাই হোকনা কেন? ১৯৯৬ সালের জাতীয় নির্বাচনের পর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের সময় আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীরা যে নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছিলেন তাতে ‘জয়বাংলা’ ধ্বনি ছিল না, ছিল ‘বিসমিল্লাহ’ আর ‘খোদা হাফেজ’।[৫৩]

১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ সরকারের ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর বলেন, “ক্ষমতায় থাকাকালীন আওয়ামী লীগ ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার যেভাবে করেছে এবং ধর্মের অপরাধমূলক ব্যবহারকারীদের যেভাবে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিয়েছে তার ফলে তাদের সঙ্গে রাজনীতিতে ধর্ম ব্যবহারকারী বিএনপি, জাতীয় পার্টি ইত্যাদির কোন কার্যকর পার্থক্য নেই। পার্থক্য

যেটুকু সেটা হলো তা বোল-চাল, বাগাড়ম্বর ইত্যাদি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। ১৯৭২ সালে গৃহীত বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার যে বিধান ছিল, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি কর্তৃক তা নানাভাবে নাকচ হতে থাকার সময় আওয়ামী লীগ ও লেজুরবৃত্তিকারী বুদ্ধিজীবীরাও অন্যদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে অনেক চিৎকার করেছেন। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সেগুলো সম্পর্কে তারা একেবারেই নিশ্চুপ থেকেছেন। আওয়ামী লীগের বুদ্ধিজীবীরা ও তাদের সমর্থক বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠন এ ব্যাপারে নিশ্চুপ ছিলেন।”[৫৪]

তাছাড়া আওয়ামী লীগ সরকার তাদের পাঁচ বছরের শাসনকালে ইসলামি শিক্ষা বিস্তার ও কিছু প্রান্তিক সুবিধা দানের মাধ্যমে ইসলামপন্থীদের খুশী রাখতে চেয়েছিল। যেমন, আওয়ামী লীগ এসময় মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়নের ব্যবস্থা করেছিল, চালু করা হয়েছিল মসজিদ ভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম। মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের জন্য ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা এবং প্রায় চার হাজার মাদ্রাসাকে এমপিওভুক্তকরণসহ ইমাম-মোয়াজ্জিনদের কল্যাণ ট্রাষ্টে তিন কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তাদের যে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। এসময় ইসলাম ধর্মপন্থী দলগুলো আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ধর্ম বিরোধী নানা ধরনের প্রচারণায় লিপ্ত ছিল। এজন্য আওয়ামী লীগকেও একটি নুণ্যতম ধর্মীয় ভাবধারা বজায় রাখতে হয়। যেন জনগণ তাদেরকে ভুল না বুঝে।

তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করলে, তাদের সমর্থকদের উপর বিশেষত হিন্দু ধর্মাবলম্বী সমর্থকদের উপর বিএনপি ও চার দলীয় জোটের নেতা-কর্মীরা ব্যাপক অত্যাচার-নির্যাতন চালাতে শুরু করে। আর কোন কোন ক্ষেত্রে এ নির্যাতনের মাত্রা ছিল অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এ সম্পর্কিত কয়েকটি তথ্য নিচে দেওয়া হলো :

১৩-০৬-১৯৯৬ তারিখের ‘দৈনিক জনকণ্ঠে’ প্রকাশ পায় “নৌকায় ভোট দেয়ায় হিন্দুদের বাড়িঘরে হামলা।”[৫৫]

১৬-০৬-১৯৯৬ তারিখের ‘দৈনিক জনকণ্ঠে’ প্রকাশ পায় ‘যোগীনগর, ঠাঁটারী বাজার বিরাট এলাকা জুড়ে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায়ের লোক নৌকায় ভোট দিয়েছে (এই অভিযোগে) তাদের উপর আক্রমণ চালানো হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।’[৫৬]

১৬-০৬-১৯৯৬ তারিখের ‘দৈনিক সংবাদে’ ছাপা হয়, “একটি রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সূত্রাপুর এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ৪/৫টি বাড়িতে অতর্কিত হামলা চালায় এবং আসবাবপত্র ভাংচুর করে।”[৫৭]

১৯-০৬-১৯৯৬ তারিখের 'দৈনিক ভোরের কাগজ' পত্রিকায় আবেদ খান উল্লেখ করেন, "প্রত্যেকটি নির্বাচনের পর পরাজিত প্রার্থী কিংবা তার দলের যত রাগ দিয়ে পড়ে সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর উপর। রামও ওদের মারে, বারণও ওদের মারে। তাহলে বাংলাদেশ জিতেছে কোন রাজনীতি?"[৫৮]

২৩-০৬-১৯৯৬ তারিখের 'দৈনিক সংবাদে' ছাপা হয়- "ধানের শীষে ভোট না দেয়ায় যে সকল এলাকার হিন্দুরা বর্তমানে সন্ত্রস্ত অবস্থায় আছে, তার মধ্যে কাছিপাড়া ইউনিয়নের বাহেরচর গ্রাম, কনকদিয়ার পালপাড়া, কেশবপুরের মোমিনপুর, চাঁদকাঠী, দাসপাড়া ইউনিয়ন, ধুলিয়া ইউনিয়ন অন্যতম।"[৫৯]

এছাড়া ১৫-০৭-১৯৯৬ তারিখের 'দৈনিক সংবাদে' সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খবর ছাপা হয়। যেমন- "অজুহাত, ঐ এলাকার লোক ধানের শীষে ভোট দেয়নিঃ সিরাজগঞ্জে দু'টি গ্রামে হামলা, লুটপাট, পুলিশের রাইফেল লুট।" "নারায়ণগঞ্জে সংখ্যালঘুদের উপর হামলা হচ্ছে।" "সাভারে সংখ্যালঘুদের বাড়ি-বাড়ি হামলা হচ্ছে।"[৬০]

সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর কথা লিখেছেন ইমতিয়ার শামীম তার "সংখ্যালঘু নির্যাতন ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি" শীর্ষক প্রবন্ধে। তিনি শুরু করেছেন এই বলে "বাড়ি যেয়ে বলিস, এটা নৌকায় ভোট দেয়ার ফল"- কেশবপুর, যশোরে ফুটনকে (১৪) ধর্ষণের পর জাতীয় পার্টির সন্ত্রাসীদের উক্তি। সাভারে আক্রমণ করার সময় সন্ত্রাসীদের স্লোগান দিল "হিন্দুরা রুস্তমন্তর ছাড়।" কচুয়া, চাঁদপুর এলাকার নির্যাতিত ভোটররা বলেছেন "মহিলাদের ওরা কুকুরের মত মেরেছে। মহিলারা দৌড়ে পালাচ্ছিল। ওরা দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ি মেরেছে। কুকুরের মত। এদের একজন বলেছেন, কারা সন্ত্রাস করছে তাদের আমি চিনি। তবে আমি নাম বলব না। ওরা অনেকেই আমার ক্লাসফ্রেন্ড। এখন লেখাপড়া ছেড়ে সন্ত্রাসী পার্টি করে। তাদের নাম বললে পরে অসুবিধা হবে। ওরা বিএনপির লোক।"[৬১]

এছাড়া ভোটের আগেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে বিভিন্নভাবে ভয়-ভীতি দেখানো হয়। এ বিষয়ে 'দৈনিক জনকণ্ঠ' পত্রিকায় ২৪-০৬-১৯৯৬ তারিখে একটি খবর প্রকাশিত হয়। তাতে উল্লেখ করা হয় হিন্দুদের উদ্দেশ্যে যশোরের ঋষিপাড়ায় সন্ত্রাসীদের হুমকি ছিল "নৌকায় ভোট দিলে হত্যা করা হবে। গ্রাম ছাড়া করা হবে। ভোটের মাঠে গেলে ভারতে চলে যেতে হবে।"[৬২]

অর্থাৎ দেখা যায় যে, ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে ও পরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নানারকম অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হয় এবং বিভিন্নভাবে তাদেরকে ভয়-ভীতি

দেখানো হয়। এছাড়া বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ পার্টির নেতা-কর্মীদের যে এলাকায় প্রাধান্য ছিল, সেসব এলাকায় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আওয়ামী লীগ সমর্থকদের উপর ব্যাপক অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হয়।

বিএনপি ও চার দলীয় জোট (২০০১-২০০৬)

২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে বিএনপি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ইসলামী ঐক্যজোট এবং ধর্মনির্ভর দল জাতীয় পার্টির একাংশকে নিয়ে নির্বাচনী জোট গঠন করে। বিএনপি দলটি এসময় বুঝতে পেরেছিল যে, বিগত নির্বাচনগুলোতে ধর্মভিত্তিক দলগুলো আসন কম পেলেও সারা দেশে তাদের প্রচুর ভোট রয়েছে। কাজেই ভোটের রাজনীতিতে জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করলে তাদের বিজয় নিশ্চিত। মূলত অন্য তিনটি ধর্মপন্থী দলের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়েই এ নির্বাচনে বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সরকার গঠন করে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ধর্মীয় রজনৈতিক দলগুলো বিএনপি-এর সঙ্গে জোট বাঁধায় জনগণের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ব্যাপকহারে বেড়ে যায়। তারা প্রচার করে যে, এদেশে ধর্মের রক্ষক ও প্রচারক তারাই। আর আওয়ামী লীগ ধর্মহীনতায় বিশ্বাসী। ২০০১ সালে বিএনপি ও চার দলীয় জোটের এ ধরনের ধর্মীয় প্রচারণা নির্বাচনে তাদের বিজয়কে সহজ করে। নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে বিএনপি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিল যে, তারা ক্ষমতায় গেলে ইসলাম বিরোধী কোন আইন করবে না। মেনিফেস্টোতে তারা আরো উল্লেখ করে যে, তারা আগের মত রাষ্ট্রের মৌলনীতি হিসেবে মহান আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও আস্থাকে প্রাধান্য দিবে, অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করবে এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সুবিধা বিনামূল্যে সরবরাহ করবে।[৬৩]

আর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ দলটি এ নির্বাচনের আগে দেশে ইসলামি বিপ্লব ও ইসলামি রাষ্ট্র গঠনের ঘোষণা দিয়েছিল। অন্যদিকে জাতীয় পার্টি এ নির্বাচনকে সামনে রেখে ঘোষণা দিয়েছিল তারা যতটা সম্ভব কোরআন-সুন্নাহর পথে চলবে। তারা আরও বলেছিল যে, সর্বক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষা আবশ্যক করা হবে।[৬৪]

আওয়ামী লীগ এ নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে উল্লেখ করেছিল যে, তারা নির্বাচিত হলে রাষ্ট্রের সব নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুন্ন থাকবে এবং পবিত্র কোরআন-হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক কোন আইন পাস করা হবে না। এছাড়া দলটি মাদ্রাসা শিক্ষকদের ১০০ শতাংশ সরকারি বেতনের প্রতিশ্রুতি দেয়। এ নির্বাচনের আগেও দলীয় প্রধান ওমরাহ হজ পালন করেন এবং সিলেটের হযরত

শাহ জালাল (র.) ও হযরত শাহ পরানের (র.) মাজার জেয়ারতের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। উল্লেখ্য যে, বিএনপি নেত্রীও এ নির্বাচনের আগে ওমরাহ হজ পালন করেন এবং সিলেটের ঐ দু'টি মাজার জেয়ারতের মাধ্যমে তার দলের প্রচারণা শুরু করেন। নির্বাচনী রাজনীতিতে দল দু'টি একে অপরের বিরুদ্ধে ধর্মীয় প্রচারনা চালিয়ে ভোটের পাল্লা নিজেদের পক্ষে ভারি করার চেষ্টা করে। বিএনপি ও চার দলীয় জোটের সদস্যরা আওয়ামী লীগকে যথারীতি ধর্ম বিরোধী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে ইসলাম রক্ষা করার জন্য আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান। তাদের জাতীয় ও তৃণমূল পর্যায়ে এ প্রচারণাটির আধিক্য ছিল। এছাড়া নেতিবাচকভাবে ফটোশপকৃত বিকৃত ছবি, আপত্তিকর ক্যাপশনসহ ছবি ও পোস্টারের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, যা স্বত্ব গোপন করে এ নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রচার করা হয়।[৬৫] তবে এ নির্বাচনে সদ্য বিদায়ী আওয়ামী লীগ সরকারের নানা সমন্বয়হীনতাও বিএনপি ও চার দলীয় জোটের জয়ের অন্যতম কারণ ছিল।

২০০১ সালের অষ্টম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল
(দলীয় অবস্থান)

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২৫২	১৯৩	৪০.৯৭
জামায়াত-ই-ইসলামী	৩১	১৭	৪.১৮
জাতীয় পার্টি (না-ফি)	১১	০৪	১.১২
ইসলামী ঐক্য জোট	০৬	০২	০.৬৮
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩০০	৬২	৪০.১৩
ইসলামী জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট (জাতীয় পার্টি)	২৮১	১৪	৭.২৫
কৃষ শ্রমিক জনতা লীগ	৩৯	০১	০.৪৭
জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)	১৪০	০১	০.৪৪
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	৭৬	-	০.২১
বাম-গণতান্ত্রিক জোট (১১ দল)	১৭৫	-	০.২৫
অন্যান্য দল	১৪২	-	০.১৪
স্বতন্ত্র	৪৮৬	০৬	৪.০৬
মোট	১৯৩৯	৩০০	১০০

(সূত্র : আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৪৯; আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতি : সংস্কৃতির স্বরূপ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১১৫]

এ নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিএনপি ও চার দলীয় জোট পেয়েছে ১৯৩টি আসন ও ৪৭.৫ ভাগ ভোট। এর মধ্যে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ পেয়েছে ৪.১৮ ভাগ ভোট ও ১৭টি আসন। আর আওয়ামী লীগ পেয়েছে ৪০.১৩ ভাগ ভোট ও ৬২টি আসন। জাতীয় পার্টির

নেতৃত্বাধীন ইসলামী জাতীয় ঐক্যফ্রন্ট পেয়েছে ৭.২৫ ভাগ ভোট ও ১৪টি আসন। আওয়ামী লীগ ব্যতীত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের হার ছিল মাত্র ১.১২ ভাগ, আর আসন মাত্র ২টি (কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ- ১, জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)-১।

কিন্তু বিএনপি ও চার দলীয় জোট ক্ষমতায় আসার পর রাতারাতি দেশের সামাজিক ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার নিদারুন অবনতি ঘটে। সারাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উপর বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর মারাত্মক হামলার ঘটনা ঘটে।[৬৬] নির্বাচনের পর ৬ থেকে ২৩ অক্টোবর (২০১১) পর্যন্ত রাঙুনিয়া, রাউজান, ফেনী, ভোলা, বাগেরহাট, সাভার, পাবনা, মানিকগঞ্জ, পিরোজপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চাঁদপুর, যশোর, মাগুরা প্রভৃতি এলাকায় সংখ্যালঘু ও আওয়ামী লীগ সমর্থকদের উপর জোট সরকারের শরিক দলগুলোর সমর্থনকারীরা স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বর্বর ও পৈশাচিক নির্যাতন চালায়। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের রাজনীতিতে হিন্দু সম্প্রদায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তারা আওয়ামী লীগের ভোটব্যাংক হিসেবে পরিচিত এবং তাদের অধিকাংশই আওয়ামী লীগের সমর্থক। নির্বাচনের পূর্ববর্তী ও নির্বাচন পরবর্তী সময়ে তাদেরকে কেন্দ্র করে নির্বাচনী সহিংসতা ঘটতে দেখা যায়। ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরেও এ ধরনের সহিংসতা ঘটেছিল। যা ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দেশের প্রথম সারির ১০টি জাতীয় দৈনিকে ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর ২০০১ পর্যন্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর সহিংসতার ৩৩০টি সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, মোট ৬১৩টি সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। হুমকি, ভয়-ভীতি প্রদর্শন থেকে শুরু করে শারীরিক নির্যাতন, লুটপাট, ভাঙচুর, চাঁদাবাজি, বোমাবাজি ও হামলার শিকার হয়েছেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত অসংখ্য নিরীহ সাধারণ মানুষ। এসব সহিংস ঘটনায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ১৭ জন খুন, ৬১ জন ধর্ষিত, ৬৬৬ জন আহত, ১৬ জন অপহৃত এবং ৬৪ জন যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। হিন্দুদের বাড়ি-ঘর, দোকান ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাংচুর করার পাশাপাশি অক্টোবরের শেষার্ধে হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব দুর্গাপূজার সময়ে প্রতিমা, পূজামণ্ডপ, মন্দির, আশ্রম প্রভৃতি ভাংচুর ও অগ্নি সংযোগের ঘটনা ছিল সর্বাধিক।[৬৭]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, একটি দেশে বহু ধর্মের মানুষ বসবাস করে। কোন ধর্মের মানুষ সংখ্যাগুরু আবার কেউ সংখ্যালঘু। ধর্মের গুরুত্ব বা লঘুত্ব মাপকাঠি দিয়ে কারও নাগরিকত্বের বিচার হয় না। দেশের সংবিধান সকল ধর্মের মানুষের তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নির্বিঘ্নে পালন করার সমান অধিকার দেয়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান স্বাধীনভাবে ও নির্বিঘ্নে পালন করার অধিকার শুধু দেশের

সংবিধানেই বিধৃত থাকে না, এটা তাদের সামাজিক অধিকার এবং এ অধিকারে অন্য কোন ধর্মের লোক বাঁধা দিলে, তা যেমন বেআইনি তেমনি নৈতিকতা বিরুদ্ধ।[৬৮] অথচ বাংলাদেশে এ সময়কালে এ বেআইনি ও নৈতিকতা বিরোধী কাজগুলোর বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বা সরকার কার্যকর কোন ভূমিকা পালন করেনি।

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে এসব ধর্মীয় রাজনৈতিক সহিংসতা ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর স্থানীয় নেতা-কর্মীরা জড়িত ছিল। এ নির্যাতনের মাত্রা ছিল অসহনীয় ও কল্পনাতীত। ২০০১ সালের ২৩শে অক্টোবর 'দৈনিক সংবাদে' প্রকাশিত নির্যাতিত এক মহিলার আকুল আবেদন ছিল নিম্নরূপ-

> "পত্রিকায় কিছু লেখার দরকার নেই, কাউকে বলতে চাইনা, আমাদের জীবনে কী ঘটে গেছে। কোন বিচার চাইনা, ক্ষতিপূরণ চাইনা। শুধু প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে বলবেন, আমাদের কোন উপায় নেই, কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আমরা এদেশেই থাকতে চাই। শুধু তিনি যেন আমাদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করেন, আমরা একটু শান্তি চাই। তাকে বলবেন, মা-মেয়ে যেন নিরাপদে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারি। আমাদের স্বামী, ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দুবেলা খেয়ে-পরে বেঁচে থাকতে চাই। আমরা রাজনীতি করি না, ভোট দিতে যাই না। ভবিষ্যতেও কোন দিন ভোট দেব না। আপনাদের মাধ্যমে তাকে কথা দিলাম। তিনি যেন আমাদের দিকে একটু করুনা করেন। আমরা এদেশের মানুষ। আর কতকাল নিজ দেশে পরবাসী থাকবো। এত অত্যাচার, নির্যাতন আর সহ্য হয় না। এমন যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে না। না পারি কাউকে বলতে, না পারি দেখাতে। শুধু ঈশ্বর জানেন, আমরা কেমন আছি। স্বামী-সন্তান, ছেলে-মেয়ে কে কোথায় আছে জানি না। তারা আর কোনদিন ফিরে আসতে পারবে কিনা জানি না। আর কতকাল এভাবে থাকতে হবে।"[৬৯]

সে সময়ের নির্যাতন ও সহিংসতা সম্পর্কে আতিউর রহমান বলেন,

> "নির্বাচনের পর ৬ থেকে ২৩ অক্টোবর ২০০১ পর্যন্ত দৈনিক প্রথম আলো, সংবাদ, ভোরের কাগজ ও আজকের কাগজের মোট ৬৭টি প্রতিবেদন, বিশেষ প্রতিবেদন, ফলোআপ, চিঠিপত্র, মন্তব্য প্রতিবেদন ও উপ-সম্পাদকীয়ের উপর আলো ফেলে আমরা যে চিত্র পেয়েছি তা সত্যি দুঃখজনক। দক্ষিণাঞ্চলের খবর বেশি থাকলেও অন্যান্য অঞ্চল থেকেও দুঃসংবাদ কম হলেও আসছে। 'তেমন কিছু হয়নি' এ আত্মতুষ্টি যেন পেয়ে না বসে ক্ষমতাসীনদের। বরং কী করে সামাজিক শান্তি বিনষ্টকারী এ ভয়াবহ অপতৎপরতা দ্রুত বন্ধ করা যায়, সেদিকে সচেষ্ট হওয়া উচিত। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকলে সমাজের ভেতরের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে। সমাজ তখন প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। সমাজের অন্তর থেকে ভরসার উৎস হারিয়ে যাবে। মানুষ তখন আর মানুষকে বিশ্বাস করবে না। নিরাপত্তাহীনতা পুরো সমাজকে কুঁড়ে কুঁড়ে খাবে।"[৭০]

তবে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসব সংবাদকে অতিরঞ্জিত বলেছেন। এছাড়া বিএনপি ও চার দলীয় জোট সরকারের সময় ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নানা কারণে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। এ সময়কালে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ধর্মীয় চরমপন্থী জঙ্গিবাদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। বিশেষত ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট জেএমবি কর্তৃক ৬৩টি জেলায় (একমাত্র মুন্সীগঞ্জ জেলা ব্যতীত) একযোগে বোমা হামলায় দেশের মানুষ আতংকিত হয়ে পড়ে। যদিও এ ঘটনায় শাসকগোষ্ঠী নির্বিকার দর্শকের ভূমিকা পালন করে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল ধর্মীয় চরমপন্থী দল জামা'য়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)। তবে সাধারণ জনগণের বুঝতে অসুবিধা হয়না যে, ধর্মীয় জঙ্গিবাদের এ ধরনের উত্থানের পিছনে সরকারের হাত রয়েছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত ধর্মীয় রাজনীতির বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাবের কারণে বিশেষত সংখ্যালঘু নির্যাতন, ধর্মীয়ভাবে ভিন্ন মতাবলম্বীর উপর নির্যাতন, জঙ্গিবাদের উদ্ভব প্রভৃতি কারণে জনগণ তৎকালীন বিএনপি ও চার দলীয় জোট সরকারের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। দেশের জনগণ তখন চরম নিরাপত্তা হীনতায় ভুগছিল। ২০০৬ সালে বিএনপি ও চার দলীয় জোট সরকারের ক্ষমতার মেয়াদ শেষ হলে তারা নিজ দলীয় প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. ইয়াজ উদ্দিন আহমদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান করে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ায়। অবশ্য এ বিষয়টি নিয়ে বিরোধী দলগুলোর প্রবল আপত্তির মুখে শেষ পর্যন্ত ড. ইয়াজ উদ্দিন আহমদ সে পদ থেকে সরে দাঁড়ান। ২০০৬ সালের ১ নভেম্বর বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হয়। এ বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে বিভিন্ন মহল থেকে প্রায় প্রতিদিনই বক্তৃতা, বিবৃতি, প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ অব্যাহত থাকে। তাদের দাবির পিছনে তারা যুক্তি উপস্থাপন করলেও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে এসব দাবিকে অযৌক্তিক ব্যাখ্যা করে উল্টো অভিযোগ করা হয় যে, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধের দাবিদাররা বিদেশি এজেণ্ডা বাস্তবায়িত করতে চায়। তাদের দাবি স্বাধীনতা বিরোধী ধুয়া তুলে এক শ্রেণির ইসলাম বিরোধী শক্তি দেশের ইসলামি রাজনৈতিক দলগুলোকে কোনঠাসা করে নিজেরা রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করতে চায়।[৭১] ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের চেয়ারম্যান মাওলানা মহিউদ্দিন এ প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বলেন, '----- আমরা তখনই বলেছি, এগুলো নিয়ে ময়দান গরম না করে একটা রেফারেণ্ডাম দাও। দেখ, এ দেশের মানুষ ধর্ম ছাড়তে রাজি আছে কিনা? দিয়ে দেখো না, তোমরা কয়টা ভোট পাও। একটা জিনিস দেখতে হবে যারা এ দাবিগুলো উত্থাপন করছে, অতীতে ভোটের রাজনীতিতে তাদের কোন উল্লেখযোগ্য অবস্থান

ছিল না। সবই জামানত বাজেয়াপ্ত হওয়া পার্টি।'[৭২] কিন্তু এদের আস্ফালন ও ধর্মের দোহাই দিয়ে চলার নীতি মূলত ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের একটি বিশেষ রূপ। তারা মনে করে যে, তাদের এরূপ বক্তব্যের ধরন দেখে সাধারণ মানুষ তাদেরকে সহজেই ইসলাম ধর্মের রক্ষক মনে করবে। এ ধরনের চিন্তা থেকেই মূলত তারা এ কাজগুলো করে থাকে।

আওয়ামী লীগ ও মহাজোট (২০০৮ সালের নির্বাচন)

চার দলীয় জোট সরকারের সময় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নানা রকম অস্থিতিশীলতা, সংখ্যালঘু নির্যাতন, ধর্মীয় নামযুক্ত ইসলামি জঙ্গি সংগঠনসমূহের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড প্রভৃতির ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি মানুষ সন্দিহান হয়ে উঠে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, সাধারণ মানুষ দেশের আইন-শৃঙ্খলার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। জোট সরকার প্রাথমিক পর্যায়ে এ বিষয়গুলো নানাভাবে এড়িয়ে গেলেও ঘটনার ভবিষ্যৎ ভয়াবহতার কথা ভেবে এবং দেশীয় ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শক্তির চাপে ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য হয়। শীর্ষ জঙ্গি সংগঠন জেএমবি-এর প্রধান নেতাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতার অভিযান পরিচালনা শুরু করে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। জঙ্গি সংগঠনের শীর্ষ নেতারা এক পর্যায়ে গ্রেফতার হয়। ইতোমধ্যে বিএনপি ও চার দলীয় জোট সরকারের মেয়াদ শেষ হলে ২০০৬ সালের ১ নভেম্বর সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় জঙ্গি নেতাদের বিচারকার্য সম্পন্ন হয়, তাদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। সেনা সমর্থিত বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রায় দু'বছর ক্ষমতায় টিকে থাকে এবং দেশে একটি নির্বাচনী পরিবেশ তৈরীর প্রস্তুতি নিতে থাকে।[৭৩] এর আগেই দেশের প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার আশায় জোটবদ্ধভাবে নির্বাচনের পরিকল্পনা ও সে অনুযায়ী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সাধারণভাবেই বিএনপি তার চার দলীয় জোটে দেশের প্রধান দু'টি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের স্থানসহ জোট গঠন পুনঃবহাল রাখে। আর আওয়ামী লীগ তার মহাজোটের (১৪ দল) অংশীদারিত্বে নেয় জাতীয় পার্টি ও বামপন্থী ১১ দলকে।

২০০৮ সালের নির্বাচনে দু'টি জোটই ধর্মীয় ব্যাপারে জনগণের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়ার কথা ঘোষণা করে। দু'টি দলের প্রধানই সিলেটের হযরত শাহ জালাল (র.)-এর মাজার জেয়ারতের মধ্য দিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন। মূলত ভোটারদের আকর্ষণ বারাবার চেষ্টায় দল দু'টি ধর্মীয় উপাদানের উপর বেশি গুরুত্বারোপ করে। একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষক 'দি টেলিগ্রাফ'-এ মন্তব্য করেন যে,

রাজনৈতিক প্রচার কৌশল হিসেবে ধর্মের ব্যবহার রাজনৈতিক দলগুলো উত্তরোত্তরভাবে গ্রহণ করছে।[৭৪] আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা ক্ষমতায় গেলে ইসলাম বিরোধী কোন আইন পাস করা হবে না। বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা জিয়াও তার প্রচারনার বলেন যে, তারা ক্ষমতায় গেলে ইসলাম বিরোধী আইন পাস করবেন না। উপরন্ত তিনি তার জোটকে ইসলামি মূল্যবোধের কারণে ভোট দেয়ার আহ্বান জানান। এছাড়া এসময় দল দু'টির বিভিন্ন প্রার্থীকে প্রচারণার অংশ হিসেবে মসজিদে যেতে দেখা যায়।[৭৫] এছাড়া ২০০৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর আওয়ামী লীগের মুখপাত্র আবদুল জলিল আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে ধর্মীয় দলগুলোর সমর্থন পাবার আশায় 'খেলাফতে মজলিস' দলের সঙ্গে চুক্তি করে। এতে পাঁচটি চুক্তি ছিল। চুক্তিগুলো ছিল নিম্নরূপ : ফতোয়া দেয়ার অধিকার দেয়া হবে, আহমদিয়াদের অমুসলিম ঘোষণা করা হবে, কওমী মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতি দেয়া হবে, কোরআন বিরোধী কোন আইন করা হবে না, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর কোন অবমাননা করা যাবে না।[৭৬] অধিকন্তু আওয়ামী লীগ পার্টি প্রধান বলেন যে, তারা ক্ষমতায় গেলে কোরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন বক্তব্য আওয়ামী লীগ মেনে নেবে না।[৭৭] কিন্তু এ দু'বছর (২০০৬-২০০৮) দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বহু ঘটনা ঘটে যায়। প্রধান দু'দলের নেত্রীর গ্রেফতার হওয়া, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বড় বড় নেতাদের রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক মেরুকরণসহ নানা ঘটনা। যা হোক শেষ পর্যন্ত ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর বহুকাঙ্ক্ষিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৬২টি আসন লাভ করে। অন্যদিকে বিএনপি ও চার দলীয় জোট পায় মাত্র ৩২টি আসন।

২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচনের ফলাফল
(দলীয় অবস্থান)

দলের নাম	প্রার্থী সংখ্যা	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬০	২৩০	৪৮.২৯
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)	০৭	০৩	০.৭২
বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি	০৫	০২	০.৩৭
জাতীয় পার্টি (এরশাদ)	৪৭	২৭	৬.৪৭
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২৫৭	৩০	৩২.৯৫
বাংলাদেশ জামায়াত-ই-ইসলামী	৩৯	০২	৪.৪৮
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি	০২	০১	০.২৫
জমিয়াত-ই ওলামা-ই-ইসলাম	০৭	-	০.২৫
ইসলামী ঐক্য জোট	০৪	-	০.১৫
জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি	০২	-	০.১৫
বিকল্প ধারা বাংলাদেশ	৬২	-	০.২১
গণফোরাম	৪৫	-	০.১০
বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি	৩৯	-	০.০২
প্রগতিশীল ডেমোক্রেটিক পার্টি	২১	-	০.০২
অন্যান্য ইসলামী দল	৩০১	-	১.৩৭
অন্যান্য বাম দল	১৬৪	-	০.২০
লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি	১৮	০১	০.২৮
অন্যান্য দল	১২৫	-	০.২২
নির্দলীয় প্রার্থী	১৪৪	০৪	২.৯৪
“না” ভোট	-	-	০.৫৫
সর্বমোট	১৫৪৯	৩০০	১০০

(সূত্র : Ali Riaz, *Bangladesh A Political History since Independence*, I.B. Tauris & Co. Ltd., London, 2016, p. Appendix 5)

এ নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ পেয়েছে ২৩০টি আসন ও ৪৮.২৯ ভাগ ভোট। বিএনপি পেয়েছে ৩০টি আসন ও ৩২.৯৫ ভাগ ভোট। আর জাতীয় পার্টি (এরশাদ) পেয়েছে ২৭টি আসন ও ৬.৪৭ ভাগ ভোট। জাসদ পেয়েছে ০৩টি আসন ও ০.৭২ ভাগ ভোট, ওয়ার্কার্স পার্টি পেয়েছে ০২টি আসন ও ০.৩৭ ভাগ ভোট। বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি ও লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি ১টি করে আসন পেয়েছে। আর ধর্মপন্থী দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী পেয়েছে ০২টি আসন এবং ৪.৪৮ ভাগ ভোট।

এ নির্বাচনে ধর্মভিত্তিক ও ধর্মনির্ভর রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মকে পুঁজি করে জনগণকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। দেশের প্রধান দু'টি দল ধর্মীয় বিষয়ে নানা ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করে। বিশেষ করে বিএনপি ও জোট সরকারের সময় ধর্মের নামে বোমা হামলা, মানুষ হত্যা, প্রভৃতি কর্মকাণ্ড সম্পর্কে মানুষ নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে। বাংলাদেশে পুনরায় কিভাবে ধর্মীয় ও সামাজিক সংহতি ফিরে আসবে সে ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে। আওয়ামী লীগ ও মহাজোট এ বিষয়টি তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় বিশেষভাবে কাজে লাগায়। এ নির্বাচনে তাদের মেনিফেস্টোতে তারা জঙ্গিবাদ ও ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী অবস্থান স্পষ্ট করেছিল।[৭৮] ধর্মের নামে অধর্ম করার পক্ষপাতী এদেশের মানুষ কিছুতেই মেনে নিতে চায়নি। জনগণ ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে এর প্রতিফলন ঘটায়। এ নির্বাচনে তারা বিএনপি ও চার দলীয় জোটের অন্যতম শরিক দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীকে বিশেষভাবে ধর্মীয় রাজনীতির নেতিবাচক প্রভাবের জন্য দায়ী করে বিরোধী মহাজোটকে তাদের চূড়ান্ত রায় প্রদানের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে বসার সুযোগ করে দেয়।

এসব বিষয় বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, এ নির্বাচনে ধর্মের প্রভাব উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারেনি। এছাড়া বিপুল পরিমাণ তরুণ ভোটারদের কাছে ধর্মীয় আবেদনের চেয়ে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের 'পরিবর্তনের রাজনীতি' ও 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার অঙ্গীকার তরুণ ভোটারদের আকৃষ্ট করতে পেরেছিল বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রতিশ্রুতি শিক্ষিত তরুণ ভোটারদের কাছে অবদান রাখে। অন্যদিকে বিএনপি-এর শ্লোগান ছিল 'দেশ বাঁচাও', 'মানুষ বাঁচাও'। মূলত ধর্মকে মুখ্য বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার কৌশল এ নির্বাচনে ব্যর্থ হয়। ২৩ ডিসেম্বর নির্বাচনের প্রাক্কালে বিএনপি প্রধান বেগম খালেদা তার পুরোনো কৌশল হিসেবে ইসলাম রক্ষার জন্য চার দলীয় জোটকে ভোট দেয়ার জন্য জনগণকে আহ্বান জানান। কিন্তু তার এ আহ্বানে জনগণ সাড়া দেয়নি।[৭৯]

বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার প্রসঙ্গে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেছেন। নিম্নে সেগুলোর কয়েকটি উল্লেখ করা হলো:

তালুকদার মনিরুজ্জামান এ প্রসঙ্গে বলেন যে, ধর্ম এদেশের রাজনীতিতে একটি স্থায়ী উপদান।[৮০] এ প্রসঙ্গে আলী রীয়াজ বলেন, এদেশে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামীকরণের রাজনীতি একটি শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছানোর কারণে পরবর্তীতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা সেটির মোকাবেলায় কৌশল

নিয়ে সঙ্কটে পড়ে।[৮১] এমাজউদ্দীন আহমদ ও দিল রওশন জিনাত আরা নাজনীন এ বিষয়ে বলেন যে, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যখন অনুন্নত থাকে ও বাঁধাগ্রস্ত হয়, ধর্মীয় কর্মকাণ্ড তখন রাজনীতির সঙ্গে মিশে যায় এবং সমাজকে প্রভাবিত করে।[৮২] আর জয়া চ্যাটার্জি বলেন- আওয়ামী লীগ দলটি নির্বাচনী কৌশল হিসেবে রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার করলেও দলটি নির্বাচনের সময় ও অন্যান্য সময় মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ প্রভৃতি বিষয়ের বিপক্ষে শক্তিশালী ভুমিকা রেখেছে।[৮৩]

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে পরিশেষে বলা যায় যে, ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সময় থেকেই এ অঞ্চলের রাজনীতিতে ধর্মের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে শুরু করে প্রথম গণতান্ত্রিক সরকারের আমল পর্যন্ত এরা দুর্বল থাকলেও, প্রথম সামরিক শাসনামল থেকে ধর্মপন্থী রাজনীতির পুনরুত্থান ঘটে। সামরিক আমলের পরেও ধর্মপন্থীরা নানা উপায়ে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে তাদের অবস্থান টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। প্রধানত বিভিন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর ধর্মকেন্দ্রিকতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ২০০৮ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলোর ধর্মের ব্যবহার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলে অনুধাবন করা যায় যে, বাংলাদেশের প্রধান দলগুলো সেসময় সহজে জনগণের সমর্থন পাবার আশায় ধর্মকেই সেরা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার কৌশল বেছে নেয়। অবশ্য এক্ষেত্রে বিভিন্ন দলের মধ্যে ধর্মীয় অনুভূতিকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুবিশাল মাত্রাগত ও ধরণগত পার্থক্য বিদ্ধমান ছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সময়কালে রাষ্ট্রীয় অনুকূল পরিবেশে বিভিন্ন ধর্মপন্থী দল সংখ্যালঘু নির্যাতন ও উদারপন্থী বিরোধী দলগুলোর সমর্থকদের প্রতি নির্মম অত্যাচার-নির্যাতন করেছে। বিশেষ করে নির্বাচনকালীন সময়ে এদের সহিংসার মাত্রা ব্যাপকতর হয়েছে। তবে একটি কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর চরম মাত্রায় ধর্ম ব্যবহারের কারণে, রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ঐ শক্তিকে মোকাবেলা করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ ধারার দলগুলো কখনো কখনো ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করেছে। আবার, একথাও ঠিক যে, ধর্মনিরপেক্ষ ধারার প্রধান দল আওয়ামী লীগ তাদের ব্যাপারে ধর্মপন্থীদের নানামুখী অপপ্রচার ঠেকানোর নির্বাচনী কৌশল হিসেবে রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের ব্যবহার করলেও, বিরোধী দলে থাকা অবস্থাতেও সংখ্যালঘু নির্যাতন, সহিংসতা, মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ প্রভৃতি বিষয়ের বিপক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে।

তথ্যসূত্র

১. অনুচ্ছেদ- ৮(১) এবং অনুচ্ছেদ- ১২, দ্বিতীয় ভাগ, *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ৪

২. Harun-or-Rashid, "Desecularisation and the Rise of Political Islam in Bangladesh", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh (Hum.)*, Vol.-57(1), Dhaka, 2012, pp. 32-33; মো. আব্দুল হালিম, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, (বৃটিশ শাসনব্যবস্থা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাসঙ্গিক বিষয়সহ)*, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১২৭-১২৮

৩. Rafiuddin Ahmed, "Introdcution", Rafiuddin Ahmed (ed.), *Religion, Nationalism and Politics in Bangladesh,* South Asian Publishers, New Delhi, 1990, p. 27

৪. আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৯১-২০০৭*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৭৩-৭৪; আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩০-৩৭; শাহেদ ইকবাল মো. মাহবুব-উর-রহমান, *বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি: সমস্যা ও সম্ভাবনা*, অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ২৭-২৮

৫. Ali Riaz, *Bangladesh A Political History since Independence*, I.B. Tauris & Co. Ltd., London, 2016, p. 155

৬. বদরুদ্দীন উমর, *বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার*, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১০০-১০১

৭. মো. শামছুল আলম, "বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের ক্রমবিকাশ : ১৯৭২-৯৬", তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ রাজনীতির ২৫ বছর, প্রথম খণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮, (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃ. ৭০

৮. Rounaq Jahan, *Bangladesh Politics : Problems and Issues*, University Press Limited, Dacca, 1980, p. 203; আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩-৭৬; মো. শামছুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০-৭১

৯. *সাপ্তাহিক বিচিত্রা*, ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি ১৯৮৬

১০. *দৈনিক ইনকিলাব*, ঢাকা, ০৫ জানুয়ারি ১৯৮৮

১১. Ali Riaz, *op.cit.*, p. 151

১২. মো. শামছুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

১৩. Ali Riaz, *op.cit.*, p. 151-152

১৪. আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩-৭৬

১৫. Ali Riaz, *opcit.*, p.152

১৬. মো. শামছুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭১

১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩,৭৭

১৮. S.R. Chakravarty, *Bangladesh : The Ninneteen Seventy Nine Election*, South Asian Publishers, New Delhi, 1988, p. 73

১৯. Mohammad A. Hakim, *Bangladesh Politics-The Shahabuddin Interregnum*, The University Press Limited, Dhaka, 1993, p. 25; Ali Riaz, 2016, *Ibid*, p.155

২০. Ali Riaz, *op.cit.*, p.153

২১. মো. শামছুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২-৮৪ (বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের মূল আদর্শ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, পৃ. ৭৩-৮৪)

২২. এম জহিরুল হক শাকিল, "বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি", তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ রাজনীতির চার দশক, প্রথম খণ্ড*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৭৭

২৩. উদ্ধৃত, Takukder Maniruzzaman, "Bangladesh Politics : Secular and Islamic Trends", Rafiuddin Ahmed (ed.) *op.cit.,* p.69-70

২৪. আনিসুজ্জামান, *নির্বাচিত প্রবন্ধ, (বাংলাদেশে ধর্ম, রাজনীতি ও রাষ্ট্র)*, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ১৪৮

২৫. Shantanu Majumder, "Secularism and Anti Secularism", Ali Riaz (ed.) *Routledge Handbook of Contemporary Bangladesh*, Routledge, New York , 2006, p.41

২৬. Takukder Maniruzzaman, Bangladesh Politics: Secular and Islamic Trends, *op.cit.*, p. 70-71; বদরুদ্দীন উমর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৬-৯৭

২৭. এম. জহিরুল হক শাকিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮; হাসান মোহাম্মদ, *বাংলাদেশ : ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি, গ্রন্থমেলা*, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৬

২৮. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, "বাংলাদেশে ধর্মের রাজনীতি", মওলানা আবদুল আউয়াল (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৩৬-৩৭

২৯. Mohammad A. Hakim, *op.cit.*, p. 122; আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

৩০. এ বিষয়ে দেখুন, মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান, "নির্বাচনী রাজনীতিতে ধর্মীয় উপাদান", আল মাসুদ হাসানউজ্জামান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে নির্বাচন*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৩৬-১৩৭

৩১. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬-৩৭

৩২. মিনার মনসুর (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের সমাজ রাজনীতি ও উন্নয়ন : বিশিষ্ট জনের ভাবনা*, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২০-২১

৩৩. আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

৩৪. Lailufar Yasmin, "Bangladesh-India Relations:Neighbourliness beyond Terroism", Imtiaz Ahmed (ed.), *Terrorism in the 21st Century Perspectives from Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka, 2009, p. 82

৩৫. আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭

৩৬. বদরুদ্দীন উমর, *শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশের চিত্র*, মীরা প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৬০

৩৭. Mohammad A. Hakim, *op.cit.*, p. 60; মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৬

৩৮. কঙ্কর সিংহ, *রাষ্ট্র, সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সংকট*, অনন্যা, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৮৯ (বিস্তারিত দেখুন, পৃ. ৮৪-৮৯)

৩৯. মোহাম্মদ হাননান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, ১৯৯০-১৯৯৯*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ২৫৩

৪০. Harun-or-Rashid, *op.cit.*, p. 35

৪১. এ প্রসঙ্গে দেখুন, গোলাম মুরশিদ, "স্বরূপের সংকট, না নয়া সাম্প্রদায়িকতা", সৈয়দ আমীরুল ইসলাম ও কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি : ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার সংকট*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৫৭-১৫৮

৪২. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতি : সংস্কৃতির স্বরূপ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১১১

৪৩. মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

৪৪. Lailufar Yasmin, *op.cit.*, p. 83; এম জহিরুল হক শাকিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৫

৪৫. *সাপ্তাহিক রোববার*, ২ জুন ১৯৯৬

৪৬. এম জহিরুল হক শাকিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬; মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮

৪৭. মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৮

৪৮. *সাপ্তাহিক রোববার*, ২১ এপ্রিল ১৯৯৬

৪৯. এম. জহিরুল হক শাকিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৬

৫০. সা'দ উল্লাহ্, *ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৪৩

৫১. *নতুন ঢাকা ডাইজেস্ট*, জুন ১৯৯৬, ১০ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ১৬ (উদ্ধৃত, সা'দ উল্লাহ্, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩)

৫২. মোহাম্মদ হাননান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮৪

৫৩. সা'দ উল্লাহ্, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩

৫৪. বদরুদ্দীন উমর, *দ্বিতীয় আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশ*, অনুভব প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৭১-৭৪

৫৫. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৩ জুন ১৯৯৬

৫৬. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৬ জুন ১৯৯৬

৫৭. *দৈনিক সংবাদ*, ১৬ জুন ১৯৯৬

৫৮. *দৈনিক ভোরের কাগজ*, ১৯ জুন ১৯৯৬

৫৯. *দৈনিক সংবাদ*, ২৩ জুন ১৯৯৬

৬০. *দৈনিক সংবাদ*, ১৫ জুলাই ১৯৯৬

৬১. উদ্ধৃত, সা'দ উল্লাহ্, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৪; বাংলাদেশে নির্বাচনী সহিংসতা সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, মো. আবদুর রহিম, "বাংলাদেশে নির্বাচনী সহিংসতা : একটি পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণ", *সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা*, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৯১-২০৪; আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৫, ১৫৫; মো. কামাল হোসাইন, "নির্বাচনী সহিংসতা ও অ-উদারনৈতিক গণতন্ত্রের আশঙ্কা", আল মাসুদ হাসানউজ্জামান (সম্পাদিত), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৮০, ২৮৩

৬২. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ২৪ জুন ১৯৯৬

৬৩. *The Daily Bangladesh Observer*, 8 september 2001

৬৪. Ali Riaz, "The Politics of Islamization in Bangladesh", Ali Riaz (ed.), *Religion and Politics in South Asia*, Routledge, New York, 2010, p. 59

৬৫. মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০

৬৬. Ali Riaz, Bangladesh A Political History since Independence, *op.cit.*, p. 81

৬৭. এম জহিরুল হক শাকিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯২; ২০০১ সালের নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু নির্যাতন সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, রানা দাশগুপ্ত (নির্বাহী সম্পাদক), *নির্যাতিত সংখ্যালঘু, বিপন্ন জাতি*, চট্টগ্রাম, ২০০২ (গ্রন্থটিতে ২০০১ সালের নির্বাচনত্তোর সংখ্যালঘু নির্যাতনের বিস্তারিত বর্ণনা

রয়েছে। গ্রন্থটির শেষে নির্যাতন ও সহিংসতার কিছু ছবি দেওয়া আছে।); এছাড়া আরো দেখুন, *দৈনিক প্রথম আলো*, *দৈনিক সমকাল*, *দৈনিক সংবাদ* প্রভৃতি পত্রিকার ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০০১ পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যা

৬৮. সা'দ উল্লাহ্, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৭

৬৯. *দৈনিক সংবাদ*, ২৩ অক্টোবর ২০০১

৭০. আতিউর রহমান, "বাংলাদেশের হৃদয় যে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছে", রানা দাশগুপ্ত (নির্বাহী সম্পাদক), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯

৭১. এম. জহিরুল হক শাকিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৮

৭২. উদ্ধৃত, *প্রাগুক্ত*

৭৩. Shaikh Maqsood Ali, *From East Bengal to Bangladesh Dynamics and Perspectives*, The University Press Limited, Dhaka, 2017, (Second revised edition), pp. 414-416

৭৪. *The Daily Telegraph*, 26 December 2008

৭৫. মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১

৭৬. Lailufar Yasmin, *op.cit.*, p. 84; Ali Riaz, The Politics of Islamization in Bangladesh, *op.cit.*, p. 59

৭৭. *দৈনিক প্রথম আলো*, ৪ মার্চ ২০০৭

৭৮. Harun-or-Rashid, *op.cit.*, p. 37

৭৯. মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১-১৪২

৮০. Takukder Maniruzzaman, *Politics and Security in Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka, 1994, p. 29

৮১. Ali Riaz, The Politics of Islamization in Bangladesh, *op.cit.*, p. 58

৮২. উদ্ধৃত, মোহাম্মদ সাজেদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৩

৮৩. উদ্ধৃত, *প্রাগুক্ত*

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রপন্থী রাজনৈতিক শক্তির উত্থান

পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রপন্থী রাজনৈতিক শক্তির উত্থান ও তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। ধর্মীয় উগ্রপন্থীদের উত্থান বর্তমান বিশ্বে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচ্য বিষয়। বিগত চার দশক ধরে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশসহ এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ধর্মীয় উগ্রবাদ বিশেষ করে ইসলামি জঙ্গিবাদ বেশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশেও ইসলামি জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, এদেশে ইসলামি জঙ্গিবাদের উৎপত্তি প্রায় দুই দশকের। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রপন্থী রাজনৈতিক শক্তি বলতে মূলত ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলো এবং তাদের কর্মতৎপরতাকেই বুঝানো হয়েছে। ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলো বাংলাদেশে ১৯৯৯ সাল থেকে নাশকতা ও সহিংসতার সূত্রপাত করেছে। তাদের সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু হলো বিভিন্ন বেসামরিক স্থাপনা, যেমন- বিচার বিভাগ (আদালত), এনজিও অফিস, সহকারী কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়, প্রেস ক্লাব, সিনেমা হল, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি। এর মাধ্যমে তারা হত্যা করেছে সাধারণ নিরীহি মানুষ, বিচারক, আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের। বোমা ও গ্রেনেড হামলা এবং বিভিন্ন উপায়ে হত্যার মাধ্যমে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ২৪৭ জন বেসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করেছে এবং ২৪৩২ জন ব্যক্তিকে আহত করেছে।[১] সাম্প্রতিককালে (২০০১-২০০৮) এ সংগঠনগুলো আত্মঘাতী বোমা ও গ্রেনেড হামলা এবং হত্যার মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠী, জনগণের সম্পদ, প্রশাসন ও রাষ্ট্রের প্রতি হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ১৭ আগস্ট, ২০০৫ সালে জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) নামক একটি ইসলামি জঙ্গি সংগঠন ৬৩টি জেলায় একসঙ্গে ৫০০টিরও বেশি বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এর আগ পর্যন্ত এদেশে জঙ্গিবাদ বিষয়টিকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়নি।[২] ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলোর নাশকতামূলক কর্মতৎপরতার ফলে দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে। পাশাপাশি সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রপন্থী রাজনৈতিক শক্তি তথা জঙ্গিবাদকে চিহ্নিত করা এবং এর প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান অধ্যায়ে বাংলাদেশে উগ্রপন্থী ধর্মীয় রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর (জঙ্গি

সংগঠনগুলোর) উত্থান এবং তাদের কার্যক্রমের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি জঙ্গি সংগঠনগুলোকে দমন ও পর্যায়ক্রমে নির্মূল করার জন্য কিছু সুপারিশ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রপন্থী রাজনৈতিক শক্তি বা জঙ্গিবাদের উত্থানের প্রেক্ষপট

ইসলাম ধর্মীয় নামযুক্ত কোন সংগঠন যখন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কোন দেশের উপর জোরপূর্বক তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শ চাপিয়ে দেয়ার জন্য উগ্রবাদী পন্থা অবলম্বন করে, সাধারণত তখন আমরা সেটাকে ইসলামি জঙ্গিবাদ হিসেবে চিহ্নিত করি। ধর্মীয় উগ্রপন্থী রাজনীতি বা জঙ্গিবাদের অন্তর্নিহিত শক্তি হচ্ছে অপরের প্রতি ঘৃণা, অন্যের অধিকার হরণ, জোর-জবরদস্তি প্রভৃতি। ইসলামি জঙ্গিবাদ বা ধর্মীয় মৌলবাদের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবুল বারকাতের নিম্নোক্ত বক্তব্যটি প্রনিধানযাগ্য। তিনি বলেন-

> “ধর্মীয় মৌলবাদ হচ্ছে যুদ্ধংদেহী এক ধর্মপ্রীতি। এটি এমনই এক বিশ্বাস, যা প্রতিনিয়ত আর্দশিক সংঘর্ষের জন্য তৈরি থাকার প্রেরণা জোগায়। সব ধর্মের মৌলবাদীরা নির্দিষ্ট এক ছকের অনুসারী। তারা আধ্যাত্মিকভাবে সংগ্রামের চেতনায় সদা প্রস্তুত। তাই ধর্মনিরপেক্ষ ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসীদের সাথে মৌলবাদের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। ধর্মভিত্তিক মৌলবাদীরা তাদের আদর্শগত এই সংগ্রাম-সংঘর্ষকে প্রচলিত রাজনৈতিক সংগ্রাম হিসেবে মূল্যায়ন করে না। বরং তাদের বিশ্বাস, এ যুদ্ধ হচ্ছে শুভ এবং অশুভ শক্তির মধ্যে দুনিয়াব্যাপী লড়াই। অস্তিত্ব হারানোর প্রচ্ছন্ন এক ভীতি মৌলবাদীদের প্রতিনিয়ত তাড়িত করে। এ অবস্থা থেকে মুক্ত থাকার জন্য প্রায়শ তারা সমাজের মূলধারা থেকে বেরিয়ে এসে নিজস্ব বিকল্প এক চেতনার উদ্ভব ঘটায়। মনোনিবেশ করে আধুনিক যুক্তিগ্রাহ্যতার দিকে। তথাপি মৌলবাদীরা অবস্তাব কোনো ধ্যান-ধারণার অনুসারী নয়। তারা তাদের মূল আদর্শকে অনন্যসাধারণ গুণসম্পন্ন নেতৃবৃন্দের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে নতুন এক মতাদর্শে বিনির্মাণ করে। তারা ধর্মীয় মৌলবাদী আদর্শে বিশ্বাসীদের জন্য মেলে ধরে কর্মপরিকল্পনা। মৌলবাদীরা তাদের ধর্মীয় পৌরাণিক কাহিনিকে সৃষ্টিকর্তার কর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সদা সচেষ্ট। এ উদ্দেশ্যে তারা জটিল সব পৌরাণিক কাহিনিকে সর্বজন উপযোগী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। আর এসব মতাদর্শ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্ত হলে তাদের মধ্যে তৈরি হয় ক্ষোভ। তারা হয়ে ওঠে প্রতিহিংসাপরায়ণ।”[৩]

জঙ্গিবাদ সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না, বরং সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণকর ও ভালো দিকগুলোকে নিঃশেষ করে দেয়। জঙ্গিবাদের কারণে বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অকার্যকর রাষ্ট্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ দেশগুলো হলো পাকিস্তান, সুদান, আফগানিস্তান ও আরো কিছু

দারিদ্রপীড়িত দেশ। তবে এসকল দেশগুলো অর্থনৈতিকভাবে কম অগ্রসর, সামাজিকভাবে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ এবং বহু গোত্রে বিভক্ত, আবার অনেকে যুদ্ধবিদ্ধস্ত। সে দিক থেকে বাংলাদেশ ব্যতিক্রম। এখানকার অধিকাংশ মানুষ একই ণৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাই এ ধরনের সমজাতীয় সমাজে জঙ্গিবাদের উত্থান স্বাভাবিক নয়। তা সত্ত্বেও বাস্তবতা হচ্ছে বাংলাদেশের জঙ্গিবাদের অস্তিত্ব বর্তমান।[৪] তবে বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রপন্থী রাজনৈতিক শক্তির উত্থান একক কোন কারণে হয়নি বা হঠাৎ করেই হয়নি। বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থানের পিছনে সমাজের বহুবিধ নিয়ামক সংশ্লিষ্ট। নিম্নে বাংলাদেশের ধর্মীয় উগ্রপন্থী রাজনৈতিক শক্তি বা জঙ্গিবাদের উত্থানের প্রধান কারণসমূহ সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে মৌলবাদ ও জঙ্গিবাদের উত্থানের সঙ্গে দারিদ্রতার একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে। অনেক আগে থেকেই আমাদের সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়েছে। অর্থ-বিত্তের বিভাজনতো আছেই, সে সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিভাজন, জ্ঞান-প্রযুক্তির বিভাজন প্রভৃতি। দেশের হাতে গোনা সীমিত সংখ্যক লোক অধিকাংশ সম্পদ ভোগ করছে। আর বৃহত্তর জনগণের ভাগ্যে দু'বেলা পেট পুরে খাবার জুটছে না। এ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য মানুষের পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট করে দিচ্ছে । ফলে ক্রমইশ বাড়ছে হতাশা, সন্দেহ, সংশয় ও বৈরিতা।[৫] আর এসব কারণে সমাজে জঙ্গিবাদের অনুপ্রবেশ অধিকতর সহজ হয়েছে।

অর্থনীতিবিদ আবুল বারকাত এক গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, বাংলাদেশের ১৬ কোটি লোক দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে আছে সংখ্যালঘু ক্ষমতাধর মানুষ, যাদের সংখ্যা হবে বড়জোর ১০ লক্ষ। আর দ্বিতীয় ভাগে আছে সংখ্যাগুরু ক্ষমতাহীন মানুষ, যাদের সংখ্যাগুলো হবে ১৫ কোটি ৯০ লক্ষ। রাজনীতি অর্থনীতির মারপ্যাচে এমন এক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে যেখানে ১০ লক্ষ ক্ষমতাধরের বিপরীতে আছে ১৫ কোটি ৯০ লক্ষ ক্ষমতাহীন, অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত, বঞ্চিত, বৈষম্য জর্জরিত, হতাশাগ্রস্থ মানুষ। প্রকৃত অর্থে এ বিশাল সংখ্যক ক্ষমতাহীন মানুষের সক্ষমতা বৃদ্ধি অথবা ক্ষমতাহীনদের ক্ষমতায়ন অথবা Inclusion of the excluded (বাদপরাদের অর্ন্তভুক্তিকরণ)-এ বিষয়ে অন্তত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের নিরিখে সচেতন কোন প্রয়াস কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। উল্টো ক্ষমতাবানদের ক্ষমতাবৃদ্ধির বহুমূখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যে, তা আরও বহুদিন বহাল থাকবে। সামগ্রিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমীকরণ তাই

নির্দেশ করে। আর ভারসাম্যহীন বিকাশ সমীকরণে এক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে যদি কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী "মুক্তির পথে" সুইসাইড বোমারু হিসেবে "বেহেশতবাসী" হওয়ার জন্য আত্মহুতি দেয় তা অযৌক্তিক হবে কেন? একথা শুধু আমাদের দেশের জন্যই নয়, তা এখন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য?[৬]

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ উত্থানের পিছনে রাজনৈতিক কারণও দায়ী আছে। কারণ, একটি দেশে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটে অসুস্থ, অনিশ্চিত ও বৈরী রাজনীতির সুযোগে। গণতান্ত্রিক ও পরমতসহিষ্ণু রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে জঙ্গিবাদ টিকতে পারে না। আমাদের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এমন কোন দুর্বলতা আছে যাতে জঙ্গিবাদ প্ররোচিত হয়। যেমন, স্বাধীনতা লাভের মাত্র ৩ বছর সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রাকে ব্যহত করা, দেশে সামরিক শাসন জারি ও দীর্ঘমেয়াদী সামরিক স্বৈরশাসন বহাল থাকা, সামরিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন করে ধর্মপন্থী রাজনীতি চালু হওয়া, পুরাতন কিছু ধর্মপন্থী দলের পুনরুত্থান ও বিপুল সংখ্যক নতুন ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলের জন্ম হওয়া, ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করা, দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ধর্মপন্থী দলগুলোর অংশগ্রহণ, সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব, মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে ইসলামি দলগুলোর অর্থনৈতিক সুবিধা প্রাপ্তি, মধ্যপ্রাচ্যে বিভিন্ন দেশে (আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, ইরাক, লেবানন প্রভৃতি দেশ) নির্যাতিত মুসলমানদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বাংলাদেশের মুজাহিদদের (এদের অধিকাংশই মাদ্রাসার ছাত্র এবং শিক্ষক) অংশগ্রহণ ও বিভিন্ন জঙ্গি সংগঠনগুলোর সংশ্লিষ্টতা লাভ প্রভৃতি। আর দল বা গোষ্ঠী বিশেষের আনুকূল্য বা আশ্রয়- প্রশ্রয় তো আছেই।[৭]

এছাড়া আমাদের দেশে জঙ্গিবাদ উত্থানের জন্য ধর্মান্ধতা ও ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থাকে বহুলাংশে দায়ী করা যায়। উল্লেখ্য যে, ধর্মের প্রতি এদেশের মানুষের বরাবরই প্রবল অনুরাগ রয়েছে। জঙ্গিদের দ্বারা ধর্মানুরাগীরাও প্রতারিত হচ্ছে। তাদের আবেগ-অনুভূতিকে পুঁজি করে একশ্রেণির ধর্ম ব্যবসায়ীরা মাঠে নেমেছে। এরা জনগণকে প্রলুদ্ধ করছে, জাগতিক অনেক সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে ও বেহেশতের মিথ্যা আশ্বাস দিচ্ছে। যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এসব কারণে ধর্মানুরাগীরা ভয়ঙ্কর এ জঙ্গিবাদের দিকে পা বাড়াচ্ছে।

বাংলাদেশে ধর্মীয় শিক্ষা বলতে সাধারণত মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থাকেই বোঝানো হয়। জঙ্গিবাদের উত্থানের পিছনে এ মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে অনেকাংশে দায়ী করা হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে যেসব জঙ্গি ধরা পড়েছে তাতে দেখা যায় যে, তাদের অধিকাংশই মাদ্রাসার ছাত্র অথবা শিক্ষক। আত্মঘাতী বোমা স্কোয়াডের সদস্যরা প্রায় সবাই দরিদ্র কৃষক, দিনমুজুর পরিবারের সন্তান। অভাবের তাড়নায় বাবা-মা'রা সন্তানকে মাদ্রাসা-মক্তব-এতিমখানায় পাঠান। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণির পাঠ শেষ করতে না করতেই অনেকে জঙ্গি তালিকায় নাম লেখায়। অল্পবয়সী কিশোররাই প্রধানত জেএমবির বোমা স্কোয়াডের সদস্য। এছাড়া আব্দুর রহমান, আতাউর রহমান সানী, আবদুল আওয়ালসহ জেএমবির শীর্ষ নেতারাও মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত।[৮] ইদানিং বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থী ও উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানরাও জঙ্গি সংগঠনে ও আত্মঘাতি বোমা স্কোয়াডের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছে।[৯] আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থী বোমা তৈরী করছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জঙ্গি সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে এবং তাদের আদর্শিক লিফলেট প্রভৃতি তৈরি ও প্রচার করছে।

বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা আলিয়া মাদ্রাসা ও কওমি মাদ্রাসা এ প্রধান দু'টি ধারায় বিভক্ত। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে আলিয়া মাদ্রাসাগুলোর উপর সরকারের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এসব মাদ্রাসায় প্রধানত আরবি ভাষা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান করা হয়। অংক, বাংলা ও ইংরেজি ভাষা সামান্য শিক্ষা দেয়া হলেও আধুনিক বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার তেমন সুযোগ নেই। আর কওমি মাদ্রাসার উপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। এখানে কোরআন-হাদীস ছাড়া অন্য কিছু শিক্ষা দেয়া হয় না। কোন ধরনের পত্রিকা পড়তে দেয়া হয় না। অনেক সময় সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের মিশতে দেওয়া হয় না। মানবিক শিক্ষার প্রসার এখানে নেই বললেই চলে। আর কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের এদেশে পর্যাপ্ত চাকুরির সুযোগ নেই। ফলে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা ক্রমাগত বেকার থাকছে, যা হতাশা ও উগ্রবাদের জন্ম দিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া অনেক মাদ্রাসায় 'মরলে শহীদ, বাঁচলে গাজী'-জিহাদের এ শিক্ষা দিয়ে ধর্মান্ধতা ও জঙ্গি সৃষ্টি করা হয়।[১০] এছাড়া মাদ্রাসার হোস্টেলগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীদের থাকা-খাওয়ার পরিবেশ মোটেও সন্তোষজনক নয়। পাশাপাশি মানুষের বাড়ি-বাড়ি যেয়ে ও রাস্তা-ঘাটে চাঁদা তোলা এবং মাদ্রাসার শিক্ষকদের নির্দেশ মতো বিভিন্ন কায়িক শ্রমে বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ করার কারণেও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক ধরনের হতাশা ও হীনমন্যতা কাজ করে। এসব কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, অর্থ-বৃত্তের লোভ ও উন্নত জীবনের আশায় অনেক মাদ্রাসা শিক্ষার্থী জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ে।

দেশ স্বাধীন হবার পর বিভিন্ন সময়ে গঠিত শিক্ষা কমিশন মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন সুপারিশ প্রদান করেছে, কিন্তু কোন সরকারই সেগুলো বাস্তবায়ন করেনি। এর অন্যতম কারণ হল সংস্কারের ব্যাপারে ধর্মীয় নেতাদের আপত্তি। এ প্রসঙ্গে কওমি মাদ্রাসার প্রধান পৃষ্ঠপোষক মুফতি ফজলুল হক আমিনী বলেন, 'সরকার [মাদ্রাসা শিক্ষা] নিয়ন্ত্রণ করবে এটা চাই না। সরকার নিয়ন্ত্রণ করলে আর এলেম থাকবে না। আজকে মাদ্রাসার মধ্যে স্বাধীনভাবে রাজনীতি করছি। স্কুল-কলেজের মধ্যে রাজনীতি করায় সমস্যা আছে।' তিনি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, 'সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে আলেম-ওলামারা জিহাদ শুরু করে দেবে।'[১১] তবে তিনি সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক সাহায্য না চাইলেও কৌশলে সরকার থেকে কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সনদের স্বীকৃতি নিতে চান। উল্লেখ্য যে, আলিয়া মাদ্রাসাগুলোর সনদের সরকারি স্বীকৃতি রয়েছে। ভোটের রাজনীতিতে সমর্থন হারাবার ভয়ে সব সরকারই আলেম-ওলামাদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ফলে মাদ্রাসা ও তার শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এক হিসাবে দেখা যায় যে, ১৯৯৯ সালে আলিয়া মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল ৭০৯৬; শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৮ হাজার, ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৯ লক্ষ ৪ হাজার; ২০০৩ সালে যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে ৭৯২০, ১ লক্ষ ১৩ হাজার ৮১০ ও ৩৩ লক্ষ ৯৮ হাজার।[১২] ২০০৫ সাল পর্যন্ত কওমি মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল প্রায় ২০,০০০ ও ছাত্র-শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় ৫০ লাখ।[১৩] আর ২০০৮ সাল পর্যন্ত এ সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১ কোটি (৯৮ লক্ষ ২৭ হাজার ৭৪৮)।[১৪]

অতি সাম্প্রতিককালে জঙ্গিবাদ উত্থানের প্রেক্ষাপটে এডিবি (এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক) বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কার ও আধুনিকায়নে সহযোগিতা দানের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষার সমন্বয় ও সামঞ্জস্য করতে এডিবি সব ধরনের সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে বলে জানিয়েছে। তবে মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষাকে একীভূত না করে কোন রকম দায়সাড়া গোছের কাজ করলে সমস্যার প্রকৃত সমাধান হবে না। আর সংস্কার বিষয়টি কেবল আর্থিক নয়, মূলত রাজনৈতিক। সরকারের দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছার উপর এ বিষয়টি অনেকাংশে নির্ভর করবে।

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ উত্থানের আন্তর্জাতিক বা বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ৯০-এর দশকের শুরুতে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের উপর পশ্চিমা দেশগুলোর বিরূপ মনোভাব ও অযাচিত নিপীড়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মুসলিম প্রধান দেশে ইসলামি উগ্রবাদী জঙ্গি গ্রুপগুলোর উত্থান ঘটে।

যতদূর জানা যায় ঐ সময় বাংলাদেশের অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান ও বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্ররা আফগানিস্তান, কাশ্মীর, ইরাক, লেবানন, ফিলিস্তিন প্রভৃতি দেশে যেয়ে মুসলমানদের পক্ষে স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, নির্যাতিত মুসলিম জনপদের অধিকার প্রতিষ্ঠা, ইসলামি শাসন কায়েম প্রভৃতি উদ্দেশ্যে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তারা ঐসব দেশে অবস্থানকালীন সময় বিভিন্ন ইসলামি জঙ্গি সংগঠন ও নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে আসে। ৯০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বাংলাদেশী মুজাহিদদের অনেকেই দেশে ফেরত আসলে, তাদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনগুলো বাংলাদেশে তাদের কার্যক্রমের বিস্তৃতি ঘটানোর প্রচেষ্টা চালায়। এসব সংগঠন জনগণকে ইসলামি জীবনধারায় উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার তাগিদ দিতে থাকে।[১৫]

এছাড়া ৮০ ও ৯০-এর দশকে মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি তেল সমৃদ্ধ দেশের অর্থায়নে এদেশে ধর্মীয় রাজনীতি বেগবান হয় এবং ধর্ম ব্যবসার বিভিন্ন সংগঠন ও গ্রুপ গড়ে উঠে। এর পাশাপাশি মায়ানমারে সামরিক জান্তার অত্যাচারে টিকতে না পেরে কয়েক লাখ রোহিঙ্গা মুসলমান বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। তাদের সহায়তায় এগিয়ে আসে রাবাতে ইসলামসহ কয়েকটি ইসলামি এনজিও। এ সুযোগে বাংলাদেশের ধর্মবাদী দল ও গ্রুপগুলোর সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন ধর্মপন্থী গোষ্ঠী ও গ্রুপের নেটওয়ার্ক গড়ে উঠে। মানবিক সাহায্যের নামে রোহিঙ্গাদের সামরিক প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র দেয়ার অভিযোগ রয়েছে দেশের কতিপয় ডানপন্থী রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে। ইতোমধ্যে আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র ও পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ সহায়তায় কথিত ইসলামি বিপ্লব সংঘঠিত হলে এদেশের জঙ্গি গ্রুপগুলো আরও উৎসাহিত হয়। বাংলাদেশের অনেক যুবক আফগানিস্তানে মুজাহিদদের পক্ষে লড়াই করেছে বলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এসময় রির্পোট প্রকাশিত হয়। একই সময় মিশর ও আলজেরিয়ায় ইসলামি মৌলবাদীদের উত্থানও এ দেশের জঙ্গিদের উৎসাহিত করেছে। এসব জঙ্গি সংগঠনগুলো মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় মুসলিম দেশ থেকে অস্ত্র ও আর্থিক সহযোগিতা পায়।[১৬]

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক নেতৃত্বের দুর্বলতা, ধর্ম ও জীবনব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মৌলিক জ্ঞানের অভাব, চরম দারিদ্রতা ও বেকারত্ব, হতাশা, প্রচলিত বিভিন্নমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্বলতা, বিভিন্ন সময়ের সরকারের অদূরদর্শিতা, সর্বোপরি বৈশ্বিক রাজনৈতিক প্রভাবে বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিসংগঠনের উত্থান ঘটেছে।[১৭] উল্লেখ্য যে, অতি সম্প্রতি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সমন্বয়কারী প্রতিষ্ঠান এডাব জঙ্গিবাদ উত্থানের দশটি কারণ চিহ্নিত করেছেন। সে কারণগুলো হলো- (১) কর্মজীবী মা-বাবার

পক্ষে সন্তানকে সময় দিতে না পারা, (২) সন্তানদের প্রতি নজর না রাখা, (৩) প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক না থাকা, (৪) সন্তানদের একাকীত্ব, (৫) সঠিক ধর্মীয় শিক্ষার অভাব, (৬) অবৈধ পথে অর্থ উপার্জনে প্রলুব্ধ হওয়া, (৭) সুস্থ বিনোদনের অভাব, (৮) মাদকাসক্তি, (৯) সুস্থ রাজনীতির অভাব এবং (১০) প্রযুক্তির অপব্যবহার।[১৮]

বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিবাদী সংগঠনগুলোর উদ্ভব ও বিকাশ স্তর

আবুল বারকাত বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিবাদের উদ্ভব ও বিকাশের চারটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো :

(১) প্রথম স্তর বা প্রথম কালপর্ব (১৯৯২-১৯৯৬)

(২) দ্বিতীয় স্তর বা দ্বিতীয় কালপর্ব (১৯৯৭-২০০৬)

(৩) তৃতীয় স্তর বা তৃতীয় কালপর্ব (২০০৭-২০১২)

(৪) চতুর্থ স্তর বা চতুর্থ কালপর্ব (২০১৩ থেকে সামনের দিকে)

তিনি এ স্তর বিভাগের মাধ্যমে ইসলামি জঙ্গিবাদের ছোট থেকে বড় হওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেছেন এবং এর মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ চিহ্নিত করেছেন। নিম্নে সে বিষয়টি উল্লেখ করা হলো :

(১) প্রথম পর্ব : ১৯৯২-১৯৯৬ (ভ্রূণ অবস্থার জঙ্গিবাদ)

এ পর্বে নিম্নলিখিত কাজগুলো হয়েছে:

(ক) ৩০ এপ্রিল ১৯৯২- আনুষ্ঠানিকভাবে হুজিবি-এর কর্মকাণ্ড শুরু

(খ) ১৯৯৬-এ আফগানিস্তানে তথাকথিত ইসলামি বিপ্লবে বাংলাদেশী মুজাহিদদের অংশগ্রহণ

(গ) তেমন কোনো বোমাবাজি, হামলা, হত্যা অনুপস্থিত

(২) দ্বিতীয় পর্ব : ১৯৯৭-২০০৬ [সক্রিয় জঙ্গিবাদ (যা প্রথম পর্বে অনুপস্থিত)]

এ পর্বে বেশ কিছু বাংলাদেশী যারা আফগানিস্তানে ইসলামি রাজ কায়েমের লক্ষ্যে যুদ্ধ করে ৪-টি জিনিস নিয়ে দেশে ফিরেছে :

(ক) অস্ত্র প্রশিক্ষণ

(খ) খেলাফত প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ

(গ) যোগাযোগ ও সংগঠন

(ঘ) অর্থের উৎস

(৩) তৃতীয় পর্ব : ২০০৭-২০১২ [তুলনামূলক আপাত শান্ত অবস্থা (সক্রিয় জঙ্গিত্বের নিরিখে)]

এ পর্বে নিম্নবর্ণিত কর্মকাণ্ডগুলো সংগঠিত হয়েছে:

(ক) কর্মকাণ্ড ও সংগঠন- সংগঠনগুলো পুনরায় গঠন ও তৎসংশ্লিষ্ট কার্যাবলি

(খ) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে অনেকেই ধরা পড়ে

(গ) একাধিক জঙ্গির ফাঁসি

(৪) চতুর্থ পর্ব : ২০১৩ সাল থেকে সামনের দিকে [সক্রিয়তর জঙ্গিবাদ (দ্বিতীয় পর্বের চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় সক্রিয়)]

এ পর্বে জঙ্গিবাদী সংগঠনগুলো নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করেছে:

(ক) আন্তর্জাতিক ইসলামি জঙ্গিবাদী সংগঠন আল-কায়েদা ও আইএস-এর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা

(খ) জেএমবি এবং এবিটির ইতোমধ্যে আল-কায়েদা ও আইএস-এর সাথে সম্পর্ক স্থাপন

(গ) নিষিদ্ধ ঘোষিতরা আবারো জেগে উঠেছে

(ঘ) সব জঙ্গিদের একক প্লাটফর্মে আনার প্রচেষ্টা[১৯]

তবে উল্লিখিত পর্বগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় পর্বটিতেই বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উদ্ভব ও বিকাশের চূড়ান্তরূপের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। উল্লেখ্য যে, আমার বর্তমান গবেষণায় উপরিউক্ত বিশ্লেষণের তৃতীয় পর্বের কিছু সময় পর্যন্ত (২০০৮ সাল পর্যন্ত) অনুসরণ করা হয়েছে।

গণমাধ্যমে প্রকাশিত ধর্মীয় উগ্রপন্থী সংগঠনসমূহের পরিচয় ও জঙ্গি তৎপরতা

২০০১ সালের পর থেকে দেশে ধর্মীয় উগ্রবাদী সংগঠনের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং জঙ্গি তৎপরতাও বৃদ্ধি পায়। দেশের প্রধান-প্রধান জাতীয় দৈনিকগুলোতে এ সম্পর্কিত রিপোর্ট ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকলে দেশের আপামর জনসাধারণের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দেশে জঙ্গিবাদের উত্থান ও অবস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, জঙ্গি সংগঠনগুলোর পরিচয়, অবস্থান ও তাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকগুলোই সর্বপ্রথম তথ্য প্রকাশ করে। তবে তৎকালীন সরকার প্রধান ও সরকারি দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তখন বলেছেন যে, এগুলো মিডিয়ার সৃষ্টি। নিম্নে দেশের প্রধান-প্রধান জাতীয় দৈনিকগুলোতে এ সম্পর্কে প্রকাশিত কিছু সংবাদের শিরোনাম এবং সারসংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. পহেলা বৈশাখ রমনা বটমূলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণ, নিহত ৯ জন। ঘটনায় তালেবানি চক্র জড়িত। এটি নিছক একটি অনুষ্ঠানে হামলা ছিল না। এটি ছিল বাঙালির শ্বাশত চেতনা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের উপর স্বাধীনতা-বিরোধী চক্রের সুপরিকল্পিত হামলা। (*সংবাদ*, ১৬ এপ্রিল ২০০১)

২. বটমূলে বোমা হামলায় উগ্র মৌলবাদী চক্র জড়িত-পুলিশ নিশ্চিত। (*জনকণ্ঠ*, ২২ এপ্রিল ২০০১)

৩. রাজশাহীতে তালেবানি সংগঠন 'শাহাদাত-ই-আল হিকমা'-এর ৩ ক্যাডার গ্রেপ্তার। তারা "অস্ত্রের সদ্ব্যবহারই অন্যায় নির্মূলের একমাত্র হাতিয়ার", স্লোগান সংবলিত হাজার হাজার পোস্টার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লাগায়। (*জনকণ্ঠ*, ২৪ এপ্রিল ২০০২)

৪. মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্টে সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকায় 'হরকাতুল জিহাদ'। (*ইত্তেফাক*, ২৩ মে ২০০২; *জনকণ্ঠ*, ২৪ মে ২০০২)

৫. রাজশাহীর তালেবানি সংগঠন আল হিকমার নেপথ্য নায়করা বিএনপি, জামায়াত, মুসলিম লীগের লোক। (*জনকণ্ঠ*, ২৫ মে ২০০২)

৬. বোমা বিস্ফোরণে দিনাজপুরের 'জামা'আতুল মুজাহিদীন' ছাত্রাবাস বিধ্বস্ত। ৪টি পিস্তলসহ বিপুল দলিলপত্র ও বোমা সরঞ্জাম উদ্ধার। ইসলামি জঙ্গি সংগঠনটির ৩ সদস্য গ্রেপ্তার। (*যুগান্তর*, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৩)

৭. রাজশাহীতে জঙ্গি সংগঠন শাহাদাৎ-ই-আল হিকমার কমান্ডো কায়দায় কাজ করার কর্মসূচি। (*সংবাদ*, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৩)

৮. সারাদেশে ১১টি জঙ্গি সংগঠনের ৪৮টি ঘাঁটি, ইসলামি বিপ্লবের নামে জঙ্গি তৎপরতা। (*প্রথম আলো*, ১৪ মার্চ ২০০৩)

৯. চাঁপাইনবাবগঞ্জে গ্রেপ্তার হওয়া ৫ জঙ্গিই জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে যুক্ত। (*প্রথম আলো*, ১৯ মার্চ ২০০৩)

১০. জয়পুরহাটে পুলিশের সঙ্গে 'জামা'আতুল মুজাহিদীন'-এর সশস্ত্র সংঘর্ষ। ওসিসহ ৭ পুলিশ আহত, বন্দুক ও গুলি ছিনতাই। ১৯ জন গ্রেপ্তার। আটক আঞ্চলিক কমান্ডার আনোয়ার সাদাতের তথ্য-আল্লাহর আইন কায়েমের জন্য মুসলিম বিদ্বেষী বিভিন্ন স্থাপনা ধ্বংস করাই জামা'আতুল মুজাহিদীনের লক্ষ্য। (*যুগান্তর*, ১৮ আগস্ট ২০০৩)

১১. জামা'আতুল মুজাহিদীন জঙ্গিরা ৭টি ছাড়া দেশের সব জেলায় তৎপর রয়েছে। (*The Daily Star*, 19 August 2003)

১২. জামায়াতুল মুজাহিদিনের আবরণে ইসলামী গণবাহিনী হচ্ছে। ধরা পড়া জঙ্গিদের সঙ্গে মূল ধারার ইসলামী দলের সম্পর্ক স্পষ্ট। (*জনকণ্ঠ*, ২৫ আগস্ট ২০০৩)

১৩. কুষ্টিয়ায় 'হিজবুত তাওহিদ' নামক জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে জনতার সংঘর্ষ। থানা ঘেরাও। মাদ্রাসা শিক্ষকসহ আহত ৩৫, গ্রেপ্তার ১৩ জন। (*ভোরের কাগজ*, ১০ সেপ্টেম্বর ২০০৩)

১৪. নারায়ণগঞ্জে জঙ্গিদের হাতুড়ি হামলায় একজন নিহত। হিজবুত তাওহিদ নেতা বায়েজিদ খান পন্নীসহ ৪জন গ্রেপ্তার। 'ইসলামের ডাক' শীর্ষক লিফলেটে ইসলাম প্রতিষ্ঠায় 'জিহাদ ও কিতাল' অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দেয়া হয়। ১২ 'হিজবুত'-এর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদোহ মামলা। (*যুগান্তর*, ২৭ ও ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩)

১৫. অস্ত্র মামলায় হরকাতুল জিহাদ নেতা (পলাতক) মুফতি আব্দুল হান্নানের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। [মুফতি হান্নান সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভা স্থলে বোমা পেতে রাখা মামলার প্রধান আসামী।] (*যুগান্তর*, ৩১ ডিসেম্বর ২০০৩)

১৬. জামায়াতে ইসলামীর জঙ্গি আস্তানা থেকে উদ্ধারকৃত হিটলিস্টে ৬১ জনের নাম-রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী ও সাবেক সেনাকর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত। (*ভোরের কাগজ*, ১ মার্চ ২০০৪)

১৭. বাংলাদেশে ১৬টি মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠন সক্রিয়। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা এদের লক্ষ্য। সরকার নির্বিকার। (*ভোরের কাগজ*, ১৯ জুন ২০০৪)

১৮. বরগুনায় জঙ্গি প্রশিক্ষণ, উগ্রবাদী মুজাহিদ পার্টির ৩৩ জন আটক। (*যুগান্তর*, ২ জুলাই ২০০৪)

১৯. বরগুনায় গ্রেপ্তারকৃত জঙ্গিরা মুখ খুলতে শুরু করেছে। মৌলবাদী সংগঠনের ছত্রছায়ায় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। গ্রেপ্তারের ৬ দিন পর ৬ জনের বিরুদ্ধে হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগ এনে থানায় মামলা দায়ের। (*যুগান্তর*, ৪ ও ৮ জুলাই ২০০৪)

২০. ইসলামি জঙ্গিরা ২২ জন সাংবাদিককে হত্যার হুমকি দিয়েছে। (*The Daily Star,* 11 July 2004)

২১. জঙ্গি সংগঠন 'মুজাহিদিন আল-ইসলাম' ১০ সেক্যুলার রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীকে চিঠি দিয়ে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে। (*ভোরের কাগজ*, ১২ জুলাই ২০০৪)

২২. সেক্যুলার রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের রক্ত দিয়ে ইসলাম ও পাকিস্তানের পতাকা রাঙানো হবে। (*জনকণ্ঠ*, ১২ জুলাই ২০০৪)

২৩. কক্সবাজার ও বান্দরবনে চলছে ইসলামি জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ। জনশূন্য পাহাড়ে অসংখ্য মসজিদ-মাদ্রাসা ঘিরে গড়ে উঠেছে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। (*প্রথম আলো*, ১৪ আগস্ট ২০০৪)

২৪. ইসলামপুরের দুর্গম চরে তবলিগ জামাতের নামে জামা'আতুল মুজাহিদীনের সশস্ত্র মহড়া-জঙ্গিদের সঙ্গে ভারি ব্যাগ, ওয়ারলেস সেট ও জেনারেটর। (*জনকণ্ঠ*, ১৭ আগস্ট ২০০৪)

২৫. 'বৃহত্তর চট্টগ্রামে জঙ্গি তৎপরতা' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য প্রথম আলোর বিলবোর্ড ভাঙচুর, পত্রিকায় অগ্নি সংযোগ ও পত্রিকাটি বন্ধের হুমকি। (*প্রথম আলো*, ২১ আগস্ট ২০০৪)

২৬. 'বাংলাদেশে মোট ৩০টি ইসলামি জঙ্গি সংগঠন রয়েছে' (*The Daily Star*, 21 August 2005)

এছাড়া কিছু বিদেশি পত্র-পত্রিকাও বাংলাদেশে জঙ্গি সংগঠন ও মৌলবাদের উত্থান সম্পর্কিত খবর প্রকাশ করে। *Far Eastern Economic Review* ৪ এপ্রিল, ২০০২ ইস্যুতে প্রকাশিত *'Bangladesh: A Concern of Terror'* শীর্ষক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, উদীয়মান মৌলবাদ ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও নরমপন্থী ইসলামের প্রতি হুমকি হিসেবে দেখা দিচ্ছে। *Times Megazine* ২ ডিসেম্বর, ২০০২ সংখ্যায় *'Terror in Asia'* শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করে যে, ঢাকায় দেড়শত তালেবান ও আল কায়েদা যোদ্ধা রয়েছে, এবং বাংলাদেশ ইসলামি জিহাদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠতে পারে।[২০] এছাড়া ২০০৫ সালের জানুয়ারিতে *নিউইয়র্ক টাইমস ম্যাগাজিন* বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গিদের উত্থান নিয়ে একটি সরেজমিন রিপোর্টি করেছিল। যার শিরোনাম ছিল *'দি নেক্সট ইসলামি রেভ্যুলেশন'?* রিপোর্ট-এর লেখিকা এলিজা গ্রিসউন্ড লিখেছিলেন, 'স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার বা পাকিস্তানের সীমান্তবর্তী প্রদেশ কিংবা এলাকাসমূহ সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব বিস্তারের অভয়ারণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। দেশগুলো নিজেদের রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশ থেকেই এদের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইসলামি গোষ্ঠীগুলো জিহাদের কেন্দ্র আফগানিস্তানে সংগঠিত হতে থাকে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিপদজ্জনক হচ্ছে হরকাতুল জিহাদ। এর মূল নেতা ফজলুর রহমান, তিনি ১৯৯৮ সালে ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে আন্তর্জাতিকভাবে সমন্বিত জিহাদের ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। ঐ ঘোষণা আল কায়দাকে বহির্বিশ্বে পরিচিত করেছে। বাংলা ভাই ও অন্য ইসলামি গোষ্ঠীগুলো এরপর থেকে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে এবং তারা ক্ষমতা দখলের জন্য সক্রিয় চেষ্টাও চালায়।'[২১]

বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনগুলোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলোর লক্ষ্য হলো দেশে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।[২২] অর্থাৎ এটা স্পষ্ট যে, জঙ্গি দলগুলোর লক্ষ্য রাজনৈতিক। আর এ রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা যথেষ্ট সক্রিয়। তারা তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য 'জিহাদী' বা ধর্মযুদ্ধের মতাদর্শকে ব্যবহার করে। তারা জিহাদের জন্য দাওয়াত, বক্তৃতা, ধর্মীয় আলোচনা, প্রচারণা এবং প্রচারপত্রের বিলি প্রভৃতি কাজ করে থাকে। জিহাদের অর্থ বলতে তারা বোঝায় যে, ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় সশস্ত্র আন্দোলন। আর তাদের সশস্ত্র আন্দোলনের পথপরিক্রমার মাধ্যম হলো গ্রেনেড ও বোমা হামলা এবং অন্য যেকোন উপায়ে হত্যা করা।[২৩]

বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনগুলোর পরিচয়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে চিহ্নিত কিছু সংগঠন, পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশ কর্তৃক সরকারি ও বেসরকারিভাবে তালিকাভুক্ত কিছু সংগঠন এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও কিছু আন্তর্জাতিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রাপ্ত তথ্য থেকে কিছু সংগঠনের নাম ধর্মীয় উগ্রপন্থী সংগঠন বা জঙ্গি সংগঠন হিসেবে দেশে-বিদেশে চিহ্নিত হয়েছে। এ সংগঠনগুলোকেই মূলত বাংলাদেশে ধর্মীয় উগ্রপন্থী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ২০০৫ সালের ২১ আগস্ট *The Daily Star* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় যে, দেশে ৩০টি ইসলামি জঙ্গি সংগঠন রয়েছে।[২৪] তবে বাংলাদেশে যে ইসলামি জঙ্গি দলগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো- হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজিবি), জামা'য়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি), জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি), আল্লাহর দল, হিজবুত তাওহীদ প্রভৃতি।[২৫] প্রখ্যাত উপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ লিখেছিলেন, 'এ দেশে শস্যের চেয়ে টুপির সংখ্যা বেশি'। বাংলাদেশে আজ প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের চেয়ে জঙ্গি সংগঠনের সংখ্যা বেশি। মাত্র ১৫/১৬ বছরে এর উত্থান। আগে প্রতিষ্ঠিত কোন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় এরা কাজ করতো, এখন প্রকাশ্যে মাঠে নেমেছে।[২৬] বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনগুলোকে মূলত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : (ক) বাংলাদেশী ইসলামি মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনসমূহ এবং (খ) বাংলাদেশে অবস্থানরত আরাকানি জঙ্গিসংগঠনসমূহ। নিম্নে তাদের তালিকা প্রদান করা হলো :

ক. বাংলাদেশী ইসলামি মৌলবাদী জঙ্গি সংগঠনসমূহের তালিকা

জামা'আতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি) (নিষিদ্ধ ঘোষিত), হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজিবি), শাহাদৎ-ই-আল হিকমা বাংলাদেশ, আহলে হাদীস আন্দোলন বাংলাদেশ (আহাব), হিজবুল তওহিদ, আল হারাত আল- ইসলামিয়া, জামায়াতুল ফালাইয়া, আল মারকাজুল

আল ইসলামী, বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট, জুম্মাহুল আল সাদাত, শাহাদাৎ-ই- নবুয়ত, আল্লাহর দল, জইশে মোস্তফা বাংলাদেশ, আল জিহাদ বাংলাদেশ, ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ, জইশে মোহাম্মদ, ইসলামিক ফ্রন্ট, জিহাদ জইশে মোহাম্মদ, ইন্টারন্যাশনাল খতমে নবুয়ত মুভমেন্ট, জামাত-আস-সাদৎ, আল খিদমৎ, জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি), হিজবুল্লাহ ইসলামি সমাজ, মুসলিম মিল্লাত শরিয়া কাউন্সিল, হিজবুল মাহাদি, বাংলাদেশ সন্ত্রাস বিরোধী দল (বাসবিদ), হিজবুত তাহরীর (যুক্তরাজ্যে নিষিদ্ধ ঘোষিত), আল কায়েদা, আল ইসলাম মার্টিয়ার্স বিগ্রেড, আমরা ঢাকাবাসী, জমিয়তে আহলে হাদীস আন্দোলন, জমিয়াতুল এহহিয়া-উৎ-তুরাজ, হায়াতুল ইগাছা, সত্যবাদ, আহলে হাদিস যুবসংঘ, আনযুমানে তালামিয়ে ইসলামিয়া, তাহফিজে হারমাইন পরিষদ, আইয়াম্মা পরিষদ, আল হারমাইন, খেদমতে ইসলাম, হিফাজতে খতমে নবুয়ত, ইয়ং মুসলিম, রিভাইভাল অব ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি (আর আই এইচ এম), আল জাজিরা, ইসলামী জিহাদ গ্রুপ, ইসলামী সৈন্য, আহলে হাদীস তাবলিগে ইসলাম, ইসলাহুল মুসলেমিন পরিষদ বাংলাদেশ, আল-হারকাত-আল-ইসলামিয়া, ইসলামিক সলিডারিটি ফ্রন্ট, জাগ্রত আস- শাহাদাৎ, জামায়াতে ইয়াহিয়া (নিষিদ্ধ ঘোষিত), লস্কর-ই-জঙ্গি, লস্কর-ই-তৈয়বা।[২৭] তবে অধ্যাপক আবুল বারকাত একটি গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, বাংলাদেশে জঙ্গি কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট অথবা জঙ্গিবাদ সমর্থনকারী ইসলামি সংস্থাসমূহের সংখ্যা ১৩২টি।[২৮]

খ. বাংলাদেশে অবস্থানরত আরকানি জঙ্গি সংগঠনসমূহের তালিকা

আরাকান রোহিঙ্গা ফোর্স, ইসলামিক সলিডারিটি ফ্রন্ট, আরাকান পিপলস আর্মি, লিবারেশন মায়ানমার ফোর্স, আরাকান মুজাহিদ পার্টি, রোহিঙ্গা ইনডিপেনডেন্স ফোর্স, রোহিঙ্গা ইনডিপনডেন্স আর্মি, রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট, রোহিঙ্গা সলিডারিটি অরগানাইজেশন, রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট, রোহিঙ্গা মুজাহিদ পার্টি, মুজাহিদ পরিষদ, আরাকান ন্যাশনাল ইসলামিক অর্গানাইজেশন, ইসলামী গণ-আন্দোলন।[২৯]

বাংলাদেশের দু'টি প্রধান জঙ্গি সংগঠনের পরিচয় ও তাদের কার্যক্রম

বাংলাদেশের জঙ্গি দলগুলোর প্রচারণা থেকে জানা যায় যে, তাদের সবারই মূল লক্ষ্য হলো দেশে একটি ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।[৩০] আর এর জন্য তারা ইসলামের জিহাদী মতাদর্শকে ব্যবহার করছে। জঙ্গিবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন গবেষণাকর্মের রিপোর্ট, সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে জানা যায় যে, ১৯৯৯ সাল থেকে বাংলাদেশে জিহাদের নামে যে সহিংসতা চালানো হচ্ছে সেগুলোর অধিকাংশের

সঙ্গে মূলত হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজিবি) এবং জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) সংগঠন দু'টি বিশেষভাবে জড়িত। নিম্নে প্রধান এ দু'টি জঙ্গি সংগঠনের পরিচয় ও তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজিবি)

'বাংলাদেশে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ' (হুজিবি)-এর উৎপত্তি মূলত ৯০-এর দশকের শুরুর দিকে। তবে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, ১৯৮৮ সালে মুফতি আব্দুর রহমান ফারুকের নেতৃত্বে যশোরে এ সংগঠনটি যাত্রা শুরু করে। ধারণা করা হয় যে, আফগানিস্তান থেকে ফিরে আসা বাংলাদেশী মুজাহিদরা হুজিবি প্রতিষ্ঠা করে। হুজিবি একটি আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন। ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট বাংলাদেশ সরকার এ সংগঠনটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ২০০৮ সালের মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ সংগঠনটিকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে ঘোষণা করেছে।

বাংলাদেশে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হুজিবির অন্যতম লক্ষ্য। এ সংগঠনের অনেক সদস্যের আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশে যুদ্ধ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক গ্রেফতারকৃত হুজিবি সদস্যদের মাধ্যমে জানা যায় হুজিবির সঙ্গে পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন 'লস্কর-ই-তৈয়বার' যোগাযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে হুজিবির বর্তমান নেতা মুফতি আব্দুল হান্নান। মুফতি হান্নান গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করে। যশোরের গহরডাঙ্গা মাদ্রাসায় পড়াশুনার পর উচ্চ শিক্ষার জন্য সে পাকিস্তানে যায়। পরবর্তীতে হান্নান ছয় বছর ভারতের দেওবন্দ মাদ্রাসায় পড়াশুনা করে। ১৯৮৪-৮৫ সাল পর্যন্ত সে আফগানিস্তান ও কাশ্মীরে যুদ্ধের জন্য যুবক নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করতো। আফগান যুদ্ধে হান্নান 'হরকাতুল মুজাহিদের' সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। যুদ্ধ শেষে সে দেশে ফিরে আসে এবং বাংলাদেশে হাফিজিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৮৮ সাল থেকে হান্নান হুজিবির সাথে কাজ শুরু করে এবং গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণসহ অস্ত্র পরিচালনা, বোমা ও গ্রেনেড তৈরির প্রশিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। পুলিশের অনুসন্ধান থেকে জানা যায় মুফতি হান্নান ১৯৯৯ সালের পর থেকে হুজিবি কর্তৃক সংঘটিত অধিকাংশ বোমা ও গ্রেনেড বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত।[৩১] ২০০৫ সালের ১ অক্টোবর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা হান্নানকে গ্রেফতার করে। হান্নান বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার জনসভায় (২১ আগস্ট ২০০৪) বোমা হামলার অভিযোগে অভিযুক্ত। এছাড়াও

হান্নানের বিরুদ্ধে গোপালগঞ্জে শেখ হাসিনার জনসভাস্থলের সন্নিকটে বোমা পুতে রাখার অভিযোগও রয়েছে।[৩২]

হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজিবি) যেসকল স্থানে গ্রেনেড ও বোমা হামলা করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : উদীচীর কেন্দ্রীয় সম্মেলনে বোমা হামলা (১৯৯৯), সিপিবি-এর র‍্যালিতে বোমা বিস্ফোরণ (২০০১), রমনা বটমূলে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে গ্রেনেড হামলা (২০০১), ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর উপর গ্রেণেড হামলা (২১মে ২০০৪), যশোরে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা (২০০৫), শাহ এস এম কিবরিয়া হত্যা (২০০৫)। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, হুজিবি বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও ২০০৮ সালের মে মাসে তারা 'ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি' নামে আত্মপ্রকাশ করে। তারা নির্বাচন কমিশনে দলটির নিবন্ধনের জন্য আবেদনও করে। দলের আহ্বায়ক করা হয় আফগানিস্তান থেকে ফিরে আসা মুজাহিদ কমান্ডার শেখ আবদুস সালামকে। এসময় সারাদেশে ৫২টি জেলা ও ২২৫টি উপজেলায় তাদের সংগঠনের আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয়।[৩৩] উল্লেখ্য যে, হুজিবি ২০০৪ সালের ২১ মে সিলেটে তৎকালীন ব্রিটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর উপর গ্রেনেড হামলা চালায়। এতে বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গি সংগঠনের অবস্থিতি বিশ্বব্যাপী পরিদৃষ্ট হয়। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার চাপে শেষ পর্যন্ত ২০০৫ সালের অক্টোবর মাসে বাংলাদেশ সরকার হুজিবি সংগঠনটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।[৩৪]

জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)

১৯৯৮ সালে হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজিবি) থেকে পৃথক হয়ে শায়খ আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) প্রতিষ্ঠিত হয়। আব্দুর রহমানের পিতার নাম আব্দুল্লাহ ইবনে ফজল। শায়খ আব্দুর রহমান 'আহলে হাদীস' সম্প্রদায়ের লোক। আবদুর রহমান সৌদি আরবের মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর পড়াশুনা করে। মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সময় ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশে ফেরত আসার পর আব্দুর রহমান চাকরি এবং ব্যক্তিগত ব্যবসার পাশাপাশি নিজেকে জিহাদি চেতনায় তৈরি করতে থাকে। ১৯৯৮ সালে যাত্রাবাড়ী মোহাম্মদীয়া আরাবিয়া মাদ্রাসার কিছু ছাত্র বাংলাদেশে একটি জিহাদী সংগঠন গড়ে তোলার জন্য আলোচনায় বসেন। আলোচনা শেষে সর্বসম্মতিক্রমে শায়খ আবদুর রহমান নামহীন এ জিহাদী সংগঠনের আমির নির্বাচিত হয়। পরবর্তীকালে তারা দাওয়াতকে সংগঠনের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির উপায় হিসাবে বেছে নেয়। যখন দাওয়াতের মোটামুটি সাড়া পাওয়া যায়, তখন সংগঠটির নামকরণ করা হয়

'জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ' (জেএমবি)।[৩৫] তবে ১৭ আগস্ট, ২০০৫ সালে দেশব্যাপী একযোগে বোমা হামলার পূর্বপর্যন্ত এ সংগঠনটি সম্পর্কে বিস্তারিত তেমন কিছু জানা যায়নি। বিভিন্ন সংবাদপত্রে জেএমবি সম্পর্কে প্রথম তথ্য প্রকাশিত হয় ২০০২ সালে, যখন পুলিশ দিনাজপুর থেকে অস্ত্রসহ ৮ জন জেএমবির সদস্যকে গ্রেফতার করে। ১৯৯৮ সালে জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর মজলিসে শূরা গঠিত হওয়ার পর শূরা সদস্যরা তাদের সদস্য ও কর্মী তৈরির জন্য সারাদেশে তাদের সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে। তারা তাবলিগের মাধ্যমে প্রচার কার্য, ধর্মীয় আলোচনা, বক্তৃতা ও দাওয়াতের মাধ্যমে তাদের কর্মী সংগ্রহ করতে থাকে। এভাবে জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর সদস্য সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বাড়তে থাকে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, ২০০৮ সালে জেএমবির সদস্য সংখ্যা ছিল ১০,৯৮৯ জন।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় যে, এ দলটি মূলত আব্দুল ওয়াহাবের মতাদর্শ এবং ইবনে তাইমিয়ার লেখনি দ্বারা উদ্বুদ্ধ। ইবনে তাইমিয়ার মতে- 'যেসকল মুসলিম শাসক তাদের নিজ দেশের শাসন ব্যবস্থায় ইসলামিক আইন প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়, সেখানে বিদ্রোহ আব্যশক'। এছাড়া তিনি আরও মত প্রকাশ করেন যে, 'প্রকৃত ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা ছাড়া কোনো মুসলিম সমাজ বিরাজমান থাকতে পারে না।' এ ধরনের ব্যাখ্যা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) মনে করে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক কাঠামো ও সংবিধান, সেখানে কোরআন ও হদীসের কোনো প্রয়োগ নেই। অধিকন্তু এসব মানুষের তৈরি আইন, যা ইসলাম বিরোধী। তাদের মতে এ ধরনের কাঠামো থেকে মুক্তির জন্য ইসলামিক স্বশস্ত্র বিপ্লবের বিকল্প নেই।[৩৬]

জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) কর্তৃক পরিচালিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ ময়মনসিংহে সিনেমা হলে বোমা হামলা (২০০২), ফাইলা পাগলার মাজারে বোমা হামলা (২০০৩), অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ হত্যা চেষ্টা (২০০৪), মনোয়ার হোসেন বাবু হত্যা (২০০৪), ময়মনসিংহে উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর উপর বোমা হামলা (২০০৫), অধ্যাপক ইউনুস হত্যা (২০০৫), ঝালকাঠিতে বিচারক হত্যা (২০০৫), ১৭ আগস্ট (২০০৫) দেশব্যাপী একযোগে ৫০০টি বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি।[৩৭] এছাড়া আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর রেকর্ড পর্যালোচনা করে এবং গ্রেফতারকৃত জেএমবি সদস্যদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায় যে, তারা ২০০০ সালের প্রথম থেকেই দেশব্যাপী এলাকাভিত্তিক পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ, বোমা বিস্ফোরণ, এনজিও ও ব্যাংক ডাকাতি, হত্যা ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।[৩৮] এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য যে,

জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) ও জেএমজেবি (জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ) মূলত একই সংগঠন। জেএমজেবি-এর নাম ২০০৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে জানা গেলেও এরও বেশ কিছু দিন আগ থেকেই সংগঠনটি সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাইয়ের নেতৃত্বে তাদের কার্যক্রম শুরু করে।[৩৯] উল্লেখ্য যে, জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর সাংগঠনিক প্রধান ছিল শায়খ আব্দুর রহমান এবং দ্বিতীয় প্রধান ছিল সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাই। সিদ্দিকুল ইসলাম আফগানিস্তানের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর সকল কর্মকাণ্ডে সে নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী ছিল। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বাম চরমপন্থীদের যে সন্ত্রাসী তৎপরতা বিরাজমান ছিল তা দমনের জন্য এ সংগঠনটির উত্থান হয় বলে প্রথম দিকে প্রচার করা হয়। কিন্তু বাংলা ভাই সন্ত্রাসীদের উৎখাত করার নামে বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। দেশে ইসলামি বিপ্লব ঘটানোই ছিল সংগঠটির প্রধান লক্ষ্য। বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি জেএমবি ও জেএমজেবি দু'টি সংগঠনকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, জেএমবি উত্তর-পশ্চিম বাংলায় ৩ মাসের যে রাজত্ব করেছে, তাতে তাদের হাতে নিহত হয়েছে ২২ জন, পঙ্গুত্ববরণ করেছে ৩৫১ জন, অমুসলিমদের মধ্যে দেশত্যাগ করেছে ৭৫০ জন, ধর্ষিত হয়েছে ১৭৮ জন, অগ্নিসংযোগ ঘটেছে ২৮০টি বাড়িতে, জোরপূর্বক বিনা মজুরিতে কাজ করিয়ে নিয়েছে ২৫০ জনকে দিয়ে আর জোরপূর্বক টাকা আদায় করেছে আনুমানিক ৯০০ কোটি। এছাড়া তারা অমুসলিমদের উপর নিজস্ব পদ্ধতিতে কিছু জরিমানা ধার্য করেছিল। যেমন, (১) হিজাব না পড়ার জন্য ও কপালে সিঁদুর পড়ার জন্য হিন্দু মহিলাদের জরিমানা ৫০০ টাকা, (২) মুসলমানদের নামাজ পড়ার সময় হিন্দুদের পূজার ঢোলের বাজনার শব্দের জন্য ১০০০০ টাকা এবং (৩) মুসলমানদের না জানিয়ে হিন্দু মেয়ের বিয়ের জন্য ২০০০০ টাকা।[৪০]

এছাড়া ২০০৮ সালে 'ইসলামী সমাজ' নামে একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। সংগঠনটিকে ইসলামী জঙ্গি সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। কারণ, তাদের বক্তব্যে কথায় জঙ্গি তৎপরতার ইঙ্গিত রয়েছে এ মর্মে সংবাদপত্রগুলোতে খবর ছাপা হয়েছে। ২০০৮ সালের ১২ আগস্ট 'দৈনিক যায়যায়দিনকে' এ সংগঠনের নেতারা জানায় যে, গণতন্ত্র মানব রচিত তন্ত্র, যা শিরক কুফরি ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় চলার পরিণতি জাহান্নাম। তারা আরো জানায় যে, তারা ইসলামি সমাজের আদর্শ প্রচার করতে চান বিশ্বাসের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে শিথিলতা বজায় রাখা হচ্ছে এবং বিপ্লবী

মানুষকে দাওয়াত দিতেই তারা মাঠে নেমেছে।[৪১] এ থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলো এখনও তাদের কার্যক্রম ও কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

জঙ্গি সংগঠনগুলোর কর্মকৌশল

বাংলাদেশের ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলোর কাজের ধরন ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে তাদের কার্যক্রমকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (১) সাংগঠনিক কার্যক্রম, (২) অভিযানমূলক কার্যক্রম। এ দু'ধরনের কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে জঙ্গি সংগঠনগুলোর কার্যক্রমের এলাকাগুলোকেও দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: (১) সাংগঠনিক এলাকা এবং (২) কৌশলগত এলাকা। সাংগঠনিক এলাকাতে জঙ্গিদলগুলো তাদের সার্বিক সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। জঙ্গি দলগুলোর সাংগঠনিক কাজগুলো হচ্ছে- নিজেদের দলীয় অবস্থান শক্তিশালী করা ও সুসংগঠিত করা, দলের সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ রাখা এবং দলের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কর্মী নিয়োগ করা, অস্ত্রশস্ত্রের মওজুদ বৃদ্ধি করা, সদস্যদের অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ প্রদান, ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে জিহাদী মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রচারণা চালানো ইত্যাদি। অপরদিকে জঙ্গি সংগঠনগুলো অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ ও অনগ্রসর এলাকাগুলোকে তাদের কৌশলগত অঞ্চল হিসাবে বেছে নেয়। আর সেখান থেকে তারা তাদের জিহাদী ও সহিংস কার্যক্রম পরিচালনা করে।

জঙ্গি সংগঠনগুলোর সাংগঠনিক এলাকা সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত হলেও দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলোর প্রত্যন্ত গ্রাম, চর ও হাওর এলাকাগুলো তাদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আইন–শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে এসকল এলাকাগুলোতে পৌঁছাতে বেশ সময় লাগে। আর এ ফাঁকে জঙ্গিরা সহজেই আত্মগোপন করতে পারে। এজন্য তারা এ সকল অঞ্চলগুলোকে সাংগঠনিক কার্যক্রমের জন্য অধিক উপযুক্ত মনে করে। অন্যদিকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে জনগণের শিক্ষার হার অনেক কম। এজন্য তারা আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অনেক পিছিয়ে। আর এ সুযোগে জঙ্গি সংগঠনগুলো সহজেই তাদেরকে জিহাদী ধারণায় উদ্বুদ্ধ করতে পারে। মূলত এ দু'টি কারণেই তারা এসকল অঞ্চলকে তাদের সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বেছে নেয়। তারা এ সকল অঞ্চলগুলোতে ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা, বক্তৃতা ও দাওয়াতের মাধ্যমে কর্মী সংগ্রহ করে এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে।[৪২] মূলত এগুলোই তাদের মতাদর্শ প্রচার ও প্রসারের প্রধান কৌশল।

আর জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তারা পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের ও হাদীসের বিভিন্ন উদ্ধৃতি ব্যবহার করে । উদ্ধৃতিগুলো নিম্নরূপ :

(১) 'হে ঈমানদারগণ! নিজেদের হাতে অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়' । (সূরা নিসা, আয়াত-৭১)

(২) 'আল্লাহ্ ছাড়া কারোও বিধান দেওয়ার অধিকার নেই' । (সূরা ইউসুফ, আয়াত-৪০)

(৩) 'যারা ঈমানদার তারা লড়াই (সশস্ত্র জিহাদ) করে আল্লাহ্র রাহে পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে। সুতরাং তোমরা লড়াই (সশস্ত্র জিহাদ) করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে (দেখবে শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল)' । (সূরা নিসা, আয়াত-৭৬)

(৪) 'আল্লাহ্র আইনকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমার উম্মতের মধ্যে একটি ইজাবা (দল) সব সময় জিহাদ করে যাবে। তারা তাদের শত্রুদের প্রতি কঠোর হবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তারা কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজ চালিয় যাবে।' (সহীহ মুসলিম, ৪৮০/৫ ই: ফা:)[৪৩]

এছাড়া গণমাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিবেদন থেকে জানা যায় জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি), হরকাতুল জিহাদ ইসলামী বাংলাদেশ (হুজিবি) ও অন্যান্য দলের সদস্যরা নতুন সদস্য নিয়োগের জন্য জোর-জবরদস্তি ও ভীতি প্রদানের কৌশল অবলম্বন করে। জঙ্গি সংগঠনগুলো তাদের জিহাদী মতাদর্শ সংবলিত প্রচারপত্র, সিডি ও বইয়ের মাধ্যমে স্থানীয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে। তারা প্রচার করে যে, যারা তাদের মতাদর্শ গ্রহণ করবে না, তারা কাফির। ইসলামি শাসন কায়েমের জন্য তারা তাদের সাথে অন্যান্যদেরকে একাত্মতা প্রকাশ করার আহ্বান জানায়। তাদের জিহাদী বইগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- 'ইসলামের প্রকৃত পরীক্ষা', 'ইসলামের প্রকৃত সালাহ' প্রভৃতি। এসকল বইয়ে উল্লেখ আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ১০৭টি যুদ্ধে গেছেন। বইগুলোতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর অনুসারীদেরকে কাফির ও বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনার কথা বলেছেন। সর্বোপরি জঙ্গিরা প্রচার করে যে, বাংলাদেশে বর্তমানে যে ধরনের শাসন ব্যবস্থা, সমাজ ও সংস্কৃতি বিদ্যমান আছে তা ইসলাম বিরোধী। 'প্রকৃত ইসলামের ডাক' নামক প্রচারপত্রের মাধ্যমে তারা প্রচার করে যে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত ইত্যাদির চর্চা বিদ্যমান থাকলেও বাংলাদেশের অর্থনীতি, বিচার ব্যবস্থা ও অন্যান্য সামাজিক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মানুষের তৈরি আইন ও অনুশাসন মেনে চলা হয়। এজন্য

তারা মনে করে বাংলাদেশকে প্রকৃত ইসলামি রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে হলে জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ অত্যাবশ্যক।[৪৪]

জিহাদী মতাদর্শের প্রচার, কর্মী নিয়োগ, সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা ছাড়াও সদস্যদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান তাদের অন্যতম সাংগঠনিক কাজ। তাদের সামরিক প্রশিক্ষণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো- বোমা, গ্রেনেড ও অন্যান্য বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরি ও প্রয়োগের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দান। পাশাপাশি হালকা ও ভারি আগ্নেয়াস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ প্রদান। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 'হিজবুত তাহরীর' নামক একটি জঙ্গি সংগঠন ২০০৭ সালের ৪-৭ এপ্রিল একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে। যেখানে প্রায় পনেরশ (১৫০০) জন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করে। ঐ প্রশিক্ষণ কর্মশালায় পুরুষ সদস্যদের বোমা তৈরি ও বিস্ফোরণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আর মহিলা সদস্যদের জঙ্গি সংগঠনে কর্মী নিয়োগের কৌশলের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মো. আতিকুর রহমান তার 'বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ : কিছু প্রসঙ্গিক কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, 'জেএমবি তাদের প্রত্যেক সদস্যদের জন্য সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় শারীরিক কসরত, মার্শাল আর্ট, অত্যাধুনিক অস্ত্র প্রশিক্ষণ ছাড়াও ফিল্ড ক্রাফট এবং গোয়েন্দা বৃত্তির উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।'[৪৫]

জঙ্গি সংগঠনগুলোর সাংগঠনিক কাজের আরেকটি অন্যতম অংশ হলো অর্থনৈতিকভাবে নিজেদের সংগঠনের ভীত মজবুত ও সুসংগঠিত করা। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন থেকে ধারণা করা হয় মধ্যপ্রাচ্যের কতিপয় দাতব্য সংস্থা এ জঙ্গি সংগঠনগুলোকে প্রচুর পরিমাণে অর্থের যোগান দেয়। গ্রেফতারকৃত জেএমবির শীর্ষ ক্যাডাররা জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাদের অর্থের যোগানদাতাদের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু তথ্য প্রদান করেছে। জেএমবির ঢাকার আঞ্চলিক কমান্ডার এনায়েতুল্লাহ জানায় মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক একটি ইসলামি সংগঠনের আর্থিক সহায়তায় তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের সামরিক কমান্ডার জাবেদ ইকবাল ওরফে মোহাম্মদ জানায় যে, পাকিস্তান ও সৌদি আরবসহ কয়েকটি মুসলিম রাষ্ট্র জেএমবিকে আর্থিক সাহায্য দেয়। এছাড়া তাদের অর্থের অন্যান্য উৎস হচ্ছে সদস্যদের চাঁদা, ইয়ানতের টাকা, যাকাতের টাকা, এককালীন দান, চাঁদাবাজী প্রভৃতি। র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব)-এর উৎস থেকে জানা যায় দলের মাঠ পর্যায়ের সাথী ও সুধীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ইয়ানতের টাকাই ছিল জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর প্রথম পর্যায়ের অর্থের মূল উৎস।[৪৬] এছাড়া মূলধারার ইসলামি দলগুলো নানাভাবে ধর্মীয় উগ্রবাদীদের অর্থের জোগান দেয়। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ধর্মীয় উগ্রবাদী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীটির একটি অংশ ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের জনগণের সম্পদ ব্যাপকভাবে লুট করেছে। পরবর্তীতে তারা

বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে সুনির্দিষ্ট মতাদর্শ ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য ১৯৭০-৮০-এর দশকে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক অর্থ সহায়তা পেয়েছে। এসব অর্থ সম্পদ তারা সংশ্লিষ্ট আর্থ-রাজনৈতিক মডেল গঠনে বিনিয়োগ করেছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের বিনিয়োজিত প্রতিষ্ঠান উচ্চ মুনাফা লাভ করেছে। আর এ মুনাফার একাংশ তারা ব্যয় করেছে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে, একাংশ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রসারে, আর একাংশ নতুন নতুন খাত-প্রতিষ্ঠান সৃস্টিতে। এখানে উল্লেখ্য যে, তারা তাদের মোট মুনাফার একাংশ সরকারের কাছে কর্পোরেট কর প্রদানের আগেই তাদের সৃষ্ট আপাতদৃষ্টিতে জনকল্যাণমূলক কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাদেরই মতাদর্শগত প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ট্রাস্ট ও ফাউন্ডেশনে স্থানান্তর করেছে।[৪৭]

আর জঙ্গি সংগঠনগুলোর অভিযানমূলক ও আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ডের মধ্যে অন্যতম হলো- বোমা ও গ্রেনেড হামলা এবং অন্য যে কোন উপায়ে টার্গেটকৃতদের হত্যা করা। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৯৯ সাল থেকে বারবার তাদের সহিংসতার লক্ষ্যবস্তু ছিল সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনাসমূহ ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংগঠনের অনুষ্ঠানসমূহ। যেমন, বিচার বিভাগ (আদালত), এনজিও অফিস, সরকারি ভবন, সহকারী কমিশনার ও ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়, প্রেসক্লাব, সিনেমা হল, বিভিন্ন মাজার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতি।[৪৮] উপরিউক্ত অফিস ও প্রতিষ্ঠানসমূহে তাদের আক্রমণের মূল কারণ হলো- রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব দখলের লক্ষ্যে সংস্কৃতি-ধারায় পরিবর্তন আনা, যা তাদের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। এজন্য তাদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ধর্ম-বর্ণ-পেশা-নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মুক্তচিন্তার মানুষ, সরকারি প্রশাসন যন্ত্র, বিচার বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ (যেমনঃ জেলা প্রশাসন ও আদালত); ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত নয় এমন সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান যেমন সিনেমা হল, থিয়েটার, যাত্রামঞ্চ, বাজারঘাট, ডিপার্টমেন্টাল স্টোর, কমিউনিটি সেন্টার, জনসমাবেশ, শিক্ষালয়, লাইব্রেরি; ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট কিন্তু জামায়াতে ইসলামী-এর রাজনীতি বিরোধী অথবা ওয়াহাবি মতবাদ বিরোধী প্রতিষ্ঠান যেমন, সুফি সমাধিস্থল, মাজারকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।[৪৯] মূলত উগ্রবাদী ও ইসলামি জিহাদী চিন্তা-চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় তারা উপরিউক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। আর এর মাধ্যমে তারা হত্যা করেছে বিচারক, আইনজীবী, অধ্যাপক এবং নিরীহ মানুষ। ১৯৯৯ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত জঙ্গি সংগঠনগুলো প্রায় ৩২ বারের মতো বোমা বিস্ফোরণ ও অন্যান্য সহিংস ঘটনা ঘটিয়েছে।[৫০]

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলসমূহের ধর্মীয় উগ্রবাদী কার্যক্রম ও জঙ্গিবাদে পৃষ্ঠপোষকতা

ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, জঙ্গি সংগঠনগুলো ১৯৯৯ সাল থেকে নাশকতা ও সহিংস কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত করেছে। কিন্তু ২০০১ সালের পর জঙ্গি সংগঠনগুলো বাংলাদেশের ইসলামিক রাজনৈতিক দলগুলোর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন লাভে সক্ষম হয়। উল্লেখ্য যে, ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি), জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ, ইসলামী ঐক্যজোট ও জাতীয় পার্টির একাংশ নিয়ে চার দলীয় জোট গঠিত হয়। উক্ত জোট নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করে। বিএনপি-এর নেতৃত্বে ২০০১ সালে ৬০ সদস্যের যে মন্ত্রীসভা গঠন করা হয় তাতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর দু'জন সদস্য মন্ত্রী হন। তারা পর্যায়ক্রমে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করেন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী বলেন, ইসলামি বিপ্লব সাধন করতে তার দল ক্ষমতার অংশীদার হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি বিএনপিকে মনে করিয়ে দেন যে, চার দলীয় ঐক্যজোট হওয়ার কারণে তারা নির্বাচনে জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এ জোট না থাকলে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এসে ইসলামের ক্ষতি করবে। গত নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের ফলাফলেই প্রতীয়মান হয় যে, ওরা (আওয়ামী লীগ) ক্ষমতায় আসছে।[৫১] জোটের অন্য মৌলবাদী দলসমূহের জোট ইসলামী ঐক্যজোট নেতা মুফতি ফজলুল হক আমিনী (এমপি) ইসলাম বিরোধী আইন বাতিল ও ইসলামি আইন সংযোজনের দাবি জানিয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন যে, সরকার ইসলাম বিরোধী কাজ করলে আমরা বিকল্প ব্যবস্থা নেব।[৫২] কিন্তু জোট সরকারের শাসনামলে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কিংবা ইসলামী ঐক্যজোট-এর নেতৃবৃন্দ জাতীয় সংসদ, মন্ত্রীসভা বা চার দলীয় জোটের কোন ফোরামে দেশে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার কোন প্রস্তাব উত্থাপন করেননি বা কোরআন-হাদীস ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনার কথাও কখনো কোথায়ও বলেননি। এদিকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা করেন যে, জোট সরকার আগামী পনের বছর ক্ষমতায় থাকবে। ক্ষমতায় থাকার জন্য ইসলামি দলগুলোর নিরবচ্ছিন্ন সমর্থনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর উপরিউক্ত যুক্তি সমর্থন করেন। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর চাহিদা মোতাবেক পর্যায়ক্রমে কৃষি, শিল্প ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মতো অতি গণসম্পৃক্ত তিনটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব তাদের হাতে অর্পণ করা হয়। ফলে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন এবং সমাজ কল্যাণের নামে রাজনৈতিক ও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিজেদের সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সমর্থনের ভিত্তি মজবুত করতে থাকে।[৫৩] এছাড়াও স্বারাষ্ট্র ও শিক্ষা মন্ত্রালয়সহ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের উপর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল।

জোট সরকারের অধীনে ইসলামপন্থী দলগুলো ক্ষমতার অংশীদার হয়ে প্রথমে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির উপর নতুনভাবে আক্রমণ শুরু করে। পাকিস্তান আমলে তারা অমুসলিম কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত ও নাটককে পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থী বলে নিষিদ্ধ করেছিল, আর বাংলাদেশে তারা মুসলিম লেখকদের সাহিত্য ও শিল্পকর্মকে অনৈসলামিক অপবাদ দিয়ে ধ্বংস করতে চায়। সিলেট ও খুলনাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর বিখ্যাত উপন্যাস 'লাল সালু' অবলম্বনে নির্মিত 'লাল সালু' ছায়াছবির প্রদর্শনী বন্ধ করতে স্থানীয় প্রশাসনকে বাধ্য করে। কারণ, তাতে ভণ্ড পীরের ধর্মব্যবসা সম্পর্কে কটাক্ষ ছিল। উল্লেখ্য যে, ২০০১ সালের জাতীয় চলচ্চিত্র প্রতিযোগিতায় 'লাল সালু' শ্রেষ্ঠ ছবি, শ্রেষ্ঠ কাহিনী, শ্রেষ্ঠ পরিচালকসহ ৮টি শাখায় পুরস্কার লাভ করে। তারেক মাসুদ নির্মিত 'মাটির ময়না' ছবিটিও জোট সরকারের রোষানলে পড়ে। মাদ্রাসা শিক্ষার সমালোচনা থাকায় মৌলবাদী দৃষ্টিকোন থেকে ছবিটিকে ছাড়পত্র দিতে আপত্তি করা হয়। অথচ ছবিটি ফ্রান্সের আন্তর্জাতিক কান চলচিত্র উৎসবে প্রদর্শিত হবার বিরল গৌরব অর্জন করে।[৫৪]

এরপর দিনাজপুরের ঐতিহ্যবাহী রূপাঞ্জনা মেহেদী উৎসবকে অনৈসলামিক বলে ব্যাখ্যা দেয় স্থানীয় ইমাম সমিতি। তারা এর প্রকাশ্য বিরোধিতা করে এবং আয়োজকদেরকে মৌলবাদীরা টেলিফোনে বোমা হামলার হুমকি প্রদান করে।[৫৫] অপরদিকে 'তৌহিদী জনতা' নামক একটি মৌলবাদী জঙ্গি গোষ্ঠীর বাঁধার মুখে নেত্রকোনায় পশ্চিম বাংলা থেকে আগত মহিলা ফুটবল দলের একটি প্রদর্শনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। তারা মহিলাদের ফুটবল খেলাকে নাযায়েজ ঘোষণা করে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যে আগত ফুটবল দলের সদস্যরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে তড়িঘড়ি করে পালিয়ে যায়।[৫৬] মৌলবাদীদের বাঁধার মুখে ঢাকায় মহিলা ফুটবল প্রতিযোগিতা (২০০৪) অনুষ্ঠিত হলেও মহিলা সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

ইসলামি মৌলবাদীরা এক পর্যায়ে দেশের ইসলাম ধর্মের ভিন্ন মতের অনুসারীদের ও তাদের উপাসনালয়ের উপর আক্রমণ শুরু করে। জামায়াতে ইসলামী দলটি আহমদিয়া বা কাদিয়ানি সম্প্রদায়কে মুসলমান বলে অস্বীকার করে। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তানে ১৯৫৩ সালে আহমদিয়া বিরোধী দাঙ্গায় প্রায় ৫০ হাজার মুসলমান নিহত হয়। সে দাঙ্গার অপরাধে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠাতা নেতা সাইয়েদ আবুল আলা মওদুদী আদালতের রায়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট আইউব খান মওদুদীকে ক্ষমা প্রদর্শন করলে তার প্রাণদণ্ড রহিত হয়। উল্লেখ্য যে, সৌদি আরব এ ব্যাপারে তখন মধ্যস্থতা করে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী দলটি আহমদিয়া বিরোধী আদি অবস্থান থেকে কখনও সরে আসেনি। ২০০১ সালে জোট সরকারের শরিক হয়ে জামায়াতে ইসলামী

বাংলাদেশ দলটি ও অন্যান্য ইসলামি মৌলবাদীরা ধর্মীয় বিশুদ্ধতা রক্ষার নামে নতুন উদ্যমে আহমদিয়া সম্প্রদায়কে অমুসলমান ঘোষণার জোর দাবি উত্থাপন করে। মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোর প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ও মদদে গঠিত 'খতমে নবুয়ত আন্দোলন সমন্বয় কমিটি' আহমদিয়া উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে। ঢাকার তেজগাঁও ও বকশীবাজার, চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, বগুড়া, সাতক্ষীরাসহ বিভিন্ন স্থানে আন্দোলনকারীরা লাঠিসোটা নিয়ে প্রকাশ্যে আহমদিয়াদের উপর আক্রমণ করে, তাদের মসজিদ কমপ্লেক্স ঘেরাও করে এবং জোর করে মসজিদের সাইনবোর্ড পরিবর্তন করে 'উপাসনালয়' লিখে দেয়। চট্টগ্রামে 'খতমে নবুয়ত কমিটি' ফতোয়া জারি করে যে, আহমদিয়ারা কতলযোগ্য। ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে আহমদিয়া মসজিদে পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করা হয় এবং একই সঙ্গে রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে বোমা হামলা চালানো হয়। কিন্তু তৎকালীন সরকার এসব দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে কোনরূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। বরং বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের ২০টি প্রকাশনা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো এসব মানবাধিকার বিরোধী কার্যকলাপের ক্ষীণ প্রতিবাদ করেই তাদের কর্তব্য শেষ করে। তবে সুশীল সমাজের কিছু নেতৃস্থানীয় সদস্য, আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন বাম সংগঠনের কিছু নেতৃবৃন্দ এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূতগণ ঘটনাস্থলে (ঢাকায়) গিয়ে অসহায় ও অবরুদ্ধ আহমদিয়াদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে অবশ্য এক রিট পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট আহমদিয়াদের প্রকাশনার উপর জারিকৃত নিষেধাজ্ঞা স্থগিত করে। কিন্তু আন্দোলনকারীরা আহমদিয়া সম্প্রদায়কে অমুসলমান ঘোষণার দাবি অব্যাহত রাখে।[৫৭] এভাবে তারা কোনো মানুষ বা সম্প্রদায় (আহমদিয়া সম্প্রদায়) মুসলমান কি-না তা নির্ধারণের দাবি করে, যা সার্বজনীন মানবাধিকার ও সংবিধানের পরিপন্থী। এমনকি, যারা তাদের (ইসলামপন্থী দলগুলোকে) মৌলবাদী বলে আখ্যায়িত করে তারা মুসলমান কি-না? আন্দোলনকারীরা সে প্রশ্নও উত্থাপন করে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর নেতা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (তৎকালীন এমপি) বলেন, যেসব সাংবাদিক মুসলমান মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ইসলামপন্থীদের মৌলবাদী লেখেন তারা মুসলমান কি না তা জানার জন্য তাদের রক্ত পরীক্ষা করা উচিত।[৫৮] দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী আরও ঘোষণা করেন, অমুসলিমদের উপাসনা মূর্তি ছাড়া দেশের অন্য সব মূর্তি (ভাস্কর্য) ভেঙে ফেলা হবে। তিনি আরো বলেন- কোর্ট দিয়ে ফতোয়া নিয়ন্ত্রিত হবে না, ফতোয়া দিয়ে কোর্ট নিয়ন্ত্রিত হবে।[৫৯] এ ঘোষণার পর দেশের কোথাও কোন ভাস্কর্য ভাঙা হয়নি, কিন্তু দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু মন্দির ও বৌদ্ধ বিহারে হামলা ও বিগ্রহ ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনার মধ্যে ঢাকার শাঁখারি বাজারে হিন্দু মন্দিরে বিগ্রহ ভাঙচুর,

কক্সবাজারের উখিয়া বৌদ্ধ মন্দির আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া, গলাচিপায় হিন্দুদের পূজার ১১টি মূর্তি ভাঙচুর, মানিকগঞ্জ ও রংপুরে হিন্দু মন্দিরে আগুন, নান্দাইল ও পটিয়ায় প্রতিমা ভাঙচুর, খুলনায় ধর্মসভা মন্দিরের অনুষ্ঠানে বোমা হামলা উল্লেখযোগ্য।[৬০] তবে কারা এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত সরকার তা উদঘাটন করতে ব্যর্থ হয়।

এসময় জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ দলটি ও তার সমমনাদের এসব উগ্রবাদী কর্মকাণ্ড ও উস্কানিমূলক বক্তব্য দেশে এক ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। আর ইতোমধ্যে তাদের ছত্রছায়ায় জঙ্গি সংগঠনগুলো বিশেষ করে হুজিবি ও জেএমবি সংগঠন দু'টি দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমা ও গ্রেনেড হামলা করে দেশকে একটি মারাত্মক ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেয়। হুজিবি-এর বোমা ও গ্রেনেড হামলার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল : উদীচীর কেন্দ্রীয় সম্মেলনে বোমা হামলা (১৯৯৯), রমনা বটমূলে পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠানে গ্রেনেড হামলা (২০০১), সিপিবি-এর র‍্যালিতে বোমা বিস্ফোরণ (২০০১), ব্রিটিশ হাইকমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর উপর গ্রেনেড হামলা (২১ মে ২০০৪), যশোরে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা (২০০৫), শাহ এস এম কিবরিয়া হত্যা (২০০৫)। আর জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) কর্তৃক পরিচালিত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : ময়মনসিংহে সিনেমা হলে বোমা হামলা (২০০২), ফাইলা পাগলার মাজারে বোমা হামলা (২০০৩), অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ হত্যা চেষ্টা (২০০৪), মনোয়ার হোসেন বাবু হত্যা (২০০৪), ময়মনসিংহে উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর উপর বোমা হামলা (২০০৫), অধ্যাপক ইউনুস হত্যা (২০০৫), ঝালকাঠিতে বিচারক হত্যা (২০০৫), ১৭ আগস্ট (২০০৫) দেশব্যাপী একযোগে ৫০০টি বোমা বিস্ফোরণ প্রভৃতি।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে জোট সরকারের প্রধান অংশীদার বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ উভয়ই দেশে উপরিউল্লিখিত মৌলবাদী বা জঙ্গিবাদী তৎপরতার কথা অস্বীকার করে। তবে জামায়াতের সাবেক আমীর গোলাম আযম বলেন, তালেবান (আফগানিস্তানে) শেষ হওয়া মানে ইসলাম শেষ হওয়া নয়। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চলতেই থাকবে।[৬১] আর জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর তৎকালীন আমির মতিউর রহমান নিজামী ফতোয়া দেন যে, ইসলামি আন্দোলনকারীদের জান্নাতপ্রাপ্তি আল্লাহ নিশ্চিত করেছেন।[৬২] জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর নেতাদের এসব বক্তব্য ইসলামি জঙ্গিদের উৎসাহিত করে। কিন্তু তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সন্ত্রাসী তৎপরতার জন্য বিরোধী দল আওয়ামী লীগকে দায়ী করেন। তিনি বলেন, আওয়ামী

লীগ অস্ত্র-গোলাবারুদ এনে দেশে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করতে চায়। তারাই তালেবান, আল কায়েদা ও খুনি।[৬৩]

প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দাবি করেন যে, বাংলাদেশ একটি উদারনৈতিক মুসলিম দেশ এবং বলেন, বাংলাদেশ কখনও তালেবান ধ্যান ধারণার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল না এবং ভবিষ্যতেও সম্পৃক্ত হবে না। তিনি যুক্তি দেখান, 'বাংলাদেশ তালেবান রাষ্ট্র হলে আমার মতো মহিলা প্রধানমন্ত্রী হয় কী করে? বাংলাদেশকে কেউ তালেবান রাষ্ট্র বলে অপবাদ দিয়েছে বলে মনে হয় না।'[৬৪] তবে অনেকেই দেশে ও সরকারের মধ্যে মৌলবাদী জঙ্গি রয়েছে বলি অভিযোগ করেন। ২০০১ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন আক্রমণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামী ঐক্যজোটের নেতারা 'আমরা হব তালেবান, বাংলা হবে আফগান' বলে শ্লোগান দিয়েছে। নিকট অতীতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশসহ অন্যান্য ইসলামি দলগুলো নারী নেতৃত্ব অনৈসলামিক বলে ফতোয়াও দিয়েছে। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে মৌলবাদীরা খালেদা জিয়াকে সাময়িকভাবে প্রধানমন্ত্রী ও রক্ষাকারী ঢাল হিসেবে মেনে নেয়।[৬৫] উল্লেখ্য যে, বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকার জঙ্গি সংগঠনগুলোর সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে প্রাথমিক পর্যায়ে মিডিয়ার সৃষ্টি বলে উল্লেখ করেছিল।

ইতোমধ্যে সারাদেশে ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলোর নেটওয়ার্ক আরো বিস্তৃত হয়। ২০০৫ সালের প্রথম দু'মাসে জামালপুর, বগুড়া, রংপুর, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, নওগাঁ ও জয়পুরহাট জেলার বিভিন্ন স্থানে যাত্রা, নাটক, নৃত্য অনুষ্ঠান, এনজিও অফিস ও গ্রামীণ ব্যাংকে উপর্যুপুরি বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। এসব ঘটনায় গ্রেপ্তারকৃতদের অনেকেই স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে বলে যে, দেশের বিভিন্ন স্থানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ও এনজিওদের কার্যস্থলে বোমা হামলা করাই তাদের কাজ। তারা এ হামলাকে ইসলামি জিহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করে। বোমা হামলার সঙ্গে জড়িতদের অধিকাংশই মাদ্রাসা শিক্ষক অথবা ছাত্র এবং তাদের অনেকেই জামা'আতুল মুজাহিদীন অথবা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত বলে খবর প্রকাশিত হয়। আর এদিকে রাজশাহী অঞ্চলে বাংলা ভাই বাহিনী প্রায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে।[৬৬]

২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশের ৬৪ জেলার মধ্যে ৬৩টিতেই অল্প সময়ের ব্যবধানে তিন শতাধিক স্থানে প্রায় ৫০০টি বোমা বিস্ফোরিত হয়। উক্ত ঘটনায় সেদিন দু'জন মৃত্যুবরণ করে ও দু'শতাধিক লোক আহত হয়। সারাদেশে বোমা হামলার ঘটনাস্থলে জামা'আতুল মুজাহিদীনের পক্ষ থেকে 'বাংলাদেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের আহ্বান' শীর্ষক অসংখ্য লিফলেট পাওয়া যায়।

লিফলেটটিতে উল্লেখ করা হয় যে, ইসলামি শরিয়াহ ভিত্তিক খেলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। লিফলেটে রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে সরকার ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিকট ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য সহযোগিতা চাওয়া হয়। ঐ লিফলেটে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে,

> "(জনগণের প্রতি আহ্বান!) কোন মুসলিম ভূখণ্ডে আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য করো বিধান চলতে পারে না", ..."এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আছে আল্লাহ বিরোধী শক্তি", ..."যে সংবিধানকে ভিত্তি করে দেশ পরিচালিত হচ্ছে তা আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক, বিধায় এ ব্যবস্থা ও তথাকথিত নির্বাচন পদ্ধতি পরিহার করে আল্লাহর হুকুম ও রাসুলের তরীকায় দেশ পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।... আপনাদের যে কোনো বিচার ফয়সালার জন্য মসজিদের খতিব, মাদ্রাসার মুহাদ্দেস ও অভিজ্ঞ আলেমেদ্বীনের কাছে গিয়ে আল্লাহর আইনের ফয়সালা প্রার্থনা করুন। তাগুত সরকারের আইন উপেক্ষা করে আল্লাহর আইনে বিচার ফয়সালা নিন।"
>
> ..."(বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান!) আপনারা এ দেশে আল্লাহর আইন চালু করুন।... আমরা ক্ষমতা চাই না, আমরা দেশে তাগুতি শাসনের পরিবর্তে আল্লাহর আইন চাই"।
>
> ... "(জাতীয় সংসদের সরকারি ও বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান!)... এদেশে যারা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চায় তারা ইসলামের শত্রু। অতএব, আল্লাহর হেদায়েত পেতে চাইলে দলাদলি বাদ দিয়ে সরকারী ও বিরোধী দল মিলে অবিলম্বে দেশে ইসলামী আইন চালু করুন।"
>
> ... "(সরকারি আমলা ও বিচারকগণের প্রতি আহ্বান!)... সরকার দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা না করলে আপনারা প্রশাসনিক কাজকর্ম ও তাগুতী আইনে বিচারকার্য পরিচালনা বন্ধ করুন। আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক সহযোগিতা করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে জীবন ধন্য করুন। সেই সাথে আর্মি, বিডিআর, পুলিশ ও র‍্যাবসহ সকল সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের প্রতি আহ্বান! আপনারা তাগুতী আইন হেফাযতের পরিবর্তে আল্লাহর আইন হেফাযতে সচেষ্ট হউন। তাগুতের আদেশ মানবেন না, আল্লাহর আদেশ মানুন। তাগুতের নির্দেশে আল্লাহর সৈনিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন না। তাগুতের গোলামী ছেড়ে আল্লাহর সৈনিকদের দলে যোগ দেন। তাগুতের সৈনিক হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহর সৈনিক হয়ে যান।"[৬৭]

এ লিফলেটটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, লিফলেটে বাংলাদেশের সরকার, সংসদ, বিরোধী দল, সরকারি আমলা ও বিচারকদের প্রতি ইসলামি আইন বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো হয়। এতে বলা হয়, দেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় বসে আছে আল্লাহ বিরোধী শক্তি। তারা যে পদ্ধতিতে নির্বাচিত হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। পবিত্র কোরআন ও হাদীসে কোথাও প্রচলিত কাফির-মুশরিক বিরচিত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি পদ্ধতির স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। এ পদ্ধতি সরকারি দল ও বিরোধী দল

নামে দু'টি পক্ষ সৃষ্টি করে জাতিকে দলে দলে বিভক্ত করে দেয়। লিফলেটে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, আপনারা দেশে আল্লাহর আইন চালু করুন। আমরা আপনাদের সহযোগিতা করব। এতে বুশ-ব্লেয়ারসহ কাফির-মুশরিক ও জালেম শাসকদের মুসলিম দেশের উপর থেকে দখলদারিত্ব ছেড়ে দিতে বলা হয়। আর তা না হলে তাদেরকে কোথাও নিরাপদে থাকতে দেয়া হবে না বলে হুশিয়ার করে দেয়া হয়। সর্বোপরি লিফলেটে ইসলাম বিরোধী এনজিওগুলোকে তাদের ইসলাম বিধ্বংসী কার্যক্রম বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়।[৬৮]

১৭ আগস্টের (২০০৫) বোমা হামলার কিছুক্ষণ পর বিএনপি আয়োজিত প্রতিবাদ সভায় দলের মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া বিরোধী দলের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, যেনতেনভাবে যারা ক্ষমতায় আসতে চায় তারাই বোমা হামলার সঙ্গে জড়িত।[৬৯] জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশও বোমা হামলার জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করে। সরকারের সিনিয়র মন্ত্রীরা বোমা হামলার ঘটনাকে গুরুত্ব দিতে চাননি। নৌপরিবহন মন্ত্রী কর্নেল (অব.) আকবর হোসেন বলেন, '১৭ আগস্টের বোমা হামলা একটি ছোট্ট ফোঁড়া, পটকাবাজি।'[৭০] অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান বলেন, বোমা হামলা এখন একটা ফেনোমেনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিছু দিন আগে লন্ডনে এবং ভারতের সংসদে বোমা হামলা হয়েছে। এখানে তো সংসদে বোমা হামলা হয়নি।[৭১] ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া রাষ্ট্রীয় সফরে চীনে ছিলেন। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফিরে আসেন। ৯ সেপ্টেম্বর সংসদে তিনি বলেন, 'বোমা হামলাকারীরা ধর্মীয় ছদ্মবেশে নিজেদের আড়াল করতে চাইছে। যারা রাষ্ট্র বিরোধী এ অপরাধের সঙ্গে জড়িত, সুনির্দিষ্টভাবে শুধু তাদের চিহ্নিত করে একে একে ধরা হবে।' তিনি আরো বলেন, 'আমি স্পষ্টভাবে দেশবাসীকে জানাতে পারি, এ অপরাধীদের উদ্দেশ্য ও পরিচয়। ধর্মীয় উগ্রবাদে আক্রান্ত দেশ হিসেবে যারা বাংলাদেশকে চিহ্নিত করতে চায়, মুসলিম মেজরিটি ও উদার গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে যারা আমাদের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারছে না, সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় যারা ঈর্ষান্বিত, এটা তাদের কাজ।' অথচ তিনি হামলার দায় স্বীকারকারী জামা'আতুল মুজাহিদীনের (জিএমবি) নামটি একবারও উল্লেখ করেননি। বরং যে ভাষায় তিনি সচরাচর বিরোধী দলের উপর দোষ চাপিয়ে থাকেন সে ভাষাই ব্যবহার করেন। দৃশ্যমান সন্ত্রাসীদের আড়াল করে অদৃশ্য ও কল্পনাপ্রসূত কারো দিকে আঙুল তুলে তিনি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেন। এতে প্রকৃত সন্ত্রাসীরা উৎসাহিত হয়। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, ধর্মভিত্তিক যেসব পার্টি গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক পন্থায় বিশ্বাসী, বিএনপি তাদের সঙ্গে নিয়েছে। তিনি চার দলীয় জোটের বাইরে অবস্থানকারী ধর্মীয় দলগুলোকে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসরণের জন্য আহ্বান জানান।[৭২]

১৭ আগস্টের (২০০৫ সাল) বোমা হামলার পর সারাদেশ থেকে প্রায় ৭০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের অধিকাংশই জেএমবির-এর সদস্য এবং অনেকেই হামলার দায় স্বীকার করে। শেষ পর্যায়ে জেএমবির-এর সর্বোচ্চ কমিটি মজলিসে শূরার ৭ সদস্যকেই গ্রেপ্তার করা হয়। জেএমবি-এর শীর্ষ নেতা শায়খ আবদুর রহমান, সেকেন্ড-ইন-কমান্ড সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাই, অপারেশন কমান্ডার আতাউর রহমান সানীসহ অধিকাংশ নেতা ও ক্যাডার অতীতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও ইসলামী ছাত্রশিবির -এর রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল বলে খবর প্রকাশিত হয়। আর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে ধরা পড়া অনেকেই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করে।

বিএনপি দলীয় সংসদ সদস্য আবু হেনা বিবিসি, এটিএন ও বিভিন্ন সংবাদপত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকার দিয়ে জঙ্গিবাদের উত্থানের জন্য জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এবং একই সঙ্গে বিএনপির কয়েকজন মন্ত্রী-এমপিকে দায়ী করেন। কিন্তু এ অভিযোগ সম্পর্কে কোন তদন্ত ছাড়াই প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া আবু হেনাকে দল থেকে বহিষ্কার করেন। বিএনপি দলীয় হুইপ মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন সরাসরি এবং বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য কর্নেল (অব.) অলি আহমদ (এমপি) আভাস-ইঙ্গিতে জঙ্গি তৎপরতার জন্য জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে দায়ী করেন। জঙ্গিবাদ ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশকে নিয়ে বিব্রত বিএনপি-এর হাইকমান্ড এরপর প্রকৃত ঘটনার প্রকাশকারী উপরিউক্ত এমপিদের কণ্ঠরোধ করতে অলিখিত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন।[৭৩]

অবশেষে ২০০৬ সালের ২ মার্চ সিলেট শহরের জনবহুল এলাকার একটি বিলাসবহুল বাড়ি থেকে জেএমবি প্রধান শায়খ আবদুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৭৪] তাকে গ্রেফতারের সময় ঐ বাড়ি থেকে মাত্র ১টি বোমা, কয়েকটি ডেটোনেটর ও ২টি তরবারি পাওয়া যায়। কোনরকম সংঘর্ষ ও রক্তক্ষয় ছাড়াই শায়খ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-নাতি-নাতনিসহ আত্মসমর্পণ করে। তবে সে শর্ত দেয় যে, তাকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে দিতে হবে। কর্তব্যরত নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান সে শর্ত মেনেও নেন। কিন্তু গ্রেপ্তারের পর শায়খকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে দেয়া হয়নি। ঐ বাড়িতে ইসলামি জিহাদের বই পত্রের সঙ্গে স্যাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর লেখা 'শান্তির পথ ও জামায়াতে ইসলামী' এবং গোলাম আযমের লেখা 'আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন' শীর্ষক বই পাওয়া গেলেও জব্দ তালিকায় সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। ঐ বাড়ি থেকে উদ্ধারকৃত একাধিক মোবাইল সেট ও সিম জব্দ তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে-এর জঙ্গি কানেকশন চাপা দেবার জন্য সরকারের নির্দেশে সিলেট প্রশাসন এ ধরনের কাজ করেছে বলে অনেকে ধারণা করেন।[৭৫]

এরপর ৬ মার্চ, ২০০৬ তারিখে জেএমবির-এর দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাইকে মুক্তাগাছা উপজেলায় এক জেএমবি শিষ্যের গ্রামের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।[৭৬] গ্রেপ্তারের সময় বোমা বিস্ফোরণে বাংলা ভাই আহত হয়। সে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল, কিন্তু তাকে সে সুযোগ দেয়া হয়নি। প্রশাসন এ ধরনের লুকোচুরি করলেও জেএমবি নেতা ও ক্যাডাররা ঘটনার বর্ণনায় কোন রাখঢাক করেনি। তারা সদম্ভে তাদের জঙ্গি কর্মকাণ্ড ও মদদদাতাদের সম্পর্কে স্বীকারোক্তি প্রদান করে। আবদুর রহমান জিজ্ঞাসাবাদকালে স্বীকার করে যে, কবি শামসুর রহমান ও অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের প্রাণনাশের চেষ্টা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহাম্মদ ইউনুসকে হত্যা, ময়মনসিংহে ও সিলেটে সিনেমা হলে এবং সিলেটে মাজারে বোমা হামলা, রংপুর ও দিনাজপুরে ব্র্যাক অফিসে এবং জয়পুরহাটের ক্ষেতলালে পুলিশের উপর হামলা এর প্রত্যেকটিতেই জেএমবি জড়িত ছিল এবং তার নির্দেশেই এসব হামলা করা হয়েছে। আব্দুর রহমান আদালতেও স্বীকার করে যে, বিচারক ও আইনজীবী হত্যার নির্দেশ সেই দিয়েছে। আল্লাহর আইন বাস্তবায়িত না হওয়া পর্যন্ত এরূপ হত্যা চলতে থাকবে। মানুষ রচিত আইনের বিরুদ্ধে তার নির্দেশে আন্দোলন চলছে। সে যা করছে তা আল্লাহর নির্দেশেই করছে। এজন্য মুসলমান হিসেবে পুরস্কারই তার প্রাপ্য। উল্লেখ্য যে, জেএমবি নেতারা কোন আইনজীবীর সহায়তা না নিয়ে নিজেরাই সাক্ষীদের জেরা করে এবং বলে যে, তারা আদালতের রায়ের কোন তোয়াক্কা করে না।[৭৭]

শায়খ আবদুর রহমান ও সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাইকে মুখোমুখি জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বলে যে, মন্ত্রী-এমপিদের না ধরে তাদের ধরে কোন লাভ নেই। তাদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা দেয়া হচ্ছে, কিন্তু গডফাদারদের ধরে কেন রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করা হচ্ছে না। তারা স্বীকার করে যে, রাজশাহী, নওগাঁ, বুগুড়া, জয়পুরহাট, রংপুরসহ উত্তরাঞ্চলে যেসকল অভিযান চালানো হয়েছে তা আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের জন্যই করা হয়েছে। এসব অভিযান ও কর্মকাণ্ড এক সময়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও ইসলামী ছাত্রশিবির করত, এখনো অনেকে করে। জামা'য়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর কর্মকাণ্ডে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর নৈতিক সমর্থন রয়েছে, তাদের মধ্যে আদর্শিক মিলও রয়েছে। বাংলা ভাই আরো জানায় ২০০৪ সালে উত্তরাঞ্চলে সর্বহারা দমনের অভিযান ছিল জেএমবির একটি পরীক্ষামূলক উদ্যোগ। ঐ এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে সর্বহারাদের নির্যাতনে অতিষ্ট ছিল, তাই তারা ঐ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছিল। দীর্ঘদিন রাজনৈতিকভাবে ব্যবহারের ফলে সর্বহারারা অদম্য হয়ে উঠেছিল এবং স্থানীয় মন্ত্রী-এমপিদের কথাও শুনতো না। ২০০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন ভূমি উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু ও

প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবিরের আত্মীয়-স্বজনকে সর্বহারারা হত্যা করে। তখন তারা জেএমবিকে সর্বহারা দমনে সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতা দেয়। তারা রাজশাহীর পুলিশ সুপার মাসুদ মিয়াসহ পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বাংলা ভাইকে সহযোগিতা করার নির্দেশ দেয়। পরবর্তীতে পুরো রাজশাহী জেলায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য বাংলা ভাই ও তার বাহিনীকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার আমিনুল হক। এক পর্যায়ে রাজশাহী ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা ফজলে হোসেন বাদশা বাংলা ভাইয়ের বিপক্ষে শক্ত অবস্থান নেয়। তবে তার প্রতিপক্ষ রাজশাহীর মেয়র মিজানুর রহমান মিনু সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাই এর পক্ষে অবস্থান নেয়।[৭৮] তাছাড়া ২০০৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুরের গুড়গোলায় বোমা বিস্ফোরণের ফলে জেএমবির উপর যে চাপ সৃষ্টি হয়েছিল, সেটি নিস্পত্তি করেন তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী।[৭৯] তাছাড়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী প্রথম দিকে মৌলবাদী জঙ্গিদের আড়াল করতে চেয়েছেন। জঙ্গিদের ধরা হলে তিনি মন্তব্য করেন- 'যাদের ধরা হচ্ছে তারা মৌলবাদী হয় কি করে? ওদেরতো টুপি দাড়িই নেই।'[৮০] অপর জঙ্গি সংগঠন 'শাহাদাৎ-ই-আল হিকমাকে' নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও হিকমার ক্যাডারারা প্রকাশ্যে তাদের কর্মতৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকে। হিকমার নেতাদের গ্রেফতার করা হলেও ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট থেকে জামিন নিয়ে তারা বার বার বেরিয়ে আসে।

আটক জঙ্গি জামা'য়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর নেতারা তাদের সব কথা বলা সুযোগ পায়নি। সম্ভবত সরকারের বিভিন্ন মহলের পক্ষ থেকে তাদের যেসব আশ্বাস দেয়া হয় সেগুলো পূরণ না হওয়ায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। ঝালকাঠি আদালতে দুই বিচারক হত্যা মামলার শুনানিকালে বাংলা ভাই বলে যে, 'তাদের বিচারের নামে চলছে সরকারের সাজানো নাটক। এ নাটকের কে নায়ক আর কে খলনায়ক তা পরিষ্কারভাবে জাতিকে জানাতে চাই। হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা মারা গেলেও বাঁশি আমাদের কাছে। বাঁশি বাজিয়ে কিভাবে ইঁদুর বের করতে হয় তা আমাদের জানা আছে। বাঁশি বাজালেই সরকারের ইঁদুর বেরিয়ে আসবে। একটা ইঁদুরও গদিতে থাকতে পারবে না।' একই আদালতে শুনানিকালে আবদুর রহমান তদন্ত কর্মকর্তাকে হুমকি দেয় যে, 'মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব। আমি চাই না হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিতে। রহস্য উন্মোচন হয়ে যাবে, কেউই রেহাই পাবে না।' এসব ঘটনার বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জেএমবি নেতাদের কাছে হয়তো এমন কিছু গোপন তথ্য আছে যা ফাঁস হয়ে গেলে সরকারের ক্ষমতায় টিকে থাকা দুরুহ হয়ে পড়বে। সাংবাদিকদের সঙ্গে তাদের কথা বলার সুযোগ না দেয়ায় এ সন্দেহ আরো বেশি ঘনীভূত হয়।[৮১]

এছাড়া জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ দলটি নিজেদেরকে গণতান্ত্রিক দল বলে দাবি করলেও তাদের রাজনীতি ভাবাদর্শগতভাবে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিপন্থী। দলটি 'আল্লাহর আইন ও সৎ লোকের শাসন' প্রতিষ্ঠার নামে জনগণের নিকট জবাবদিহিতা ও আধুনিক প্রতিনিধিত্বশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা নাকচ করতে চায়। ইসলামী ঐক্যজোটসহ ইসলামি নামধারী অন্যান্য দলগুলোও 'আল্লাহর আইন ও ইসলামি আদর্শ' প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সঙ্গে অনেক বিষয়ে তাদের মতবিরোধ রয়েছে। তারা মনে করে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ প্রকৃত ইসলামি দল নয়, তারা মওদুদীবাদের অনুসারী। তাছাড়া জোট সরকারের উপর জামায়াতের প্রভাব বেশি মাত্রায় থাকায় তাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। ইসলামী ঐক্যজোটের নেতা মুফতি ফজলুল হক আমিনী (এমপি) অভিযোগ করেন, জামায়াত সবসময় মাতব্বরি করে।[৮২] ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের নেতা সৈয়দ বেলায়েত হোসেন বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার আঁচলের তলে উগ্রপন্থী জঙ্গি অবস্থান করছে। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ধর্মের দোহাই দিয়ে ইসলাম ধর্মকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।[৮৩] জাকের পার্টির চেয়ারম্যান পীরজাদা মোস্তফা আমীল ফয়সাল প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার উদ্দেশ্যে বলেন, ভণ্ড-প্রতারক জামায়াতকে জোট থেকে বের করে দেন, বাংলাদেশের মানুষ আবার আপনাকে ক্ষমতায় আনবে।[৮৪] সম্প্রতি ইসলামী ঐক্যজোটের একটি অংশ পৃথক দল গঠন করে ও চার দলীয় জোটের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করে। তবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশসহ সকল ইসলামি দলের মূল লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। সেটি হলো বাংলাদেশে ইসলামি শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা। তাদের অনেকেই **১৯৭১** সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল। তারা মনে করে আওয়ামী লীগ ভারতঘেঁষা ধর্মনিরপেক্ষ দল, আর আওয়ামী লীগকে ঠেকাতে পারলেই ইসলাম ধর্ম টিকে থাকবে। আর মূলত এখানেই বিএনপির সঙ্গে তাদের রাজনৈতিক মিল। আর সর্বোপরি তাদের বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদেরও মূল ভিত্তি হলো আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করা ও ভারত বিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করা।[৮৫]

এছাড়া জঙ্গিবাদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত ধর্মান্ধ রাজনৈতিক শক্তির যে যোগসাজগ আছে তা বিভিন্ন সময়ে তাদের বিভিন্ন রকম ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও যথেষ্ট ইঙ্গিতবহ কথা-বার্তা থেকে প্রকাশ পায়। যেমন,

(১) "১৯৭১ আর ২০০5 সাল এক কথা নয়"। (উল্লেখ্য যে, মৌলবাদী জঙ্গিরা ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের জনসভায় গ্রেনেড হামলা করে, যাতে ২৪ জন নিহত ও ৫০৩ জন আহত হন।)

(২) "আমরা কুচপাতার ওপর বৃষ্টির পানি নই যে টোকা দিলেই পড়ে যাবো"।

(৩) "কোথায় আজ ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি, আর আমরা আজ কোথায়" (?)

(৪) "সংসদের কয়েকটি আসন দিয়ে আমাদের শক্তির বিচার করলে ভুল করবেন"।

(৫) "শীঘ্রই ইসলামি শাসন কায়েম হবে। দেখুন, অপেক্ষা করুন; পরবর্তী নির্দেশের জন্য প্রস্তুত থাকুন"।

(৬) "ইসলামে আত্মহত্যা পাপ তবে ইসলামি শাসন/হুকুমত কায়েম হয়ে গেলে এসব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে"।

(৭) "জ্ঞানপাপী মানুষ প্রণীত সংবিধানের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকরী করতে সশস্ত্র জেহাদের মাধ্যমে দেশে যত দিন ইসলামি আইন বাস্তবায়ন না হয় তত দিন তাগুতের বিচারালয়ে যাওয়া বন্ধ রাখুন"।

(৮) "সশস্ত্র জেহাদ করা আমার অধিকার, আর ওই জেহাদে অংশগ্রহণ আমার দায়িত্ব। আমার অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই"।

(৯) "দেশ গৃহযুদ্ধের দিকে যাচ্ছে, যাবে"।[৮৬]

এছাড়া মূলধারার ইসলামি দলগুলো ধর্মীয় জঙ্গিবাদীদের অর্থের যোগান দেয় এমন প্রমাণও রয়েছে। যেমন- ১৭ আগস্ট (২০০৫) সারাদেশে জেএমবি-এর বোমা হামলার পর এক শ্রেণির সুচতুর মানুষ (জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সমর্থক) হঠাৎ করেই মূলধারার ইসলামি দলের সঙ্গে ধর্মীয় জঙ্গিবাদীদের সম্পর্ক অস্বীকার করার অপচেষ্টা চালায়। কিন্তু তাদের সে অপপ্রয়াস সফল হয়নি। বরং মূলধারার ইসলামি দলের সঙ্গে উগ্রবাদীদের সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি হওয়ার কারণ হলো- শুধু সশস্ত্র জিহাদীরাই নয়, মূলধারার ইসলামি দলেরও প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর প্রধান এ প্রসঙ্গে বলেন যে, ইসলামি শাসন খুব শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হবে। অপেক্ষা করুন এবং দেখুন....... নির্দেশনা পাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন।' এছাড়া এদেশের প্রধান ইসলামি দল প্রকাশ্যে কখনো জেএমবি-এর বোমা বিস্ফোরণকারীদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেনি বা এ জঘন্য কাজের নিন্দা জানায়নি। এর প্রধান কারণ হলো জিএমবি-এর গ্রেফতার হওয়া প্রায় সকল নেতা-কর্মীরা জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ অথবা তাদের ছাত্র সংগঠনের সদস্য ছিল। এছাড়া বোমা হামলার কার্যক্রমকে সফল করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক লেনদেন হয়েছে ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে (জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ কর্তৃক পরিচালিত ব্যাংক)। আর ধরাপড়া জঙ্গিদেরকে মুক্ত করতে দলটি তৎকালীন প্রশাসনযন্ত্রকে কাজে লাগিয়েছে। তবে কোনো কারণে জঙ্গিদের ছাড়াতে না পারলে তারা তাড়াতাড়ি করে গ্রেফতার হওয়া জঙ্গিদেরকে দল থেকে বহিষ্কার করেছে। আর এ বিষয়গুলো খুব দ্রুত বাংলাদেশের প্রায় সকল দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ পেয়েছে। এ সংক্রান্ত যেসকল খবর পত্রিকায় প্রকাশ পায় সেগুলো নিম্নরূপ:

'চট্টগ্রামে জামায়াতে ইসলামীর সাথে জড়িত পাঁচ জেএমবি নেতা গ্রেফতার'; '১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন'। (*প্রথম আলো*, ২১ সেপ্টেম্বর ২০০৫)।

'এক বছরে দাতাদের কাছ থেকে ৩৪টি ইসলামি এনজিও দুইশত কোটি টাকার বেশি সাহায্য পেয়েছে'। (*দি ডেইলি স্টার*, ৩১ আগস্ট ২০০৫)

'জামায়াত জঙ্গি সম্পর্ক এখন স্পষ্ট'। (*দি ডেইলি স্টার*, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৫)

'এক হাজারের অধিক জঙ্গির মুক্তি, এদের মধ্যে ৪০% জামায়াতে ইসলামী দলের'। (*ইত্তেফাক* ২৬ সেপ্টেম্বর ২০০৫)

'২৯ নভেম্বর দু'টি আদালত প্রাঙ্গনে হত্যাকাণ্ড ঘটার মাত্র ক'দিন আগেই সরকার রিভাইভাল ইসলামিক হেরিটেজ সোসাইটি (আর আই এইচ এস) নামের একটি শীর্ষস্থানীয় দাতা সংস্থা (কুয়েতি এনজিও) কর্তৃক জঙ্গিদের জন্য প্রদত্ত প্রায় ২ কোটি টাকা ছাড় দেয়ার জন্য সম্মতি দেয়'। (*দি ডেইলি স্টার*, ৫ ডিসেম্বর ২০০৫)।[৮৭]

এসব ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করলে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, মূলধারার ইসলামি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জঙ্গিবাদী সংগঠনসমূহের অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে।

উপরিউক্ত ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামপন্থী রাজনৈতিক দল বিশেষত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর সঙ্গে জঙ্গিদের কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষ সম্পৃক্ততা ছিল। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ দলটি বিএনপি ও চার দলীয় জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সরকারের অংশীদারিত্ব লাভ করে এবং নানা উপায়ে জঙ্গিবাদকে সমর্থন প্রদান করে। আর বিএনপি স্থায়ীভাবে ক্ষমতায় থাকার লোভে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশসহ তাদের সমমনা অন্যান্য ইসলামি গ্রুপগুলোর জঙ্গিবাদী নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে সমর্থন দেয়। অর্থাৎ সার্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, বিএনপি ও চার দলীয় জোট সরকারের সময় ইসলামি জঙ্গিবাদী সংগঠনগুলো যথেষ্ট অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিল।

জঙ্গি সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে তৎকালীন জোট সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ

জোট সরকারের প্রধান দু'টি দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এবং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ শুরু থেকেই দেশে জঙ্গিবাদের কথা অস্বীকার করে আসছিল। শুরুতে তারা জঙ্গি তৎপরতা দমনে কোন কার্যকর প্রদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সাধারণভাবে ধারণা করা হয় যে, বিদেশি বিভিন্ন রাষ্ট্র ও

দাতা সংস্থাসমূহের চাপ, দেশের প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর ক্রমাগত দাবি এবং ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী একযোগে ৫০০টি বোমা হামলার বাস্তবতায় শেষ পর্যন্ত তৎকালীন জোট সরকার জঙ্গি বিরোধী অভিযান শুরু করে। কিন্তু এর ফলস্বরূপ ইসলামপন্থী দলগুলো ক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ইসলামী ঐক্যজোটের একাংশের নেতা মাওলানা ফজলুল হক আমিনী (এমপি) বলেন, বাংলাদেশ থেকে ইসলামকে বিদায় দেয়ার ষড়যন্ত্র হচ্ছে, আন্তর্জাতিকভাবে এ ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। ইসলামী ঐক্যজোটের অপর অংশের নেতা মাওলানা আবদুর রউফ ইউসুফী জোট সরকারের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, ধর্মীয় শক্তির সমর্থন নিয়েই এ সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এখন যেন সে শক্তি কর্তৃক সরকার প্রত্যাখাত না হয় এবং সরকার ও আওয়ামী লীগের ভাষা যেন এক না হয় সেদিকে সরকারকেই খেয়াল রাখতে হবে। ইসলাম যেহেতু জোট সরকারের আদর্শগত ভিত্তি এবং ইসলামপন্থীরা প্রধান ভোট ব্যাংক, সেহেতু বিএনপি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে দ্বিধাবোধ করে। জঙ্গিদের ধরলে জোটের শরিকরা অন্তুষ্ট হয়, আবার না ধরলে দাতারা অসন্তুষ্ট হয়। জঙ্গিদের দমন নিয়ে এভাবেই উভয় সংকটে পড়ে সরকার। এমতাবস্থায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া জঙ্গি তৎপরতাকে সাধারণ আইন-শৃঙ্খলার বিষয় বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু জঙ্গিদের বিষয় যে সাধারণ আইন শৃঙ্খলার বিষয় না তা ধীরে ধীরে প্রমাণিত হয়।[৮৮]

২০০৫ সালের ২৩ জানুয়ারি *'নিউইয়র্ক টাইমস্'* ম্যাগাজিনে বাংলাদেশে জঙ্গি তৎপরতা সম্পর্কে দীর্ঘ রিপোর্ট প্রকাশের পর ওয়াশিংটনে ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি (২০০৫ সাল) দাতাগোষ্ঠীর এক বিশেষ বৈঠক বসে। সে বৈঠকে বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। বৈঠকে বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতি, সাম্প্রতিক বোমা ও গ্রেনেড হামলাসহ জঙ্গি তৎপরতা নিয়ে আলোচনা হবে বলে খবর প্রকাশিত হয়। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সরকার হঠাৎ করেই জঙ্গিবিরোধী অভিযান শুরু করে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে অর্ধ-শতাধিক জঙ্গিকে গ্রেফতার করে। ওয়াশিংটন বৈঠক চলাকালেই 'জাগ্রত মুসলিম জনতা' ও 'জামা'আতুল মুজাহিদীনকে' বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫-এ এক সরকারি প্রেসনোটে বলা হয় 'জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ' ও 'জামা'আতুল মুজাহিদীন' নামক দু'টি সংগঠন দেশের বিভিন্ন স্থানে খুন, ডাকাতি, বোমা হামলা ও হুমকিসহ নানাধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে শান্তিপ্রিয় জনগণের জীবন ও সম্পদ হানি করে আসছে। এরা ধর্মীয় অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে একদল তরুণকে বিপথগামী করে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করতে চাইছে। সরকার দৃঢ়তার সঙ্গে জানাতে চায়, এ ধরনের কর্মকাণ্ড সহ্য করা হবে না।'[৮৯] কিন্তু বাস্তবে সরকার দৃঢ়তার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়। আহলে হাদীস নেতা ড. আসাদুল্লাহ আল গালিবসহ

কিছু সন্দেহভাজন লোককে গ্রেপ্তার করা হলেও কিছু দিনের মধ্যে জঙ্গিবিরোধী অভিযান স্তিমিত হয়ে যায়। সরকার প্রথম পর্যায়ে বাংলা ভাইয়ের মতো দুর্ধর্ষ জঙ্গি নেতাকে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর বলেন, 'বাংলা ভাই সম্ভবত এখন দেশে নেই। পত্র-পত্রিকায় ঐ ধরনের খবর ছাপা হয়েছে।'[৯০]

উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এক পর্যায়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া অনেকটা বাধ্য হয়েই জঙ্গিবাদ বিষয়ে প্রশ্নে জাতীয় সংলাপের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ সংলাপে ২৭টি রাজনৈতিক দল ও ১৫টি পেশাজীবী সংগঠনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে মাত্র ৩টি রাজনৈতিক দল ও ৫টি পেশাজীবী সংগঠন এ সংলাপে অংশ নেয়। আওয়ামী লীগসহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দলগুলো সরকারের মধ্যেই জঙ্গিবাদীরা অবস্থান করছে এ অভিযোগ তুলে সংলাপ বর্জন করে। আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য জনাব আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'একদিকে সরকার সাম্প্রতিক ঘটনগুলোর জন্য আমাদের দায়ী করছে, অন্যদিকে বলছে আলোচনায় বসতে। এটা আসলে নাটক। এ নাটকে আমরা নেই। আমাদের অবস্থান পরিষ্কার। আমরা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে। সরকার তার প্রশাসনযন্ত্র দিয়ে জঙ্গিদের ধরুক।'[৯১] ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন, জাকের পার্টি প্রভৃতি ইসলামপন্থী দলও জঙ্গিবাদী জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ দলটিকে সরকারে রেখে সংলাপকে অর্থহীন বলে প্রত্যাখ্যান করে। সংলাপে অংশগ্রহণকারী কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের নেতা বঙ্গবীর আব্দুর কাদের সিদ্দিকী বলেন, আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী সকল গোষ্ঠীর জন্মদাতা হচ্ছে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ দলটি। তিনি দলটিকে সরকার থেকে বহিষ্কার করার দাবি জানান। জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সম্পর্কে এ কঠোর বক্তব্যে সরকার বিব্রত হয়। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে ভবিষ্যতে সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের টেলিফোনে জানিয়ে দেয়া হয়, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না। সুতরাং সংলাপে অংশগ্রহণকারী এরশাদের জাতীয় পার্টি জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ দলটির নাম উল্লেখ না করে জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িত সকলের সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য বিচার বিভাগীয় কমিশন গঠনের প্রস্তাব করে। আর আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে জঙ্গিদের আশ্রয়দাতাদের সরকার ও প্রশাসন থেকে পদত্যাগের দাবি জানায়।[৯২] বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক দলগুলোর এসব প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করেনি।

এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নসহ দেশি বিদেশি বিভিন্ন মহল জামায়াতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর পৃষ্ঠপোষকদের আইনের আওতায় এনে প্রকাশ্য বিচারের দাবি জানালেও সরকারের পক্ষ থেকে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। ২০০৫ সালের শেষের দিকে আত্মঘাতী

বোমা হামলা শুরু হলে আইনমন্ত্রী মওদুদ আহমেদ বলেন- জঙ্গি প্রতিরোধে মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখে কঠোর আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, আইনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিরা ছাড়াও আশ্রয়-প্রশ্রয়দাতাদেরও (হামলা পরিকল্পনাকারী, আর্থিক সহায়তাদানকারী, উদ্বুদ্ধকারীসহ) শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। কিন্তু প্রস্তাবিত আইনটি আলোর মুখ দেখেনি। এমনকি, জঙ্গিদের মদদদাতা হিসেবে যাদের নাম প্রকাশিত হয় তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তখন সরকারি অনুমতি পায়নি।[৯৩] তবে ১৭ আগস্টের বোমা হামলার পর সারা দেশ থেকে প্রায় ৭০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের অধিকাংশই জামায়েতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর সদস্য এবং প্রায় সবাই বিভিন্ন হামলার দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে। শেষ পর্যায়ে সরকার জেএমবির সর্বোচ্চ কমিটি মজলিশের শূরার ৭ সদস্যকে গ্রেফতার করে। প্রথমে গ্রেফতার করা হয় শীর্ষ জঙ্গি সংগঠন জেএমবির প্রধান নেতা শায়খ আব্দুর রহমানকে (২ মার্চ, ২০০৬) এবং এরপর গ্রেফতার করা হয় দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাইকে (৬ মার্চ, ২০০৬)। এরপর শুরু হয় জঙ্গি নেতাদের বিচারিক প্রক্রিয়া। মহামান্য আদালত বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আব্দুর রহমান ও সিদ্দিকুল ইসলাম ওরফে বাংলা ভাইসহ ৬ শীর্ষ জেএমবি নেতাকে প্রাণদণ্ডের দণ্ডিত করেন। অবশেষে সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ২৯ মার্চ ২০০৬ তারিখে জঙ্গি নেতাদের ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

এরপর ২০০৬ সালের শেষ দিকে দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হয়। ২০০৬ সালের ১ নভেম্বর সেনা সমর্থিত বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে। তখন দেশের সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়। এসময় বিভিন্ন মহল থেকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধের জোর দাবি জানানো হয়। জোট সরকারের সময় জঙ্গি সংগঠনগুলোর কার্যক্রমের দরুন সাধারণ মানুষ ধর্মভিত্তিক রাজনীতির প্রতি সন্ধিহান হয়ে উঠে। জঙ্গি সংগঠনগুলো তখন নিরুপায় হয়ে তাদের কার্যক্রম আপাতত বন্ধ রাখে। সেনা সমর্থিত বিশেষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে (২০০৬-২০০৮) দু'-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া জঙ্গিরা তখন তেমন সুবিধা করতে পারেনি। এরপর ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিজয়ী আওয়ামী লীগ ও মহাজোটের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করে। উল্লেখ্য যে, বিএনপি ও চার দলীয় জোটের জঙ্গিবাদী কার্যক্রম ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তাদের পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল। আওয়ামী লীগ ও মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু তারপরও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নামে জঙ্গি সংগঠনগুলো নানা ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে।

উপরিউক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, বাংলাদেশে ধর্মপন্থী রাজনীতির বিকাশের সুযোগে পর্যায়ক্রমে উগ্রবাদী জঙ্গি সংগঠনগুলোর কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়। ১৯৯১ সালে বিএনপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে উগ্রবাদী সংগঠনগুলো তাদের প্রাথমিক কাজগুলো করতে থাকে। মূলত '৯০- এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এদের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত হতে থাকে। আর ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াতের নেতৃত্বে চারদলীয় জোট সরকার গঠন করার পরে জঙ্গিবাদী সংগঠনগুলোর কার্যক্রমের বিপুল উত্থান লক্ষ্য যায়। একাধিক দেশি-বিদেশী প্রতিষ্ঠানের গবেষণায় জঙ্গিবাদী সংগঠনগুলো সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধান ধর্মপন্থী দল জামায়াতে ইসলামীর সংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে, ২০০১ সালের সরকারে জামায়াতে ইসলামী দলটি পর্যায়ক্রমে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পায়। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে দলটি তখন প্রগতিশীল বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে বাঁধাপ্রদান, সংখ্যালঘু নির্যাতন, জঙ্গিবাদী কার্যক্রম প্রভৃতি নেতিবাচক কাজে জড়িয়ে পড়ে। ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত এদেশের জনগণ তাদের জিঘাংসামূলক কর্মকাণ্ডের স্বরূপ দেখেছেন। মূলত জামায়াতে ইসলামী দলটি স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনীতির দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় দেখেছে যে, বাংলাদেশে কোন ক্রমেই তাদের সকলকাম হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য তারা ২০০১ সালে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অংশীদারিত্ব লাভ করার পর সুযোগ বুঝে জঙ্গিবাদের মাধ্যমে তাদের উগ্রপন্থী রাজনৈতিক শক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। এ জঙ্গিবাদী ধারাটি আসলে তাদের একটি বিশেষ সামরিক শাখা। তবে জামায়াতে ইসলামীর অভ্যন্তরীণ ধর্মপন্থী রাজনীতিই শুধু নয় দেশের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পশ্চাদপদ অবস্থাও জঙ্গিবাদের উত্থানের পিছনে কাজ করেছে। আর এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বৈশ্বিক ধর্মপন্থী রাজনীতির বিভিন্ন বিষয়।

তবে আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা জরুরী যে, বাংলাদেশে ইসলামি জঙ্গি সংগঠনগুলো যে ধরনের নাশকতামূক কাজ করছে, তা সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য বিরাট হুমকীস্বরূপ। আবুল বারকাত এ প্রসঙ্গে যথার্থ বলেছেন যে, উগ্র জঙ্গিবাদ যে 'আত্মঘাতি বোমা সংস্কৃতির' চালু করেছে তার ফলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ধনী-নির্ধনী নির্বিশেষে দেশের সকল মানুষের জীবন বিপন্ন প্রায়।[৯৪] এ জঙ্গিবাদের বিকাশ ঘটতে থাকলে অচিরেই দেশ এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবে। নিরাপত্তা ছাড়াও দেশের মূল চালিকাশক্তি অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিশেষ করে শিল্প, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, বৈদেশিক বাণিজ্য, পর্যটন প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেশ পিছনের দিকে ধাবিত হবে। এজন্য জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, সুশীল সমাজ, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ও সর্বোপরি সাধারণ জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।

ধর্মীয় জঙ্গিবাদ নিরসনের জন্য সুপরিশমালা

৬ শীর্ষ জঙ্গির ফাঁসির পর অনেকেই মনে হতে পারেন যে, দেশ থেকে জঙ্গিবাদ নির্মূর্ল হয়েছে। কিন্তু এ ধরনের ধারণা সঠিক নয়। সমাজে মৌলবাদ-জঙ্গিবাদের উপাদানগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত বহাল থাকবে ততোক্ষণ পর্যন্ত জঙ্গিবাদ নির্মূল হবে না। এজন্য ধর্মীয় উগ্রপন্থী জঙ্গিবাদী অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচারের পাশাপাশি সমাজে যেন জঙ্গিবাদ ভিত গড়তে না পারে সে ব্যাপারেও সকলকে সজাগ থাকতে হবে।

বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গিবাদ নিরসনের জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশগুলো করা হলো :

- শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ অবারিত করা।
- প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত নৈতিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা।
- মাদ্রাসা শিক্ষা আধুনিকীকরণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীদের যথাযথ কর্মসংস্থানের সুযোগের ব্যবস্থা করা।
- কর্মমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা।
- বাংলাদেশে সকল মক্তব-মসজিদ-মাদ্রাসায় ইসলামের সঠিক ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা।
- অন্যের ধর্মসম্পর্কে কুটুক্তি না করা এবং কাউকে বিধর্মী না বলা।
- উস্কানীমূলক ধর্মীয় বক্তব্য প্রদান না করা।
- ধর্মের অপব্যবহারকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।
- ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বন্ধের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা (সকল দলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)।
- সরকার কর্তৃক কোন বিশেষ ধর্মকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান না করা।
- সুস্থ রাজনীতির বিকাশধারা অব্যাহত রাখা। (গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু রাখা)
- দারিদ্রতা দূরীকরণে স্থায়ী ও টেকসই উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা।
- শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।
- রাষ্ট্রের সকলের নাগরিকের জন্য সুশাসন (আইনের শাসন) নিশ্চিত করা।
- আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর জবাবদিহিতার বিষয়টি নিশ্চিত করা।
- আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবস্থা করা।
- জঙ্গিবাদে জড়িত ব্যক্তিদের সংশোধনের ব্যবস্থা করা ও সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা রাখা।

- বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে জঙ্গিবাদের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা করে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলা।
- পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন সুসংহত করা।
- সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করা, পাশাপাশি তরুণ সমাজকে দেশীয় সংস্কৃতি চর্চায় উৎসাহিত করা।
- তরুন ও যুব সমাজকে মাদকাশক্তির কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।
- জঙ্গিবাদের অর্থায়নের উৎস খুজে বের করা এবং এর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- জঙ্গিবাদ বিরোধী নতুন আইন তৈরি করা।
- তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

তথ্যসূত্র

১. আবুল বারকাত, *বাংলাদেশে মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির*, মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ১৫৫-১৫৬

২. জোহরা আখতার, “সন্ত্রাসবাদ : বাংলাদেশ প্রেক্ষিত”, তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ রাজনীতির চার দশক, প্রথম খণ্ড*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৯৬

৩. আবুল বারকাত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭-১৮; আরো দেখুন, আবুল বারকাত, *মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিচার-প্রসঙ্গে*, পাঠশালা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৯-১১

৪. সোহরাব হাসান, *জঙ্গিবাদ ও যুদ্ধাপরাধ*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১১

৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬

৬. আবুল বারকাত, *বাংলাদেশের মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি, (আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং), ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৩৫-৩৬

৭. বিস্তারিত দেখুন, সোহরাব হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫-১৮

৮. আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের রাজনীতি : সংস্কৃতির স্বরূপ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ২০৮

৯. বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, বাংলাদেশে মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২

১০. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮

১১. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ ডিসেম্বর ২০০৫

১২. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৯

১৩. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ ডিসেম্বর ২০০৫

১৪. আবুল বারকাত, বাংলাদেশে মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭; আরো দেখুন, আবু সাইয়িদ, “জঙ্গিবাদের উত্থান”, নূহ-উল-আলম লেনিন (সম্পাদিত), *দুঃশাসনে চার বছর সংকট ও উত্তরণের পথ*, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৬৯

১৫. এম জহিরুল হক শাকিল, “বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি”, তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত), ২০০৯, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০

১৬. সোহরাব হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪, ২৪-২৫; জোহরা আক্তার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫; মৌলবাদ-জঙ্গিবাদের বহিঃস্থ বা আন্তর্জাতিক কারণ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, বাংলাদেশে

মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২-৮৯; আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২

১৭. এ বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, বাংলাদেশে মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯-১১৬

১৮. *দৈনিক আমাদের সময়*, ৫ মার্চ ২০১৭

১৯. আবুল বারকাত, বাংলাদেশে মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮২-১৮৩

২০. উল্লিখিত পত্রিকার তথ্যগুলো আবুল ফজল হকের *বাংলাদেশের রাজনীতি:সংস্কৃতি স্বরূপ*, (অনন্যা, ঢাকা, ২০০৭) গ্রন্থের ১৯৮-২০০ নং পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া হয়েছে।

২১. সোহরাব হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

২২. Lailafar Yasmin, “Bangladesh-India Relations: Neighbourlines beyond Terrorism”, Imtiaz Ahmed (ed.) *Terrorism in the 21st Century Perspectives from Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka, 2009, p. 88

২৩. জোহরা আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩-২০৪

২৪. *The Daily Star*, 21 August 2005

২৫. জোহরা আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১১

২৬. সোহরাব হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১

২৭. নূহ-উল-আলম লেনিন, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২২৮-২২৯

২৮. আবুল বারকাত, বাংলাদেশের মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিত্বের রাজনৈতিক অর্থনীতি, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৪-৭৭

২৯. নূহ-উল-আলম লেনিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯-২৩০

৩০. Lailafar Yasmin, *op.cit.*, p. 88

৩১. জোহরা আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২

৩২. মুফতি হান্নানের জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে আরো দেখুন, আবুল বারকাত, বাংলাদেশে মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৮-১১৯

৩৩. জোহরা আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১২-২১৩

৩৪. Ali Riaz, *Bangladesh A Political History since Independence*, I.B. Tauris & Co. Ltd., London, 2016, p. 82

Dhaka University Institutional Repository

৩৫. মো. আতিকুর রহমান, *বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা*, র‍্যাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী জার্নাল ২০০৮, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৫৯

৩৬. জোহরা আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৩

৩৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪; জেএমবি কর্তৃক সংঘটিত বিভিন্ন সন্ত্রাসী হামলা সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, মো. আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০-৬২

৩৮. এম জহিরুল হক শাকিল, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯০

৩৯. এ বিষয়ে আরো দেখুন, Ali Riaz, *op.cit.*, pp. 81-82; জোহরা আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪

৪০. নূহ-উল-আলম লেনিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৫

৪১. জোহরা আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪

৪২. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৪-২১৫

৪৩. পবিত্র কোরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতিগুলো জেএমবি-এর ইশতেহার সম্বলিত লিফলেট থেকে নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ১৭ আগস্ট ২০০৫ সালে দেশব্যাপী একযোগে ৫০০টি বোমা হামলার পর তারা ঐ ইশতেহার সম্বলিত লিফলেটটি প্রচার করে।

৪৪. জোহরা আখতার *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫

৪৫. মো. আতিকুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯-৬০

৪৬. জোহরা আখতার *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫-২১৬

৪৭. তাদের অর্থের উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, আবুল বারকাত, বাংলাদেশে মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৭-১৩৮

৪৮. জঙ্গি সংগঠনগুলোর গ্রেনেড ও বোমা হামলা বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, নূহ-উল-আলম লেনিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩০-২৩৬; আবুল বারকাত, বাংলাদেশে মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫-১৫৮

৪৯. আবুল বারকাত, বাংলাদেশে মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৯

৫০. জোহরা আখতার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৬

৫১. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১১মে ২০০২

৫২. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২ জুন ২০০২

৫৩. *দৈনিক যুগান্তর*, ২৪মে ২০০৩

৫৪. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৫-১৯৬

৫৫. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬

৫৬. *সাপ্তাহিক মৃদুভাষণ*, ১৭ জানুয়ারি ২০০৩

৫৭. *আবুল ফজল হক*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৬-১৯৭; মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের রাজনীতি : যুদ্ধাপরাধী জামায়াত এবং জঙ্গি প্রসঙ্গ*, *দ্বিতীয় খণ্ড*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৩৭৭-৩৭৯

৫৮. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২৫ মার্চ ২০০২

৫৯. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ৬ জানুয়ারি ২০০২

৬০. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৭

৬১. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২

৬২. *দৈনিক যুগান্তর*, ১০ জুলাই ২০০৪

৬৩. *দৈনিক যুগান্তর*, ১ জুলাই ২০০৩

৬৪. *দৈনিক জনকণ্ঠ*, ১৩ জুন ২০০২

৬৫. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০০-২০১

৬৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১

৬৭. জেএমবি-এর লিফলেট দ্রষ্টব্য (২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী একযোগে ৫০০টি বোমা হামলার সময় তারা ঐ লিফলেটটি প্রচার করে।

৬৮. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০২-২০৩

৬৯. *দৈনিক যুগান্তর*, ১৮ আগস্ট ২০০৫

৭০. *দৈনিক যুগান্তর*, ২৩ আগস্ট, ২০০৫

৭১. *দৈনিক যুগান্তর*, ২৫ আগস্ট ২০০৫

৭২. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩

৭৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৩-২০৪

৭৪. *The Daily Star*, 3 March 2006

৭৫. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫

৭৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ৭ মার্চ ২০০৬

৭৭. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫

৭৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৫-২০৬

৭৯. *দৈনিক যুগান্তর*, ২৩ মার্চ ২০০৬

৮০. *দৈনিক প্রথম আলো*, ১৪ মার্চ ২০০৩

৮১. বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ-এর জঙ্গি কার্যক্রমের সমর্থন ও পৃষ্ঠাপোষকতা সম্পর্কে আরো দেখুন, Shamsul I Khan, S. Aminul Islam, M. Imdadul Haque, *Political Parties and the Democratic Transition in Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka, 2008, p. 229; আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৬; মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের রাজনীতি : যুদ্ধাপরাধী জামায়াত এবং জঙ্গি প্রসঙ্গ*, *প্রথম খণ্ড*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৩৪-৩৬, ১০৩-১০৫; মোহাম্মদ আবদুর রশীদ (সম্পাদিত), বাংলাদেশের রাজনীতি : যুদ্ধাপরাধী জামায়াত এবং জঙ্গি প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় খণ্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬৪-৩৬৫, ৩৯৭-৪০০

৮২. *দৈনিক প্রথম আলো*, ২ ডিসেম্বর ২০০৫

৮৩. *দৈনিক সংবাদ*, ৫ মার্চ ২০০৫

৮৪. *দৈনিক যুগান্তর*, ১০ এপ্রিল ২০০৫

৮৫. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৮

৮৬. উদ্ধৃত, আবুল বারকাত, বাংলাদেশে মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০-১৭১; জামায়াতে ইসলামীর জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে আরো দেখুন, আবু সাইয়িদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০

৮৭. আবুল বারকাত, মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিচার-প্রসঙ্গে, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২

৮৮. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০২

৮৯. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০১-২০২

৯০. *দৈনিক যুগান্তর*, ৮ মার্চ ২০০৫

৯১. *দৈনিক প্রথম আলো*, ৫ ডিসেম্বর ২০০৫

৯২. আবুল ফজল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৪

৯৩. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২০৭

৯৪. আবুল বারকাত, *বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক-অর্থনীতি*, (দ্বিতীয় সংস্করণ), একাত্তরের ঘাটক দালাল নির্মূল কমিটি, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ২৭

উপসংহার

বাংলাদেশে রাজনীতি ও ধর্ম সম্পর্কে উপরিউক্ত অধ্যায়সমূহের আলোচনা শেষে বলা যায় যে, স্বাধীনতাপূর্বকাল থেকেই বাংলাদেশে ধর্মপন্থী রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি দু'টি ধারাই চালু ছিল। বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, এতদাঞ্চলের রাজনীতিতে বরাবরই ধর্মের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। মোটাদাগে বলতে গেলে ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শুরু করে ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগ, পূর্ব পাকিস্তানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জন্ম ও বিকাশ, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ন্যায্য অধিকার ও পাওনা আদায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসমূহের আন্দোলন-সংগ্রাম এবং সর্বশেষ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টি- এর প্রতিটি পর্যায়েই রাজনীতিতে ধর্মকেন্দ্রিকতা, ধর্মের আশ্রয় এবং ধর্মের নানামুখী ব্যবহার হয়েছে। তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর চরম নেতিবাচক ভূমিকা ধর্মপন্থী রাজনীতিকে ভীষণভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পূর্ববাংলার প্রধান ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীসহ অন্য কয়েকটি ইসলামি রাজনৈতিক দল ধর্ম রক্ষায় ভ্রান্ত অজুহাত দেখিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং পাকিস্তান সামরিক জান্তার সকল প্রকার বর্বরতাকে সমর্থন করে। তারা বাংলার মুক্তিকামী জনতার উপর নারকীয় অত্যাচার ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর দোসর হয়ে শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস প্রভৃতি ইউনিটের মাধ্যমে তারা স্বাধীনতা বিরোধী সকল কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। হত্যা, ধর্ষণ, বাড়ীতে-ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ, জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণ, জমি দখল, সম্পদ লুট প্রভৃতি নাশকতা ও মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডে তারা নিজেদেরকে ব্যাপৃত রাখে। বিশেষ করে তারা বহুকাল ধরে এদেশে বসবাসরত হিন্দু জনগোষ্ঠীর সঙ্গে চরম সাম্প্রদায়িক আচরণ করে। এসকল কর্মকাণ্ডের জন্য তখন তারা দেশে-বিদেশে নানাভাবে সমালোচনার সম্মুখীন হয়।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের জনগণ তাদের বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভে সক্ষম হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে প্রথম যে সংবিধান রচিত হয় তাতে ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ফলে জামায়াতে ইসলামীসহ ধর্মপন্থী অন্যান্য দলের নেতা-কর্মীরা তখন নিশ্চুপ থাকে। জামায়াতে ইসলামী দলটির মূল নেতৃবৃন্দের অনেকেই পাকিস্তানে পালিয়ে যায়। এর

ফলে ধর্মপন্থী রাজনীতি এসময় মোটামুটি স্তিমিত হয়ে যায়। এরপর স্বাধীন বাংলাদেশে ধীরে ধীরে আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি সাধিত হতে থাকে। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান স্বাধীনতার স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। দৃশ্যত সেনাবাহিনীর কিছু বিপথগামী সদস্য এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি সামরিক শাসন থেকে মুক্তির মাত্র পাঁচ বছর সময়ের ব্যবধানে বাংলাদেশ আবার সামরিক শাসনের কবলে পড়ে। এরপর দুইজন সামরিক শাসকের অধীনে সুদীর্ঘ ১৫ বছর বাংলাদেশে সামরিক শাসন বহাল ছিল। দেশে তখন পাকিস্তানি ভাবধারা প্রবেশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এ সময়কালে সামরিক শাসকবর্গ তাদের সুবিধামতো সামরিক বিধি-বিধান ও সংবিধান লঙ্ঘন, অসাংবিধানিক পন্থায় সংবিধানের মূল চেতনার পরিবর্তন ও সংশোধন, রাষ্ট্র ও প্রশাসনে সামরিকীকরণ, রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন রাজনৈতিক দল গঠন, রাষ্ট্রধর্ম প্রণয়নসহ বহুবিধ রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদেরকে ব্যাপৃত রাখেন। বিশেষ করে এসময় তারা দেশের জনগণের ধর্মভীরুতাকে পুঁজি করে বিভিন্ন কৌশলে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করেছেন এবং এর উপর ভিত্তি করে জনগণের গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি পরিবর্তন ও রাষ্ট্র ধর্ম প্রচলনের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। বস্তুত অবৈধভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের দূর্বলতাকে আড়াল করার জন্য তারা ধর্মকেন্দ্রিকতাকে একটি কৌশল হিসেবে বেছে নেন। মূলত জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৬ সাল ক্ষমতায় এসে রাজনীতিতে ধর্মের গুরুত্বকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিতে থাকেন। তিনি স্বাধীনতার পর নিষিদ্ধ ঘোষিত ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোকে পুনরায় রাজনীতি করার সুযোগ প্রদান করেন। আর এর মধ্য দিয়ে দেশে ধর্মপন্থী রাজনীতির দ্বার পুনরায় উন্মুক্ত হয়ে যায়। এ সুযোগে তখন ধর্মপন্থী কিছু রাজনৈতিক দলের পুনরুত্থান ঘটে এবং নতুনভাবে ধর্মকেন্দ্রিক বহু রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা লাভ করে। উল্লেখ্য যে, তখন জামায়াতে ইসলামী দলটি তাদের নেতা গোলাম আযমকে আহ্বায়ক করে ‘পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার কমিটি’ গঠন করেছিল। ধর্মপন্থী দলগুলো তখন সামরিক শাসকবর্গের নানারকম পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। ধর্মকেন্দ্রিক দলগুলোর পুনরুত্থান ও রাষ্ট্র কর্তৃক ধর্ম ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এসময় বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি নতুন ধারার সূচনা হয়। তারপর নানা প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এদেশে ধর্মপন্থী রাজনীতির বহমানতা টিকে আছে।

এদেশে গোড়ার দিকে ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধর্মপন্থী রাজনীতির প্রচলন শুরু হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে এসে ধর্মপন্থী রাজনীতির চরিত্র অনেকটা

পাল্টে যায়। এ পর্যায়ে এসে সাম্প্রদায়িকতা ও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হওয়ার লড়াই হয়ে যায় ধর্মপন্থী রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে পাকিস্তান আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার ও ধর্মপন্থী রাজনীতির প্রাবল্য বেশি মাত্রায় পরিদৃষ্ট হতে শুরু করে। পুরো পাকিস্তান পর্বেই এ ধারা অব্যহিত ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মপন্থী দলগুলো ঐ একই বৈশিষ্ট নিয়ে পথ চলা শুরু করে। এ দলগুলোর রাজনীতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, নানা নামে বিভক্ত থাকলেও এদের লক্ষ্য ও কর্মসূচি মোটামুটি একই রকমের। বিভিন্ন সময় এ দলগুলো যে কয়েকটি জোট গঠন করেছে সেগুলো পর্যালোচনা করলেও স্পষ্ট হয় যে, এরা সকলেই ইসলামি আইন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়কে সামনে রেখে রাজনীতি করছে। আবার বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে সকল ধর্মপন্থী দলের নীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তারা সকলেই প্রতিবেশী হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ রাষ্ট্র ভারতের বিরোধিতাকারী। এর মূলে রয়েছে ধর্মভিত্তিক দ্বি-জাতিতত্ত্বের চেতনা এবং ঐতিহাসিকভাবে হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষের ধারাবাহিকতা। ভারত বিরোধিতার অন্যতম আরেকটি প্রধান কারণ হলো বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে ভারতের অকৃত্রিম সহযোগিতা। বাংলাদেশের ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর মূল লক্ষ্য হলো ধর্মানুরাগী মানুষের সংবেদনশীলতার সুযোগ নিয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার পরিবর্তে পশ্চাদমুখী অনাধুনিক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

ধর্মপন্থী রাজনীতির ফলে বাংলাদেশে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৭৫ এর পর রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বাদ দেওয়া এবং ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম করার ফলে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয়:

(ক) রাষ্ট্রের সকল নাগরিক সমান বলে সংবিধানের যে আইন আছে সেটি লঙ্ঘিত হয়।

(খ) আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি নষ্টের ঝুঁকি তৈরি হয়।

(গ) রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি বিশেষ ধর্মকে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে ধর্মীয় দিক থেকে রাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণ প্রমাণিত হয়।

(ঘ) অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা বৈষম্যের স্বীকার হন।

(ঙ) ইসলাম ধর্মপন্থী রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া ধর্মপন্থী রাজনীতির ফলে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব, প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা বাঁধাগ্রস্ত হওয়া, বিভিন্ন নির্বাচন উপলক্ষ্যে ধর্মের ব্যবহার, নির্বাচনী সহিংসতা, ধর্মীয় উগ্রবাদ বা জঙ্গিবাদের উদ্ভবসহ নানান সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এদেশের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান। ইসলাম

ধর্মকে রাষ্ট্র ধর্ম করা ও ধর্মপন্থী বহু সংখ্যক দলের সৃষ্টি হওয়ার ফলে অন্যতম প্রধান যে সমস্যাটি সৃষ্টি হয় সেটি হলো ধর্মীয় সম্প্রদায়িকতার উদ্ভব। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুকে কেন্দ্র করে এদেশের ধর্মপন্থী দলের একটি চিহ্নিত অংশ অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সাম্প্রদায়িক আচরণ করতে শুরু করে। বিশেষ করে বিভিন্ন জাতীয় নির্বাচনের আগে ও পরে এ ধরনের প্রবনতা দেখা যায়। এছাড়া প্রতিবেশী কোন দেশে মুসলিম সম্প্রদায় কোনভাবে আক্রান্ত হলে দেশের সংখ্যালঘুদের উপর তার নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মূলত এ দু'টি প্রক্রিয়াতেই জন-জীবনে ধর্মীয়- সাম্প্রদায়িক আচার-আচরণ উৎসাহিত হওয়া শুরু হয়। এর ফলে দেখা যায় যে, মুক্তবুদ্ধি ও অসাম্প্রদায়িকতার যে চেতনা নিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল, সে চেতনা অচিরেই ম্লান হয়ে যায়। দ্বিতীয় সামরিক শাসনামলের শেষ দিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাসীন চক্রের সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিকবার বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়। উদাহরণস্বরূপ ১৯৯১ সালে ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রতিক্রিয়ায় রাষ্ট্রীয় আনুকূল্যে কিছু ধর্মীয় উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর উস্কানিতে সাধারণ মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের জান-মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ১৯৯১ সালে গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত হলেও বাংলাদেশে ধর্মপন্থী রাজনীতির অবসান হয়নি। ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝিতে বিএনপি সরকারের আমলে ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর সন্ত্রাসী ও বে-আইনী কর্মকাণ্ডের তৎপরতা এবং ফতোয়াবাজীর দাপট সমগ্র দেশে এক ভয়াবহ ও অস্বস্তিকর পরিবেশ তৈরি করে। ধর্মপন্থীরা ধর্মের খণ্ডিত ব্যাখ্যা প্রদান, ধর্মের নামে প্রচলিত কুসংস্কার ব্যবহার, নারীর শিক্ষা ও কাজের অধিকারে বাঁধা প্রদান, বুদ্ধিজীবী, মুক্তচিন্তাবিদ এবং প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকদের নানাভাবে হয়রানি করে সমাজ রূপান্তর ও রাষ্ট্রীয় অগ্রযাত্রাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির শক্তির দাপটে সমাজের সাধারণ মানুষ তখন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

ধর্মপন্থী রাজনীতির আরেকটি নেতিবাচক প্রভাব হলো নির্বাচনপূর্ব ও নির্বাচনোত্তর সহিংসতা এবং সংখ্যালঘু নির্যাতন। হিন্দু সম্প্রদায় এবং ধর্মনিরপেক্ষ উদার গণতন্ত্রী দলের নেতা-কর্মীদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন এক্ষেত্রে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। মূলত '৯০-এর দশক থেকেই ধর্মপন্থী দলগুলোর একটি চিহ্নিত অংশ বিভিন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উদারপন্থী দলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে সহিংস কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আগমণ পর্যন্ত ধর্মপন্থীদের এহেন উগ্রতা অব্যাহত থাকে। বিশেষ করে ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরে পরাজিত বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীরা বিজয়ী দল আওয়ামী লীগের সমর্থক ও সংখ্যালঘুদের উপর ব্যাপক হামলা চালায়। ২০০১ সালের জাতীয়

সংসদ নির্বাচনের পর বিজয়ী বিএনপি-জামায়াত ও চার দলীয় জোটের সমর্থকদের একটি অংশ সংখ্যালঘু নির্যাতনসহ পরাজিতদের উপর বহু অমানবিক নির্যাতন চালিয়েছে। এ অমানবিক অত্যাচার-নির্যাতন নিয়ে দেশে-বিদেশে তখন সমালোচনা ও নিন্দার ঝড় বয়ে যায়। কিন্তু ক্ষমতাসীনরা তাতে কর্ণপাত করেনি। এমনকি বহু অভিযোগের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও অভিযুক্তদের আইনের আওতায় আনা হয়নি। সহিংসতামূলক এ ধরনের কার্যক্রম ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি ক্রমান্বয়ে উগ্রবাদী রাজনীতিকে আরো উস্কে দেয়। ২০০১ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চার দলীয় জোট সরকার গঠন করলে প্রধান ধর্মপন্থী দল জামায়াতে ইসলামী পর্যায়ক্রমে তিনটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করে। ক্ষমতার অংশীদারিত্ব লাভ করে তারা নানাভাবে এর অপব্যবহার করে। মুসলিম সম্প্রদায়ের ভিন্ন মতের অনুসারী আহমদিয়াদের মসজিদে এসময় আক্রমণ হয়। সরকারি পর্যায়ে আহমাদিয়াদের প্রকাশনা নিষিদ্ধ করা হয়। ধর্মপন্থী রাজনীতির এহেন কর্মকাণ্ড নিশ্চিতভাবেই ইসলামের সহনশীলতার শিক্ষাকে নস্যাৎ করে দেয়।

২০০৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নানা কৌশলে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করেছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু ও জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে দলগুলো নানাভাবে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। এর মধ্যে ধর্মপন্থী দলগুলো স্বাভাবিকভাবেই রাজনীতিতে ধর্মের সরাসরি ব্যবহার করেছে। অন্যদিকে ক্ষমতায় বসে অথবা বিরোধী দল হিসেবে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য প্রায় সকল প্রধান রাজনৈতিক দল বহুমাত্রায় ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করেছে। ধর্ম ব্যবহারকারীদের বাইরে ধর্ম নিরপেক্ষ দলগুলোও এক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারেনি। প্রধান ধর্মনিরপেক্ষ দল আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকাকালে নানা কারণে জনগণের সামনে ধর্মপন্থী রাজনীতির কুফলের বিপরীতে অনুসরণীয় আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রধান ধর্মনিরপেক্ষ দলটি বিভিন্ন সময় ধর্মপন্থীদের সঙ্গে নানাকারণে নির্বাচনী বোঝাপড়া ও বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে। এজন্য একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশে ধর্মপন্থী রাজনীতির বিকাশের জন্য ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর দূর্বলতার কিছুটা হলেও দায় আছে। তবে একইসঙ্গে একথাও উল্লেখ করতে হয় যে, ধর্মীয় রাজনৈতিক দলগুলোর চরম মাত্রায় ধর্মকেন্দ্রিকতার কারণে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ঐ শক্তিকে মোকাবেলা করার জন্য ধর্মনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বিশ্বাসী দলগুলো কখনো কখনো ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করেছে।

এখানে আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে ধর্মপন্থী রাজনীতিকে জায়গা করে দিয়েছে বিএনপি ও জাতীয় পার্টি। আওয়ামী লীগ ১৯৭৫ সালের পর রাজনীতিতে পথচলার সময়

ধর্মপন্থী দলগুলোকে প্রতিষ্ঠিত দল হিসেবেই পেয়েছে। আর ধর্মপন্থী এ দলগুলোকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করার জন্য আওয়ামী লীগকেও বেশ বেগ পেতে হয়েছে। রাজনীতির দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় ধর্মীয় দলগুলোর সঙ্গে কোন কোন সময় আওয়ামী লীগকে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশে ধর্মপন্থী রাজনীতির জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ী করা যায় না। কেননা, ধর্মীয় রাজনৈতিক দলের অনুরূপ সাম্প্রদায়িকতা, সংখ্যালঘু নির্যাতন, ধর্মীয় উগ্রবাদী কর্মকাণ্ড প্রভৃতির সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোন সম্পৃক্ততা নেই। ১৯৭২ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সংবিধানে ধর্মপন্থী রাজনীতি নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এ মহান নেতার নির্মম হত্যাকাণ্ডের পর স্বাধীনতা বিরোধীদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। সামরিক শাসকবর্গ তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। ফলে ধর্মপন্থী রাজনীতির পুনরজ্জীবন ঘটে। খুব সচেতনতার সঙ্গে এসময় ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো হয়। ১৯৯৬ সালে ২১ বছরের ব্যবধানে অল্প সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসে। ক্ষমতা থাকাকালে নানাবিধ সীমাবদ্ধতার মধ্যেও দলটি ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে মোটাদাগে ধরে রাখে। এরপর ২০০৮ সালে পুনরায় ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচার চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করা, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা ও তাদের বিচারকার্য সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া শুরু করে। সর্বোপরি ধর্মপন্থী জঙ্গিবাদী কার্যক্রম বন্ধে দলটি 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করে। এসব দিক বিবেচনা করলে নতুন শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত বাংলাদেশে ধর্মপন্থী রাজনীতির বিস্তারের জন্য আওয়ামী লীগকে দায়ি করা যায় না।

'৯০-এর দশকের শুরুতে এদেশে ধর্মপন্থী রাজনীতির একটি বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়। সেটি হলো ইসলামের নাম ব্যবহারকারী বিভিন্ন উগ্রপন্থী ধর্মীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উত্থান। বিশেষ করে '৯০-এর দশকের একেবারে শেষ দিক থেকে ইসলামি জঙ্গিসংগঠনগুলো দেশের বিভিন্ন স্থানে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড শুরু করে। এরপর থেকে বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন নেতৃত্বে বহু জঙ্গি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে ২০০৫ সালে জেএমবি নামক একটি জঙ্গি সংগঠন সারাদেশে ৬৩টি জেলায় একযোগে ৫০০টি বোমা বিস্ফোরণ করে। এতে বহুলোক হতাহত হয়। জেএমবি-এর বোমা বিস্ফোরণের আগ পর্যন্ত এ দেশের জনগণ জঙ্গিবাদ বিষয়টিকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেনি। কিন্তু এ ঘটনার পর জঙ্গিবাদের বিষয়টি জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়। পাশাপাশি এসময় থেকে জঙ্গিবাদ সম্পর্কে জনমনে এক ধরনের ভীতি কাজ করতে শুরু করে। জঙ্গি সংগঠনগুলোর নাশকতামূলক কার্যক্রমের ফলে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। উল্লেখ্য যে, এ জঙ্গি

সংগঠনগুলো ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে ভর করে তাদের প্রচারকার্য চালাতে থাকে। বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার রিপোর্ট, দেশে-বিদেশে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনসমূহ ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মোটামুটি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, দেশের প্রচলিত ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোই এসব জঙ্গি সংগঠনকে কোন না কোনভাবে আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে জামায়াতে ইসলামীর সংশ্লিষ্ট থাকার বিষয়টি অনেক গবেষণাতেই স্থান পেয়েছে।

আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন সেটি হলো- জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর রাজনীতির দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় দেখেছে যে, স্বাধীন বাংলাদেশে কোন ক্রমেই তাদের সফলকাম হওয়া সম্ভব নয়। এজন্য তারা ২০০১ সালে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব লাভ করার পর সুযোগ বুঝে জঙ্গিবাদের মাধ্যমে তাদের উগ্রপন্থী রাজনৈতিক শক্তির চেহারা প্রকাশ করছে। অনেকের মতে, এ জঙ্গিবাদী ধারা আসলে জামায়াতে ইসলামী-এর একটি বিশেষ সামরিক শাখা।

তবে জঙ্গিবাদের উত্থানের পিছনে শুধুমাত্র ধর্মপন্থী রাজনীতিতে চিহ্নিত করা হলে এ সমস্যা অনুধাবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বস্তুত ধর্মপন্থী রাজনীতির সঙ্গে দেশের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক পশ্চাদপদ অবস্থাও জঙ্গিবাদ উত্থানের পিছনে কাজ করেছে। আর এর সঙ্গে বৈশ্বিক রাজনীতির বিভিন্ন কারণও যুক্ত হয়েছে। তবে এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বৈশ্বিক ধর্মপন্থী জঙ্গি সংগঠনগুলো কোন না কোনভাবে যুক্ত হয়েছে দেশের প্রচলিত ধর্মপন্থী ও ধর্মনির্ভর রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে। ২০০১-২০০৬ সময়কালে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের প্রকোপ সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আন্তর্জাতিক চাপের মুখে কিছু ক্ষেত্রে তৎকালীন সরকার সামান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তা মারাত্মক এ সমস্যা সমাধানে খুব একটা সহায়ক হয়নি। এরপর ২০০৭-২০০৮ সাল পর্যন্ত সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করেন। তারা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেন। এর ফলে জঙ্গিবাদী সংগঠনগুলোর কার্যক্রম তখন সংকুচিত হয়ে পড়ে। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দেশের জনগণ ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর জোটকে ভোটে প্রত্যাখ্যান করে। এ নির্বাচনে স্বাধীনতার পক্ষের দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ও তার শরিক দলগুলো ব্যাপকভাবে বিজয় লাভ করে।

২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে উদারপন্থী আওয়ামী লীগ ও মহাজোটের বিজয়ের মূল কারণগুলো ছিল নিম্নরূপ :

(ক) ২০০১-২০০৬ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় জামায়াতে ইসলামীর প্রভাব ছিল লক্ষ্যণীয় পর্যায়ে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে তারা নানাভাবে নিজেদেরকে সংগঠিত করেছে ও ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। তারা এসময় ধর্মের নামে নানা ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। '৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় ধর্মের অপব্যাখ্যা ও অপব্যবহার করে জামায়াতে ইসলামী ও তার সমমনা দলগুলো মানবতাবিরোধী যেসব অপরাধ করেছিল, সেগুলোর সঙ্গে এ পর্যায়ে ধর্মপন্থী এ দলটির একই ধরনের কর্মাকাণ্ড পরিলক্ষিত হয়। স্বাধীনতা বিরোধী ধর্মপন্থী শক্তির এ আস্ফালন জনগণ ভালো চোখে দেখেনি।

(খ) একবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার নব উন্মেষ ঘটতে থাকে। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়। ধর্মের অপব্যবহারকারী '৭১ সালের যুদ্ধপরাধীদের বিচারের বিষয়টি তাদের কাছে বিশেষভাবে সাড়া পায়। আর ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে এ তরুণ প্রজন্মের অনেকেই নতুন ভোটার হন এবং তারা মূলত আওয়ামী লীগ ও মহাজোটকে সমর্থন প্রদান করেন।

(গ) বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের 'পরিবর্তনের রাজনীতি' ও 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার ঘোষণা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে প্রচণ্ড সাড়া জাগায়।

(ঘ) ইসলামপন্থী দলগুলোর আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে ধর্মহীনতা ও ভারত প্রীতির অভিযোগ এ নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যর্থ হয় এবং

(ঙ) ইসলামপন্থী রাজনীতির নামে দেশে জঙ্গিবাদ ও উগ্রপন্থী রাজনীতির যে উন্মেষ ঘটে, ভোটের মাধ্যমে জনগণ তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানায়।

মূলত সামরিক শাসনামল থেকেই (১৯৭৬) বাংলাদেশের রাজনীতিতে দু'টি ধারা স্পষ্ট রূপ লাভ করে। একটি ধর্মনিরপেক্ষ ধারা, অপরটি ধর্মপন্থী ধারা। ১৯৯০ সালে সামরিক শাসনের অবসান হলে, গণতন্ত্র পুনরায় পথচলা শুরু করে। কিন্তু তখন থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ ধারার দলগুলো বিশেষত আওয়ামী লীগ ও বাম দলগুলোর বিরুদ্ধে ধর্মপন্থী দলগুলো নানা ধরনের ধর্মীয় অপপ্রচার চালাতে শুরু করে। তাদেরকে নাস্তিক-কাফের-মুরতাদ প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করতে থাকে। সর্বোপরি তারা সামরিক আমলের মতই প্রচার করে যে, ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলো ক্ষমতায় এলে ইসলাম ধর্ম দেশ থেকে উঠে যাবে, বিসমিল্লাহ্ উঠে যাবে, মসজিদে আযানের পরিবর্তে উলুধ্বনি হবে এবং দেশ ভারতের কাছে বেচে দেওয়া হবে। এভাবে ধর্মপন্থী দলগুলো ধর্মীয়ভাবে আবেগপূর্ণ জনসাধারণকে অনেক সময় সহজেই বোঝাতে সক্ষম হয় যে, এদেশে তারাই ইসলামের রক্ষক। অবশ্য ১৯৯৬ সালে

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হয়। লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, ২০০৬ সাল পর্যন্ত সহিংস তৎপরতার মাধ্যমে জঙ্গিবাদীরা সমাজ-রাষ্ট্র-জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন তুললেও কট্টর ধর্মপন্থী দলগুলো জঙ্গিবাদ থেকে তেমন কোন নির্বাচনী সুবিধা বা সুফল লাভ করতে পারেনি। একটি বিশেষ গোষ্ঠী ছাড়া তাদের তেমন কোন সমর্থক সৃষ্টি হয়নি। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনসমূহের মোট ভোটের সংখ্যা থেকেও এ বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়। বস্তুত ধর্মপন্থী দলগুলো ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির চাপ, জনগণের ধর্মীয় আবেগ ব্যবহার, পরকালের ভীতি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্ষমতায় যাবার ও টিকে থাকার বাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করতে চাইলেও, এদের ভোট বৃদ্ধির তেমন কোন সম্ভাবনা ২০০৮ সালের নির্বাচন পর্যন্ত দেখা যায়নি। এছাড়াও বিভিন্ন শাসক দলের উপর বিভিন্ন উপায়ে প্রভাব বিস্তার এবং কখনো কখনো ক্ষমতার অংশীদারিত্ব লাভের মধ্য দিয়ে ধর্মপন্থী দলগুলো সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছে এবং ধর্মপন্থী রাজনীতির শিকড় শক্ত করার চেষ্টা করেছে। এতদসত্ত্বেও ২০০৮ সাল পর্যন্ত অধিকাংশ ধর্মপন্থী দল জনসমাজে তাদের সমর্থনের ব্যাপক বৃদ্ধির কোন প্রমাণ দানে সক্ষম হয়নি। অর্থাৎ তাদের সমর্থনকারীদের সংখ্যা একটি নির্দিষ্ট পর্যায়েই রয়ে গেছে। তথাপি উপরিউক্ত কৌশলগুলো ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এসব দল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমর্থক গোষ্ঠী নিয়ে রাজনীতিতে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে।

সবশেষে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই যে, ধর্মের নামে এবং ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার করে এদেশের মানুষের উপর বহু অন্যায়-অত্যাচার ও শোষণ-নিপীড়ন চালানো হয়েছে। ধর্মপন্থী রাজনীতি এদেশে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় উম্মাদনা, কুসংস্কার, কুপমণ্ডুকতা ও জঙ্গিবাদের বিষবাষ্প ছড়িয়েছে। ২০০৮ সাল থেকে বাংলাদেশ জঙ্গিবাদ বিরোধী শক্ত অবস্থান গ্রহণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ ও প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এরপর থেকে ধর্মপন্থী দলগুলো নানা সময়ে শক্তিমত্তার প্রদর্শন করলেও প্রকৃত বিচারে তাদের অবস্থান ক্রমাগত দূর্বল হচ্ছে। এসব দিক বিবেচনা করলে ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষধারার সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তির আন্দোলন ও পরবর্তীতে ২০০৭-২০০৮ সময়কালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এ আন্দোলন ব্যাপকতর হয়ে উঠার বিষয়টি বাংলাদেশে ধর্মপন্থী রাজনীতির গবেষণায় বড় উপাদান হয়ে থাকবে।

২০০৮ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি মৌলিক পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে মানবতা বিরোধী অপরাধে সংশ্লিষ্ট ধর্মপন্থী

রাজনীতিকদের বিচার, ধর্মপন্থী প্রধান রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল ও ২০১১ সালে সংবিধান সংশোধনীর মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি পুনঃগ্রহণের মতো বাস্তবতাগুলোকে গত এক দশকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রমাণ হিসেবে দেখা যেতে পারে। তবে এসময়কালে ধর্মপন্থীরা নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে ক্রমাগত সহিংস কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে শান্তির ধর্ম ইসলাম ও বাঙালি মুসলমানের সহনশীলতার ভাবমূর্তিকে বিশ্বব্যাপী প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। গত এক দশকে বাংলাদেশের ধর্মপন্থী দলগুলোর নানাবিধ কর্মকাণ্ড কীভাবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ বিনির্মাণের প্রচেষ্টাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তা নিয়ে অদূর ভবিষ্যতে একটি মৌলিক গবেষণা সম্পাদন করা একান্ত প্রয়োজন।

পরিশিষ্ট -১

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের (১৯৭১) ঐতিহাসিক ভাষণ

আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সকলে জানেন এবং বোঝেন আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো এবং এদেশের ইতিহাসকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবেন। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি বাংলাদেশের করুণ ইতিহাস, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস-এই রক্তের ইতিহাস মুমূর্ষ মানুষের করুণ আর্তনাদ-এদেশের করুণ ইতিহাস, এদেশের মানুষের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে আমরা রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারিনি। ১৯৫৮ সালে আয়ুব খাঁ মার্শাল-ল জারী করে ১০ বছর আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৪ সালে ৬-দফা আন্দোলনের সময় আমাদের ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আয়ুব খাঁর পতনের পরে ইয়াহিয়া এলেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব বললেন দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন-আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হোল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসাবে তাকে অনুরোধ করেছিলাম ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমাদের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দিতে। তিনি আমার কথা রাখলেন না, রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, মার্চ মাসে প্রথম সপ্তাহে সভা হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা এসেমব্লিতে বসবো। আমি বললাম, এসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করবো-এমনকি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশী হলেও একজনের মতেও যদি তা ন্যায্য কথা হয়, আমরা মেনে নেব।

ভুট্টো সাহেব এখানে ঢাকায় এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম-আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো-সবাই আসুন বসুন। আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরী করবো। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বর যদি আসে তাহলে কসাইখানা হবে এসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যে যাবে তাদের মেরে

ফেলে দেওয়া হবে, যদি কেউ এসেমব্লিতে আসে পেশোয়ার থেকে করাচী পর্যন্ত জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেমব্লি চলবে। আর হঠাৎ ১ তারিখ এসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে এলেন। তারপর হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হোল, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষের, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। দেশের মানুষ প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হোল। আমি বললাম, আমরা জামা কেনার পয়সা দিয়ে অস্ত্র পেয়েছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য, আজ সেই অস্ত্র আমার দেশের গরীব-দুঃখী মানুষের বিরুদ্ধে- তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু-আমরা বাঙালীরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে।

আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরীবের উপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের উপর গুলী করা হয়েছে। কিভাবে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, আপনি দেখুন। তিনি বললেন আমি ১০ তারিখে রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স ডাকবো।

আমি বলেছি, কিসের এসেমব্লি বসবে; কার সঙ্গে কথা বলবো? আপনারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছেন, তাদের সঙ্গে কথা বলবো? পাঁচ ঘন্টার গোপন বৈঠকে সমস্ত দোষ তারা আমাদের উপর, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন। দায়ী আমরা!

২৫ তারিখ এসেমব্লি ডেকেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। ১০ তারিখে বলেছি, রক্তে পাড়া দিয়ে, শহীদের উপর পাড়া দিয়ে, এসেমব্লি খোলা চলবে না। সামরিক আইন মার্শাল-ল' Withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকের ভিতর ঢুকতে হবে। যে ভাইদের হত্যা করা হয়েছে তাদের তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো আমরা এসেমব্লিতে বসতে পারবে। কি পারবো না। এর পূর্বে এসেমব্লিতে আমরা বসতে পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব চাই না। দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারী, আদালত-ফৌজদারী, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরীবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য যে সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলি

আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, গরুরগাড়ী, রেল চলবে-শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রীমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনকিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেওয়া না হয়, এরপর যদি ১টি গুলি চলে, এরপর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়-তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে, এবং জীবনের তরে রাস্তা ঘাট যা যা আছে সবকিছু- আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। সৈন্যরা, তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, তোমাদের কেউ কিছু বলবে না। কিন্তু আর তোমরা গুলী করবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দুর পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আওয়ামী লীগ অফিসে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর ৭ দিন হরতালে শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌছে দেবেন। সরকারী কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন ওয়াপদা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হোল-কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখুন, শত্রু পিছনে ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়-হিন্দু-মুসলমান যারা আছে আমাদের ভাই, বাঙালী, অ-বাঙালী-তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, কর্মচারীরা, রেডিও যদি আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোন বাঙালী রেডিও ষ্টেশনে যাবে না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, তাহলে টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘন্টা ব্যাঙ্ক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনে পত্র নিতে পারবে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে।

এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা চলছে-বাঙালীরা বুঝেসুজে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন। এবং আমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। রক্ত যখন দিয়েছি, আরো রক্ত দেবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে তুলবো ইনশাআল্লা। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা ॥

[উৎস : হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র : ২য় খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ. ৭০০-৭০২]

পরিশিষ্ট- ২

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের তালিকা

[স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জরিপের মাধ্যমে যে সকল রাজনৈতিক দলের নাম পাওয়া গেছে, সে দলগুলোর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হলো:]

১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

২. বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল (বিএনপি)

৩. জাতীয় পার্টি (এরশাদ)

৪. জাতীয় পার্টি (মঞ্জু)

৫. বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (নাজিউর)

৬. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (বর্তমানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)

৭. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

৮. ওয়ার্কার্স পার্টি

৯. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-রব)

১০. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-ইনু)

১১. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ-মহিউদ্দিন)

১২. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-খালেকুজ্জামান)

১৩. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ-মাহবুব)

১৪. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর)

১৫. গণফোরাম

১৬. গণতন্ত্রী পার্টি

১৭. গণআজাদী লীগ (সামাদ)

১৮. গণআজাদী লীগ (আলম)

১৯. শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল

২০. জনমুক্তি পার্টি

২১. বাংলাদেশ পিপলস লীগ

২২. ঐক্য প্রক্রিয়া

২৩. প্রগতিশলী জাতীয়তাবাদী দল

২৪. ফ্রিডম পার্টি (ফারুক)

২৫. ফ্রিডম পার্টি (রশীদ)

২৬. ডেমোক্রেটিক লীগ

২৭. ডেমোক্রেটিক লীগ (অলি আহাদ)

২৮. কৃষক শ্রমিক পার্টি (সোলায়মান)

২৯. কৃষক শ্রমিক পার্টি (আজিজ)

৩০. জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টি (জাগপা)

৩১. জাতীয় দল (হুদা)

৩২. যুক্তফ্রন্ট

৩৩. বাংলাদেশ লেবার পার্টি (মতিন)

৩৪. ইউপিপি (সাদেক)

৩৫. ইউপিপি (আবেদিন)

৩৬. জাতীয় জনতা পার্টি (নুরুন)

৩৭. জাতীয় জনতা পার্টি (আসাদ)

৩৮. প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক পার্টি

৩৯. ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি

৪০. ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি (জাহিদ)

৪১. বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক পার্টি

৪২. বাংলাদেশ জনতা দল

৪৩. মুসলিম লীগ (কাদের)

৪৪. মুসলিম লীগ (মতিন)

৪৫. মুসলিম লীগ (ইউসুফ)

৪৬. মানবতাবাদী দল

৪৭. বাংলাদেশ জাতীয় পিপলস পার্টি

৪৮. বাকশাল

৪৯. জাতীয় খেলাফত পার্টি

৫০. ফ্রিডমোটিক পার্টি

৫১. বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টি

৫২. পাকমন পিপলস পার্টি

৫৩. ফ্রিডম লীগ

৫৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ

৫৫. স্বাধীনতা পার্টি

৫৬. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন

৫৭. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (আজিজ)

৫৮. খেলাফত আন্দোলন (আশরাফ)

৫৯. খেলাফত আন্দোলন (হাবিবুলাহ)

৬০. বংলাদেশ ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি

৬১. বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন

৬২. জাতীয় ওলামা ফ্রন্ট

৬৩. জাতীয় মুক্তি আন্দোলন

৬৪. জাস্টিস পার্টি

৬৫. লেবার পার্টি (মোস্তফা)

৬৬. বাংলাদেশ ন্যাশনাল লেবার পার্টি

৬৭. ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ

৬৮. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি

৬৯. মুসলিম লীগ ঐক্য

৭০. নয়া গণতান্ত্রিক পার্টি

৭১. ইসলামী ঐক্য আন্দোলন

৭২. ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন

৭৩. বাংলাদেশ হিন্দু ঐক্য ফ্রন্ট

৭৪. বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ

৭৫. বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু পার্টি

৭৬. আওয়ামী উলেমা পার্টি

৭৭. নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি

৭৮. মুসলিশ জাতীয় দল

৭৯. বাংলাদেশ আওয়ামী ইসলামী পার্টি

৮০. বাংলাদেশ লেবার পার্টি (মোতালেব)

৮১. মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল

৮২. বাংলাদেশ জমিয়ত-ই-উলামা-ই-ইসলামী

৮৩. জাতীয় উলেমা দল

৮৪. বাংলাদেশ গণ মুসলিম লীগ

৮৫. বাংলাদেশ ইসলামী পার্টি (আশরাফ)

৮৬. বাংলাদেশ ইসাম বিপবী পরিষদ

৮৭. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি

৮৮. বাংলাদেশ নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি (সাইদ)

৮৯. নেযাম-ই-ইসলাম পার্টি (বদরপুরী)

৯০. নেযাম-ই-ইসলাম পার্টি (আশরাফ)

৯১. বাংলাদেশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি

৯২. বাংলাদেশ ডেমোক্রিটিক পার্টি

৯৩. বাংলাদেশ নাগরিক সংহতি

৯৪. বাংলাদেশ কংগ্রেস

৯৫. জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক চাষী দল

৯৬. বাংলাদেশ ন্যাশনাল কংগ্রেস

৯৭. জাতীয় পলী দল

৯৮. ন্যাশনাল রিপাবলিকান পার্টি

৯৯. বাংলাদেশ পিপলস লীগ (কাজী)

১০০. বাংলাদেশ পিপল লীগ (মাহবুব)

১০১. ন্যাশনাল রিপাবলিকান পার্টি

১০২. বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি (সুক্কু মিয়া)

১০৩. বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি (শরাফত)

১০৪. জাতীয় জনতা পার্টি (খান)

১০৫. জাতীয় জনতা পার্টি (ওয়াদুদ)

১০৬. জাতীয় জনতা পার্টি (সুজাত)

১০৭. গণতান্ত্রিক বিপবী জোট

১০৮. সাম্যবাদী দল (বড়ুয়া)

১০৯. প্রোগ্রেসিভ ন্যাশনালিস্ট পার্টি

১১০. বাংলাদেশ ইসলামিক সমাজতান্ত্রিক দল

১১১. জেহাদ পার্টি

১১২. বাংলাদেশ ইউনাইটেড কমিউনিস্ট লীগ

১১৩. বাংলাদেশ জনগণতান্ত্রিক দল

১১৪. জাতীয় বিপবী ফ্রন্ট

১১৫. নয়া গণতান্ত্রিক জাতীয় পার্টি

১১৬. বাংলাদেশ বেকার পার্টি

১১৭. জাতীয় বিপবী পার্টি

১১৮. বাংলাদেশ আদর্শ কৃষক দল

১১৯. বাংলাদেশ খাদেম পার্টি জিন্দাবাদ

১২০. বাংলাদেশ ফ্রিডম লীগ

১২১. বাংলাদেশ বেকার সমাজ

১২২. জাতীয় শ্রমজীবী পার্টি

১২৩. বাংলাদেশ আদর্শ পার্টি

১২৪. মুসলিম পিপলস পার্টি

১২৫. সমতা পার্টি

১২৬. বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি

১২৭. পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি

১২৮. বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (আ. নে.)

১২৯. বাংলাদেশ সর্বহারা পার্টি

১৩০. বাংলাদেশ কমিউনিস্ট কর্মসংঘ

১৩১. বাংলাদেশ গরীব দল

১৩২. পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টি

১৩৩. পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি

১৩৪. বিপবী কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশ

১৩৫. কৃষক শ্রমিক পার্টি

১৩৬. বাংলাদেশ ইসলামিক ফ্রন্ট

১৩৭. বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন

১৩৮. বাংলাদেশ জনপরিষদ

১৩৯. জাতীয় বিপবী পার্টি

১৪০. আদর্শ পার্টি

১৪১. মুসলিম পিপলস পার্টি

১৪২. পিপলস ডেমোক্রেটিক পার্টি

১৪৩. গণআজাদী লীগ

১৪৪. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী)

১৪৫. বাংলাদেশ গণমুক্তি পার্টি

১৪৬. বাংলাদেশ প্রগতিশীল পার্টি

১৪৭. বাংলাদেশ ইসলামিক রাজনীতিক পার্টি

১৪৮. বাংলাদেশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি

১৪৯. জামায়াত-ই-রাব্বানিয়া-আসমা পার্টি

১৫০. গণতান্ত্রিক কর্মীশিবির

১৫১. বাংলাদেশ জাতীয় সেবক দল

১৫২. বাংলাদেশ জাতীয় লীগ

১৫৩. বাংলাদেশ আওয়ামী মুক্তি আন্দোলন

১৫৪. ন্যাশনাল ইয়ুথ লিবারেল পার্টি

১৫৫. ইসলামী ন্যাশনালিস্ট পার্টি

১৫৬. হুতুমতে রব্বানী পার্টি

১৫৭. ইসলামী গণতন্ত্রী পার্টি

১৫৮. ইসলামী গণআন্দোলন

১৫৯. ইসলামী কৃষক পার্টি

১৬০. বাংলাদেশ ন্যাশনাল ওলামা পার্টি

১৬১. কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ

১৬২. বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন (বিটিএফ)

[উৎস : আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৭-৪৪; তারেক শামসুর রেহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর, প্রথম খণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮ (তৃতীয় মুদ্রণ), পৃ. ৭১-৭২]

পরিশিষ্ট- ৩

বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের তালিকা

[বিভিন্ন সময় জরিপের মাধ্যমে বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক যে সকল রাজনৈতিক দলের সন্ধান পাওয়া যায়, নিম্নে সে সকল দলের নাম উল্লেখ করা হলো:]

১. জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (বর্তমানে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী)
২. মুসলিম লীগ (কাদের)
৩. মুসলিম লীগ (মতিন)
৪. মুসলিম লীগ (ইউসুফ)
৫. মুসলিম লীগ (জমির আলী)
৬. জাতীয় খেলাফত পার্টি
৭. বাংলাদেশ ইসলামিক পার্টি
৮. পাকমন পিপলস পার্টি
৯. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিশ
১০. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (মুফতি আমিনী)
১১. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন (আজিজুল হক)
১২. খেলাফত আন্দোলন (আশরাফ)
১৩. খেলাফাত আন্দোলন (ইজাহারুল ইসলাম)
১৪. বাংলাদেশ ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম পার্টি
১৫. বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন
১৬. জাতীয় ওলামা ফ্রন্ট
১৭. ইসলামিক ডেমোক্রিটিক লীগ
১৮. মুসলিম লীগ ঐক্য
১৯. ইসলামী ঐক্য আন্দোলন
২০. ইসলাম শাসনতন্ত্র আন্দোলন
২১. বাংলাদেশ হিন্দু ঐক্য ফ্রন্ট
২২. বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ
২৩. বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু পার্টি
২৪. আওয়ামী উলেমা পার্টি
২৫. নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি

২৬. মুসলিম জাতীয় দল

২৭. বাংলাদেশ আওয়ামী ইসলামী পার্টি

২৮. মুসলিম জাতীয়তাবাদী দল

২৯. বাংলাদেশ জমিয়তে উলামা-ই-ইসলামী

৩০. জাতীয় উলেমা দল

৩১. বাংলাদেশ গণ মুসলিম লীগ

৩২. বাংলাদেশ ইসলামী পার্টি (আশরাফ)

৩৩. বাংলাদেশ ইসলামী বিপবী পরিষদ

৩৪. বাংলাদেশ নেজাম-ই-ইসলাম পার্টি (সাইদ)

৩৫. নেযাম-ই-ইসলাম পার্টি (বদরপুরী)

৩৬. নেযাম-ই-ইসলাম পার্টি (আশরাফ)

৩৭. বাংলাদেশ ইসলামিক সমাজতান্ত্রিক দল

৩৮. জেহাদ পার্টি

৩৯. বাংলাদেশ খাদেম পার্টি জিন্দাবাদ

৪০. মুসলিম পিপলস পার্টি

৪১. বাংলাদেশ ইনকিলাব পার্টি

৪২. বাংলাদেশ ইসলামিক ফ্রন্ট

৪৩. মুসলিম পিপলস পার্টি

৪৪. বাংলাদেশ ইসলামিক রাজনীতিক পার্টি

৪৫. জামায়াত-ই-রাব্বানিয়া-আসমা পার্টি

৪৬. ইসলামী ন্যাশনালিস্ট পার্টি

৪৭. হুকুমতে রাব্বানী পার্টি

৪৮. ইসলামী গণতন্ত্রী পার্টি

৪৯. ইসলামী গণআন্দোলন

৫০. ইসলামী কৃষক পার্টি

৫১. বাংলাদেশ ন্যাশনাল ওলামা পার্টি

৫২. ইসলামী ঐক্যফ্রন্ট

৫৩. বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন (বিটিএফ)

[উৎস : আমজাদ হোসেন, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৩০-৩৭; শাহেদ ইকবাল মো: মাহবুব-উর-রহমান, *বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি : সমস্যা ও সম্ভাবনা*, অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৫, পৃ. ২৭-২৮]

পরিশিষ্ট-৪

বাংলাদেশের নিবন্ধনকৃত রাজনৈতিক দলের তালিকা (২০০৮ সাল পর্যন্ত)

[২০০৮ সালে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক রেজিস্ট্রেশনকৃত রাজনৈতিক দলের তালিকা]

(গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (পি আর ও) সংশোধন অধ্যাদেশ-২০০৮)

১. বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

২. বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)

৩. জাতীয় পার্টি

৪. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

৫. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ)

৬. বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টি

৭. লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এল ডি পি)

৮. বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি (বি জে পি)

৯. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

১০. বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি

১১. ইসলামী ঐক্যজোট

১২. বিকল্প ধারা বাংলাদেশ

১৩. বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল

১৪. কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ

১৫. গণফোরাম

১৬. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জে এস ডি)

১৭. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

১৮. জাকের পার্টি

১৯. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন

২০. জাতীয় পার্টি (জে পি)

২১. বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন

২২. গণতন্ত্রী পার্টি

২৩. বাংলাদেশ মুসলিম লীগ

২৪. খেলাফত মজলিস

২৫. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ

২৬. বাংলাদেশ ইসলামিক ফ্রন্ট

২৭. বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি

২৮. ন্যাশনাল পিপলস পার্টি

২৯. প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক দল

৩০. ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ

৩১. গণফ্রন্ট

৩২. বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি

৩৩. ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন

৩৪. বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি

৩৫. বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)

৩৬. বাংলাদেশ বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি

৩৭. জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট

৩৮. বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (এল.এম)

৩৯. ফ্রিডম পার্টি

(বিশেষ দ্রষ্টব্য : উল্লেখ্য যে, ২০০৮ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষ্যে মোট ১১৭টি দল রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করেছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন উপরিউক্ত ৩৯টি দলকে রেজিস্ট্রেশনের অনুমতি দেন।)

[সূত্র : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ঢাকা ; Ali Riaz, *Bangladesh A Political History since Independence*, I.B. Tauris & Co. Ltd., London, 2016, p.152]

পরিশিষ্ট-৫

বাংলাদেশের নিবন্ধনকৃত ইসলামী রাজনৈতিক দলের তালিকা (২০০৮ সাল পর্যন্ত)

(২০০৮ সালে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত)

১. বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

২. ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

৩. ইসলামী ঐক্যজোট

৪. বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস

৫. জাকের পার্টি

৬. বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন

৭. বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশন

৮. বাংলাদেশ মুসলিম লীগ

৯. খেলাফত মজলিস

১০. জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশ

১১. বাংলাদেশ ইসলামিক ফ্রন্ট

১২. ইসলামিক ফ্রন্ট বাংলাদেশ

[সূত্র : বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন, ঢাকা।]

পরিশিষ্ট -৬

বাংলাদেশে জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট সংগঠন ও সংস্থাসমূহের নাম

[নিম্নে বাংলাদেশে জঙ্গি কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট অথবা জঙ্গিবাদ সমর্থনকারী অথবা ইসলাম ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থনকারী ইসলামী সংস্থাসমূহের নাম উল্লেখ করা হলো : (সরকারিভাবে নিষিদ্ধঘোষিত ও কালো তালিকাভুক্তসহ)]

১. আফগান পরিষদ

২. আহলে হাদিস আন্দোলন

৩. আহলে হাদিস যুব সংঘ (এএইচজেএস)

৪. আহলে হাদিস তবলিগা ইসলাম

৫. আহসাব বাহিনী (আত্মঘাতী সুইসাইড গ্রুপ)

৬. আল হারামাইয়েন (এনজিও)

৭. আল হারাত আল ইসলামিয়া

৮. আল ইসলাম মারর্টারস ব্রিগেড

৯. আল ইসলামী সংহতি পরিষদ

১০. আল-জাজিরা

১১. আল জিহাদ বাংলাদেশ

১২. আল খিদমত

১৩. আল কুরত আল ইসলামী মারর্টারস

১৪. আল মারকাজুল আল ইসলামী

১৫. আল মুজাহীদ

১৬. আল-কায়েদা

১৭. আল সাঈদ মুজাহিদ বাহিনী

১৮. আল তানজীব

১৯. আল উম্মাহ

২০. আল্লার দল (সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)

২১. আল্লার দল বিগ্রেড (আত্মঘাতী দল)

২২. আল ইয়াম্মা পরিষদ

২৩. আমানাতুল ফারকান আল খাইরিয়া

২৪. আমিরাত-ই-দিন

২৫. আমরা ঢাকাবাসী

২৬. আনজুমানে তালামজিয়া ইসলামীয়া

২৭. আনসার আল ইসলাম

২৮. আনসারুল্লাহ মুসলামিন

২৯. আনসারুল্লাহ বাংলা টিম (এবিটি) (২০০৫ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধঘোষিত)

৩০. আরাকান আর্মি (এএ)

৩১. আরাকান লিবারেশন ফ্রন্ট (এএলপি)

৩২. আরাকান লিবারেশন পার্টি

৩৩. আরাকান মুজাহিদ পার্টি

৩৪. আরাকান পিপলস আর্মি

৩৫. আরাকান রোহিঙ্গা ফোর্স

৩৬. আরাকান রোহিঙ্গা ইসলামিক ফ্রন্ট

৩৭. আরাকান রোহিঙ্গা ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (এআরএনও)

৩৮. ইউনাইটেড স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অব আরকান মুভমেন্ট

৩৯. ইবতেদাদুল-আল মুসলিমা

৪০. ইকতেদুল তালাহ-আল মুসলেমিন

৪১. ইকতেদুল তুলাহ-আল-মুসলেমিন (আইটিএম)

৪২. ইন্টারন্যাশনাল খাতমে নবুয়ত মুভমেন্ট

৪৩. ইসলাহুল মুসলেমিন

৪৪. ইসলামী বিপ্লবী পরিষদ

৪৫. ইসলামী জিহাদ গ্রুপ

৪৬. ইসলামী লিবারেশন টাইগার অব বাংলাদেশ (আইএলটিবি)

৪৭. ইসলামী প্রচার মিডিয়া

৪৮. ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন

৪৯. ইসলামী সমাজ (সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)

৫০. ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি (সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)

৫১. ইসলামিক সলিডারিটি ফ্রন্ট

৫২. ইয়ং মুসলিম

৫৩. এবতেদাতুল আল মুসলামিন

৫৪. এহসাব বাহিনী

৫৫. ওয়ারেট ইসলামিক ফ্রন্ট

৫৬. ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ

৫৭. ওলামা আঞ্জুমান আল বাইয়্যানাত (সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)

৫৮. কালেমায়ে-জামাত

৫৯. কালেমা-ই-দাওয়াত (অধ্যাপক আবদুল মজিদ এ দলের প্রধান)

৬০. কতল বাহিনী (আত্মঘাতী গ্রুপ)

৬১. খাতেমী নবুয়াত আন্দোলন পরিষদ বাংলাদেশ (কেএনএপিবি)

৬২. খাতেমী নবুয়াত কমিটি বাংলাদেশ

৬৩. খিদমত-ই-ইসলাম

৬৪. খিলাফত মজলিশ

৬৫. খিতল-ফি-সাবিলিল্লাহ

৬৬. খিলাফত-ই-হুক্‌মত

৬৭. ছাত্র জামায়েত

৬৮. জাদিদ-আল-কায়েদ

৬৯. জাগ্রত মুসলিম বাংলা

৭০. জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি) (২০০৫ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধঘোষিত)

৭১. জামাত-এশ-সাদাত

৭২. জামায়াত-উল-ইসলাম মুজাহিদ

৭৩. জামা'আতুল-মুজাহেদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) (২০০৫ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধঘোষিত)

৭৪. জামাত-ই-মুদারাসিন বাংলাদেশ

৭৫. জামাত-ই-তুলবা

৭৬. জামাত-ই-ইয়াহিয়া

৭৭. জামাত-উল-ফালিয়া

৭৮. জামাতুল ইসলাম মুজাহিদ

৭৯. জামাতে আহলে হাদিস

৮০. জামেয়া মোহাম্মদিয়া আরাবিয়া

৮১. জামিয়াতি ইসলামী সলিডারিটি ফ্রন্ট

৮২. জামিয়াতুল ইয়াহিয়া উত তুরাজ

৮৩. জঙ্গি হিকমত

৮৪. জয়শে মুস্তাফা

৮৫. জয়শে মোহাম্মদ

৮৬. জামাতুল আল-শাদাত

৮৭. ডেমোক্রোটিক পার্টি অব আরাকান

৮৮. ন্যাশনাল ইউনাইটেড পার্টি অব আরাকন (এনইউপিএ)

৮৯. নিজামায়ে ইসলামী পার্টি

৯০. ফার ইস্ট ইসলামী

৯১. তা আমির-উল-দীন বাংলাদেশ (সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)

৯২. তাহফিজ হারমাইন

৯৩. তামির উদ্দিন বাংলাদেশ

৯৪. তানজিম বাংলাদেশ

৯৫. তানজিন-ই-খাতেমি নব্যুয়ত

৯৬. তাওহিদী জনতা

৯৭. তাওহিদ ট্রাস্ট (সরকারিভাবে কালো তালিকাভুক্ত)

৯৮. দাওয়াত-ই-ইসলাম

৯৯. বাংলাদেশ ইসলাম রক্ষা কমিটি

১০০. বাংলাদেশ জামায়াত-উল-তালাবা-ই-আরাবিয়া

১০১. বাংলাদেশ সন্ত্রাসবিরোধী দল

১০২. বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট

১০৩. মজলিশ-ই-তাফিজা খাতমি নব্যুয়ত

১০৪. মুজাহিদ অব বাংলাদেশ

১০৫. মুজাহিদী তোয়াবা

১০৬. মুসলিম লিবারেশন ফ্রন্ট অব বার্মা

১০৭. মুসলিম মিল্লাত শরীয়াহ কাউন্সিল

১০৮. মুসলিম মুজাহিদীন বাংলাদেশ (এমএমবি)

১০৯. মুসলিম মিল্লাত বাহিনী

১১০. মুসলিম রক্ষা মুজহাদিল

১১১. রোহিঙ্গা ইনডিপেন্ডেস ফোর্স

১১২. রোহিঙ্গা ইসলামী ফ্রন্ট

১১৩. রোহিঙ্গা প্যাট্রিয়টিক ফ্রন্ট

১১৪. রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন

১১৫. রিভাইভাল অব ইসলামীক হেরিটেজ (এনজিও)

১১৬. লিবারেশন মিয়ানমার ফোর্স

১১৭. লুজমা মককা আল খায়েরা

১১৮. শাহাদাত-ই-আল হিকমা (২০০৩ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধঘোষিত)

১১৯. শাহাদাত-ই-নবুয়্যাত

১২০. শহীদ নাসিরুল্লাহ খান আরাফাত বিগ্রেড (আত্মঘাতী গ্রুপ)

১২১. সত্যবাদ

১২২. সাহাবা সৈনিক

১২৩. হরকত-ই-ইসলাম আল জিহাদ

১২৪. হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী বাংলাদেশ (হুজি) (২০০৫ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধঘোষিত)

১২৫. হায়েতুল ইগাসা

১২৬. হেফাজতে খাতেমী নবুয়্যত

১২৭. হিজবুত তাহ্‌রীর (২০০৯ সালে সরকারিভাবে নিষিদ্ধঘোষিত)

১২৮. হিজবা আবু ওমর

১২৯. হিজবুল মাহাদী

১৩০. হিজবুল্লাহ আদেলী বাংলাদেশ

১৩১. হিজবুল্লাহ ইসলামী সমাজ

১৩২. হিজবুত তাওহিদ

১৩৩. হিকমত-উল-জিহাদ

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই তালিকায় যে ১৩৩টি সংগঠন/সংস্থা/দল/গ্রুপ/গোষ্ঠীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার বেশির ভাগই প্রত্যক্ষভাবে ইসলাম ধর্মভিত্তিক জঙ্গি কর্মকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট, আর কিছু আছে যারা উক্ত জঙ্গিবাদ সমর্থন করে, আবার দু-একটি সংগঠন/সংস্থা আছে যাদের সাথে উল্লিখিত জঙ্গি-সংশ্লিষ্টতা পাওয়া না গেলেও তারা ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক রাষ্ট্র অথবা খেলাফত প্রতিষ্ঠার কথা বলে। বাংলাদেশে ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক খেলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তারা সবাই একমত। ইসলামি শরিয়াহ্‌ভিত্তিক খেলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ-পদ্ধতি নিয়ে এদের অনেকের মধ্যেই মতপার্থক্য থাকলেও এদের সবাই যা বলে তার মূল কথা "ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম নয়, রাষ্ট্রই হবে ইসলামি" অথবা "সংবিধানে ইসলাম নয়, ইসলামই হবে সংবিধান"।)

[উৎস : আবুল বারকাত, *বাংলাদেশে মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির*, মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৮, পৃ.২২৩-২২৭]

পরিশিষ্ট-৭

বাংলাদেশে ইসলামী জঙ্গি সংগঠনগুলোর ট্রেনিং কেন্দ্র

(মাদ্রাসায় ট্রেনিং কেন্দ্র)

[নিম্নবর্ণিত স্থানসমূহের মাদ্রাসাসমূহকে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণের ঘাঁটি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে]

ক্রমিক নং	জেলা	অবস্থান	ক্যাম্প সংখ্যা
১	পঞ্চগড়	হাফিজাবাদ, চিলাহাটি, চানবাড়ি	৪
২	দিনাজপুর	রাণী পুকুর, ধর্মপুর, আলিহাট, দাউদহাট	৩
৩	ঠাকুরগাঁও	আমগাঁও, গেদুরা, বয়রোচোনা, ধানতোলা	৪
৪	লালমনিরহাট	তাওয়াবাড়ি,জাংরা,আদিতমারী, দুর্গাপুর,টংভাঙ্গা	৫
৫	নীলফামারী	গোরাগ্রাম, চাওবা, বেলপুকুর, কেটকিবাড়ী	৪
৬	কুড়িগ্রাম	পাথরডুবি, বড়ভিটা, মোগলগাছা, তাবাকপুর, পাঁচগামী	৫
৭	রংপুর	তাম্বলপুর, ইমাদপুর, কাশিখাল	৩
৮	বগুড়া	তালোড়া, ফুলবাড়ি, কারণেবাড়ী, কেউলি	৪
৯	জয়পুরহাট	ক্ষেতলাল, রায়খালী, ধরলজি, আত্রাই, ধুনট, আলমপুর	৬
১০	গাইবান্ধা	চণ্ডিপুর, রসুলপুর, ভাটগ্রাম, গজারিয়া, সাঘাটা, রাজাপুর, বেতকাপা	৭
১১	নওগাঁ	নীলপুর, এনায়েতপুর, ধুসরনগর, পারোইল	৪
১২	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	ফতেহপুর,পালকা,আলাতুলি,দুলদুলি,রাধানগর	৫
১৩	রাজশাহী	কাজলা, মোহনপুর, বানেশ্বর, জিকরা, বাগমারা	৪
১৪	সিরাজগঞ্জ	মোহনপুর, পোরজান, নিশ্চিন্তপুর	৩
১৫	নাটোর	চেনাইল, সুকাশ, জামনগর	৩
১৬	পাবনা	নতুন ভাঙরা শাহপুর, নাজিরগঞ্জ, হাদোল	৩
১৭	মেহেরপুর	বুড়িপোড়া, বাননদী	২
১৮	চুয়াডাঙ্গা	উথলি	১
১৯	কুষ্টিয়া	পাল্টি, মোহিকপুর, চিলমারী	৩
২০	ঝিনাইদহ	দোগাছি, কাঁছেরপুল	
২১	মাগুরা	বলিদিয়া, হাজরাপূর্ত, জোনাগাতি	৩
২২	নড়াইল	চানশোরি	১
২৩	যশোর	উলখেল, পাশপাপোল, মজিদপুর	৩
২৪	পিরোজপুর	ভাটাবাড়ি, কদমতলী, সাপলেজা, দাইহোরি	৪
২৫	সাতক্ষীরা	দেবহাটা, তাবালিও, কাচুয়া, খলিলনগর, ঘোনা, যুনবালি, আতুলিয়া	৭
২৬	খুলনা	হরিদালি, বগরা, কাকবারিয়া, চাগলাদহ	৪
২৭	বাগেরহাট	বাদল, কলাতোলা, বেতগাঁও, চিতলা	৪
২৮	ঝালকাঠি	শুকরাগড়, রাঙ্গাপাড়া, চেনাইকাঠী, খায়রা	৪
২৯	ভোলা	ইলিশা, চাচারা, গঙ্গাপুর	৩
৩০	বরিশাল	মাহিলারা, দাউদখোলা, দুর্গাস্পর্শ, বাংশ্রী, জালনা, বাশরাইল	৬
৩১	বরগুনা	ঢালুয়া, ফলদিয়া, নলতোলা, বামনা, মোকামিয়া	৫
৩২	পটুয়াখালী	কাকবনিয়া, মিঠাগঞ্জ, রতনদি, সূর্যমুখী, রুহালিয়া, বেতাগী, মাধবখালী	৭
৩৩	টাঙ্গাইল	হাদিরা, তরফপুর, মুগদা, বড়পাকিয়া	৪
৩৪	মানিকগঞ্জ	জামিরতা, উথলি, কালিয়া	৩
৩৫	নারায়ণগঞ্জ	খাগাকান্দা	১

৩৬	ঢাকা	বনগাঁও, আগলা, মোহাম্মদপুর, যাত্রাবাড়ী	৪
৩৭	মুন্সিগঞ্জ	মধ্যপাড়া	১
৩৮	জামালপুর	জংধরা, নোয়াপাড়া, শ্রীপুর, নীরক্ষীরা	৪
৩৯	নেত্রকোনা	চকুয়া, মারান্দিয়া, বড়ক্ষেপণ, রংহাটি	৪
৪০	শেরপুর	উরফা, কাকিলাউরা, দেলুয়ার	৩
৪১	কিশোরগঞ্জ	কাঠখালী, মোগুয়া, রাউভাট, রামদি	৪
৪২	নরসিংদী	মুছাপুর, দুলালপুর	২
৪৩	রাজবাড়ী	ঈশানচর	১
৪৪	শরীয়তপুর	ব্রজেশ্বর, নাওডুবা	২
৪৫	ফরিদপুর	চাঁদপুর, ডাঙ্গি, নাসিমপুর	৩
৪৬	গোপালগঞ্জ	হাতিয়ার, বাটিকামারী	২
৪৭	মাদারীপুর	রাজৈর, সাহেরামপুর, কাটাবাড়ি	৩
৪৮	সিলেট	বারোহোলি, বারোইকান্দি,আন্তময়ুর, কারকাটরি	৪
৪৯	মৌভলীবাজার	টেংরা, ফুলতলা, আদমপুর	৩
৫০	সুনামগঞ্জ	আশাকান্দি,উত্তরা,রাদাঘাট,সোনরদক, আওগাঁও	৫
৫১	হবিগঞ্জ	ধর্মগার্গ, পালিউমদা, উলা, পোরগাঁ, বাঘাসুরা	৫
৫২	ব্রাক্ষনবাড়িয়া	মোগরা, তেজখালী, হরিপুর, নাটঘর	৪
৫৩	চাঁদপুর	বাগাদি, নায়েব গাঁ	২
৫৪	কুমিল্লা	গোলিয়ারা, আদরা, চানগাঁও	৩
৫৫	নোয়াখালী	রামপুর, নুয়ালি, নাবেশ্বর	৩
৫৬	ফেনী	মহামারা	১
৫৭	লক্ষ্মীপুর	দিঘলী, কোরপাড়া	২
৫৮	রাঙ্গামাটি	বুড়িঘাট, বরকল, গিলাছড়ি	৩
৫৯	বান্দরবান	নাইক্ষ্যাংছড়ি	১
৬০	খাগড়াছড়ি	পানছড়ি, মাইজছড়ি, মানিকছড়ি	৩
৬১	চট্রগ্রাম	হাটহাজারী, ঝাউতলা, খুলশি, আনোয়ারা, লোহাগাড়া, পটিয়া, মিরেরশ্বরাই, বাঁশখালী	৮
৬২	কক্সবাজার	রাজারকুল, নিলা, কুটুপালং, মহেশখালী	৪
		সর্বমোট =	২১৫

[উৎস : নূহ-উল-আলম লেনিন, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৯, পৃ.২২৬-২২৮]

পরিশিষ্ট-৮

জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি)-এর ইশতেহার

(১৭ আগস্ট ২০০৫ সালে বোমা হামলার পর প্রচারিত)

[১৭ আগস্ট ২০০৫ সালে সারাদেশে একযোগে বোমা হামলার সময় ইসলামী জঙ্গি সংগঠন জেএমবি নিম্নোক্ত লিফলেটটি বিতরণ করে]

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ-এর পক্ষ থেকে

বাংলাদেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের আহ্বান!

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য এবং মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। অতঃপর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ্ ছাড়া কোন মা'বুদ নাই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। কুর্‌আনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে- "আল্লাহ্ ছাড়া কারো বিধান দেয়ার অধিকার নাই" (সূরা ইউসুফ-৪০)। "শুনে রাখ! তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা এবং আদেশ দান করা" (সূরা আ'রাফ-৫৪)। "আল্লাহ্‌র আইনকে বাস্তবায়ন করার জন্য আমার উম্মতের মধ্যে একটি ঈছাবা (দল) সব সময় সশস্ত্র জিহাদ করে যাবে। তারা তাদের শত্রুদের প্রতি কঠোর হবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে তারা তাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তারা কিয়ামত পর্যন্ত এ কাজ চালিয়ে যাবে" (সহীহ মুসলিম- ৪৮০/৫ ইঃ ফাঃ)।

জনগণের প্রতি আহ্বান!

প্রিয় দেশবাসী মুসলিম ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ্ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি রূপে এবং শুধুই তাঁর ইবাদতের জন্য, যাতে থাকবে না কোনো অংশীদার। আমাদের মাঝে শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) কে প্রেরণ করেছেন এই শিক্ষা দেয়ার যে আমরা কিভাবে আমাদের বিশ্বাস ও কাজে কর্মে তাগুতকে বর্জন করতে পারি। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন- "প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই আমি রাসূল পাঠিয়েছি এ দায়িত্ব দিয়ে যে, তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং সকল প্রকার তাগুতকে বর্জন কর" (সূরা নাহল-৩৬)।

তাগুতঃ মানুষ যদি আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে অন্য কাউকেই ইলাহ্-বা উপাস্যের আসনে বসিয়ে তার ইবাদত বা আনুগত্য করে এবং কোনো ব্যাপারে তাকে আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করে তবে সেই অংশীদার ইলাহ্‌তে বলা হয় "তাগুত"। ক্ষমতাসীন তাগুতঃ আল্লাহ্‌র বিধান পরিবর্তনকারী জালিম শাসক, অর্থাৎ যে

শাসক আইনের বলে হারামকে হালাল করে। যেমনঃ- যিনা, সুদ, মদ্যপান বা অশ্লীলতার অনুমোদন দেয়, কিংবা হালালকে হারাম করে। যেমন- জিহাদ- ক্বিতালে বাধা দেয়। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিধান বাদ দিয়ে নিজেদের তৈরিকৃত অথবা কাফের-মুশরেকদের বিধান অনুযায়ী শাসন করে সে হলো "ক্ষমতাসীন তাগুত"।

কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে আল্লাহ্‌র বিধান ছাড়া অন্য কারো বিধান চলতে পারে না। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, শতকরা নব্বইভাগ মুসলিম বাস করে সত্ত্বেও আমাদের দেশে আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর নেই। উপরন্তু দেশের জেলা থেকে রাজধানী পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে নিম্ন ও উচ্চ আদালত গঠন করে যে বিচারকার্য পরিচালনা করা হচ্ছে তার মূল ভিত্তি হচ্ছে মনুষ্য রচিত সংবিধান। যে সংবিধান প্রণয়ন করেছে কিছু জ্ঞানপাপী মানুষ। কথা ছিল মানুষ হিসেবে একজন মানুষের কাজ হবে আল্লাহ্‌র দাসত্ব করা ও আল্লাহ্‌র বিধানের আনুগত্য করা । কিন্তু সে মানুষ আজ নিজেই সংবিধান রচনা করে আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে।

এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসে আছে আল্লাহ্‌ বিরোধী শক্তি। কারণ যে প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্র প্রধান কিংবা রাষ্ট্রের অন্যান্য পরিচালকবর্গ নির্বাচিত হচ্ছেন তা একটি সম্পূর্ণ অনৈসলামিক পদ্ধতি। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে কোথাও প্রচলিত কাফির- মুশরিক বিরচিত গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি পদ্ধতির স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। এসব প্রত্যেকটি পদ্ধতিই হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিধানের প্রতিপক্ষ একেকটি ব্যবস্থা। এবং কাফির-মুশরিক ও ইহুদী মস্তিস্ক প্রসূত এসব বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে শুধুমাত্র মুসলিম আক্বীদা ও বিশ্বাসকে ধ্বংস করার মানসে। কাজেই এদেশের মুসলিম জনতার আজ ভাবার সময় এসেছে।

তাই জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ আল্লাহ্‌র হুকুম ও ঈমানের দাবীকে সামনে রেখে এই প্রচলিত বিচার ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে। পাশাপাশি যে সংবিধানকে ভিত্তি করে দেশ পরিচালিত হচ্ছে, তা আল্লাহ্‌র বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক; বিধায় এ ব্যবস্থা ও তথাকথিত নির্বাচন পদ্ধতি পরিহার করে আল্লাহ্‌র হুকুম ও রাসূলের তরীকায় দেশ পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। অন্যথায় জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ আল্লাহ্‌র জমিনে আল্লাহ্‌র দ্বীন কায়েমের জন্য আল্লাহ্‌ নির্দেশিত ক্বিতাল পদ্ধতির সামগ্রিক বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর। অতএব, যতদিন পর্যন্ত দেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন না হয়, ততদিন পর্যন্ত তাগুতের বিচারালয়ে যাওয়া বন্ধ রাখুন। আপনাদের যেকোনো বিচার ফয়সালার জন্য মসজিদের খতিব, মাদ্‌রাসার মুহাদ্দেস ও অভিজ্ঞ আলেমেদ্বীনের কাছে গিয়ে আল্লাহ্‌র আইনের ফয়সালা প্রার্থনা করুন। তাগুত সরকারের আইন উপেক্ষা করে আল্লাহ্‌র আইনের বিচার- ফয়সালা নিন।

আল্লাহ্ বলেন ঃ- "তারা কী জাহেলী বিধানের ফয়সালা কামনা করে? আল্লাহ্ অপেক্ষা ঈমানদারদের জন্য উত্তম ফয়সালাকারী কে?" (সূরা মায়েদাহ-৫০)। "তবে কী আমি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোনো বিচারক অনুসন্ধান করবো?" (সূরা আন'আম- ১১৪)। "আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবী করে যে আমরা ঈমান এনেছি, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল। তারা তাগুতকে বিধান দানকারী বানাতে চায়, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, তারা যেন তাকে অমান্য করে।" (সূরা নিসা-৬০)।

বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান!

যারা হেদায়েতের অনুসারী তাদের প্রতি সালাম। হেদায়েত প্রাপ্তির পর গোমরাহী ও অন্ধকারের দিকে ফিরে আসা উচিত নয়। আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে সত্য দ্বীন সহকারে সৃষ্টির প্রতি প্রেরণ করেছেন সংবাদ বহনকারী ও সতর্ককারী হিসেবে। যারা তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছে, আল্লাহ্ তাদের সঠিকভাবে হেদায়েত দিয়েছেন। আর যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। অতঃপর তারা ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, ইসলামের আনুগত্য করেছে। অতএব বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান! আপনারা এদেশে আল্লাহ্র আইন চালূ করুন। আমরা আপনাদের সহযোগিতা করবো। আমরা ক্ষমতা চাই না, আমরা দেশে তাগুতী শাসনের পরিবর্তে আল্লাহ্র আইন চাই।

জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ এর কর্মীরা আল্লাহ্র সৈনিক। আল্লাহ্র আইন বাস্তবায়ন করার জন্য এরা অস্ত্র হাতে নিয়েছে। যেমন নিয়েছিলেন নবী-রাসূল, সাহাবী ও যুগেযুগে বীর মুজাহিদগণ। জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ এদেশ থেকে সমস্ত শিরক-বিদ'আতের অবসান ঘটিয়ে খালেছ তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়। এবং এর মাধ্যমে জনগণকে দুনিয়া ও আখিরাতে সুখী দেখতে চায়।

জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ লিফলেট ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে সরকারকে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার জন্য ইতিপূর্বে দু'বার আহ্বান জানিয়েছে। প্রতিবারই সরকার তাদের কর্মীদেরকে গ্রেপ্তার করেছে। জাম'আতুল মুজাহিদীন তার কোনো পাল্টা এ্যাকশন নেয়নি। কিন্তু এবারের আহ্বান জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার তৃতীয় আহ্বান। এই আহ্বানের পর সরকার যদি এদেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা না করে, বরং আল্লাহ্র আইন চাওয়ার অপরাধে কোন মুসলিমকে গ্রেপ্তার করে, অথবা, আলেম ওলামাগণের উপর নির্যাতন চালায় তাহলে জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে পাল্টা এ্যাকশন নিবে ইনশা-আল্লাহ্।

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় সংসদের সরকারী ও বিরোধী দলের প্রতি আহ্বান!

কাফের রচিত গণতান্ত্রিক এই পদ্ধতিটি সরকারী ও বিরোধী দল নামে দুটি পক্ষ সৃষ্টি করে জাতিকে দলে দলে বিভক্ত করে দেয়। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য হরতাল, অবরোধ করে জনগণের ক্ষতি সাধন করার অধিকার দেয়। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অপরাধের জন্য জনগণকে অবরুদ্ধ করে রাখা, সারা দেশ অচল করে দেয়াও গণতান্ত্রিক দেশে সংবিধান সম্মত।

এদেশে যারা গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চায় তারা ইসলামের শত্রু। অতএব, আল্লাহ্‌র হেদায়েত পেতে চাইলে দলাদলি বাদ দিয়ে সরকারী ও বিরোধী দল মিলে অবিলম্বে দেশে ইসলামী আইন চালু করুন। তাগুতী সংবিধান পরিত্যাগ করে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশ থেকে সমুদয় শির্‌ক-বিদ'আত, অশ্লীলতা দূর করে জনগণকে সঠিকভাবে ইসলাম পালন করতে দিন। আর আপনারা যদি বুশ-ব্লেয়ার চক্রের ভয়ে দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করার সাহস না পান, তাহলে গণতন্ত্রের তাগুতী রাজনীতি ছেড়ে দিন। আলেম-ওলামা, মাশায়েখ ও ইসলামী চিন্তাবিদগণের সমন্বয়ে শুরাই পদ্ধতিতে তৌহিদী জনতা এদেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করবে ইনশা-আল্লাহ্‌।

সরকারী আমলা ও বিচারগণের প্রতি আহ্বান!

সরকার দেশে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা না করলে আপনারা প্রশাসনিক কাজকর্ম ও তাগুতী আইনে বিচারকার্য পরিচালনা বন্ধ করুন। আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক সহযোগিতা করে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনে জীবন ধন্য করুন। সেই সাথে আর্মি, বিডিআর, পুলিশ ও র‍্যাবসহ সকল সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণের প্রতি আহ্বান! আপনারা তাগুতী আইন হেফাযতের পরিবর্তে আল্লাহ্‌র আইন হেফাযতে সচেষ্ট হউন। তাগুতের আদেশ মানবেন না, আল্লাহ্‌র আদেশ মানুন। তাগুতের নির্দেশে আল্লাহ্‌র সৈনিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন না। তাগুতের গোলামী ছেড়ে আল্লাহ্‌র সৈনিকদের দলে যোগ দিন। তাগুতের সৈনিক হওয়ার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র সৈনিক হয়ে যান। আর যারা তাগুতের গোলামী না ছাড়বে, আল্লাহ্‌র বিধান অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে ইনশা-আল্লাহ্‌। আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন- "যারা ঈমানদার তারা লড়াই (সশস্ত্র জিহাদ) করে আল্লাহ্‌র রাহে, পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে তাগুতের পক্ষে। সুতরাং তোমরা লড়াই (সশস্ত্র জিহাদ) করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে-(দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল" (সূরা নিসা-৭৬)।

বিশ্ব মুসলিমের প্রতি আহ্বান!

বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী হচ্ছে জর্জ ডব্লিউ বুশ। সে সন্ত্রাসের মাধ্যমে নিরীহ মুসলিমদের উপর আক্রমণ চালাচ্ছে এবং জোর করে সকল মুসলিম দেশে কুফুরি সংবিধান চাপিয়ে দিয়ে তাদেরকে

Dhaka University Institutional Repository

ঈমানহারা করতে চায়। সমগ্র পৃথিবীতে গণতন্ত্রের কুফুরি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করে New world order এর মাধ্যমে গোটা পৃথিবীকেই তার নির্দেশের আওতায় আনতে চায়। এ যেন এক নব্য ফেরাউনী অভিলাষ। কিন্তু আল্লাহ্‌র সৈনিকরা তার এ অভিলাষ পূর্ণ হতে দিবে না, এবং গণতন্ত্রের কুফুরি মতবাদও প্রতিষ্ঠা হতে দেবে না। গণতন্ত্র হচ্ছে তাগুতের উদ্ভাবিত পদ্ধতি। পৃথিবীতে তাগুতী শক্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য এটা তাদের প্রধান অস্ত্র। তাগুতী বিধান আল্লাহ্‌র পথের মুজাহিদদেরকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ্‌র আইন প্রতিষ্ঠার জন্য যারা অস্ত্র ধরে তাদেরকে বলে জঙ্গী, সন্ত্রাসী। অথচ আল্লাহ্ বলেন- "হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়"(সূরা নিসা- ৭১)।

অতএব বিশ্ব মুসলিমের প্রতি আহ্বান, আপনারা প্রতিটি মুসলিম দেশে আল্লাহ্‌র আইন বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে বাধ্য করুন। সকল মুসলিম দেশ হতে সশস্ত্র জিহাদের মাধ্যমে তাগুতী শাসকদের উৎখাত করে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করুন। কুফুরি জাতিসংঘ পরিত্যাগ করুন। ইসলামী দেশ মিলে মুসলিম জাতিসংঘ গঠন করে মুসলিম উম্মাহকে শক্তিশালী করুন।

কাফের- মুশরেকদের প্রতি হুঁশিয়ারি!

বুশ- ব্লেয়ারসহ সমস্ত জালেম শাসকদেরকে হুঁশিয়ার করা যাচ্ছে যে, তোমরা মুসলিম দেশের দখলদারীত্ব ছেড়ে দাও। মুসলিম দেশে আর মোড়লীপনা করার চেষ্টা করো না। সারা বিশ্বে মুসলিমরা জেগ উঠেছে। এখনো যদি মুসলমানদের উপর নির্যাতন বন্ধ না কর, তাহলে তোমাদেরকে পৃথিবীর কোথাও নিরাপদে থাকতে দেয়া হবে না। ইসলামদ্রোহী NGOদেরকে সতর্ক করা যাচ্ছে যে, তোমরা মুসলিম দেশে ইসলাম বিধ্বংসী কার্যক্রম বন্ধ কর। তা নাহলে তোমদেরকে সমূলে উৎপাটন করা হবে ইনশা-আল্লাহ্।

ওয়া সাল্লাল্লাহু ত'আলা 'আলা খাইরি খালকিহী মুহাম্মাদিও ওয়া'আলা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

আহ্বানে : জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ।

[উৎস : ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী একযোগে বোমা হামলার পর ইসলামি জঙ্গি সংগঠন জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশ (জেএমবি) উপরিউক্ত লিফলেটটি বিতরণ করে।]

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-৯

বাংলাদেশে ধর্মীয় জঙ্গিবাদীদের দ্বারা সংঘটিত বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলার ঘটনাক্রম ও ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান : (১৯৯৯-২০০৮)

ঘটনার তারিখ	লক্ষ্যবস্তু মাত্রা/ প্রকৃতি এবং স্থান	প্রত্যক্ষ ক্ষতি
৭ মার্চ ১৯৯৯	উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণ, যশোর	নিহত ৬, আহত ৭৫
৮ অক্টোবর ১৯৯৯	আহমেদিয়া মসজিদে বোমা বিস্ফোরণ, খুলনা	নিহত ৭, আহত ৪০
২০ জানুয়ারি ২০০১	সিপিবি'র সভায় টাইম বোমা বিস্ফোরণ, ঢাকা	নিহত ৭, আহত ৫২
১৪ এপ্রিল ২০০১	পহেলা বৈশাখ উদ্যাপন অনুষ্ঠানে রমনার বটমূলে বোমা হামলা, ঢাকা	নিহত ১১, আহত ১২০
৩ জুন ২০০১	রোমান ক্যাথলিক গির্জায় টাইম বোমা বিস্ফোরণ, গোপালগঞ্জ	নিহত ১০, আহত ২৫
১৫ জুন ২০০১	আওয়ামী লীগ অফিসে বোমা বিস্ফোরণ, নারায়ণগঞ্জ	নিহত ২২, আহত ১০০
২৪ সেপ্টেম্বর ২০০১	মোল্লারহাট, বাগেরহাটে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মিছিলে বোমা হামলা	নিহত ৮, আহত ১০৫
২৫ সেপ্টেম্বর ২০০১	সুনামগঞ্জে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী জনসভার পাশে বোমা হামলা	নিহত ৪, আহত ১৭
১৬ নভেম্বর ২০০১	হিন্দু ধর্মাবলম্বী শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ গোপাল কৃষ্ণ মুহুরিকে হত্যা	নিহত
২১ এপ্রিল ২০০২	বৌদ্ধ ভিক্ষু মাহাথেরো হত্যা	নিহত
২৮ সেপ্টেম্বর ২০০২	সাতক্ষীরায় সিনেমা হল ও সার্কাস প্রদর্শনীতে বোমা হামলা	নিহত ৩, আহত ১৭
৭ ডিসেম্বর ২০০২	৪টি সিমেনা হল বোমা বিস্ফোরণ, ময়মনসিংহ	নিহত ২৭, আহত ২৯৮
১৭ জানুয়ারি ২০০৩	সুফি সমাধিতে বোমা বিস্ফোরণ, সখীপুর, টাঙ্গাইল	নিহত ৯, আহত ২৬
১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩	দিনাজপুরে মেসে বোমা বিস্ফোরণ	নিহত ০৩
১২ জানুয়ারি ২০০৪	হজরত শাহজালালের (র.) মাজারে বোমা বিস্ফোরণ, সিলেট	নিহত ৫, আহত ৫২
২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪	অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের উপর আকস্মিক আক্রমণ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)	গুরুতর আহত এবং পরে মৃত্যু
২ এপ্রিল ২০০৪	১০ ট্রাক অস্ত্রবাহী জাহাজ, চট্টগ্রাম বন্দর, ২০০০ অটোমেটিক/সেমি অটোমেটিক রাইফেল, ৪০টি রকেট চালিত গ্রেনেড, ২৫,০০০ হ্যান্ড গ্রেনেড, ১৮ লাখ ছোট-বড় গুলি ও বিপুল পরিমাণ বারুদ।	
২১ মে ২০০৪	হজরত শাহজালালের (র.) মাজারে বোমা বিস্ফোরণ, সিলেট	নিহত ৮, বিট্রিশ হাইকমিশনারসহ আহত ১০১
২১ আগস্ট ২০০৪	আওয়ামী লীগের (শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে) জনসভায় গ্রেনেড হামলা	নিহত ২৪, আহত ৫০৩
২৭ জানুয়ারি ২০০৫	বিরোধী দলের (আওয়ামী লীগ) জনসভায় গ্রেনেড হামলা	সাবেক অর্থমন্ত্রী এসএএমএস কিবরিয়াসহ নিহত ৫, আহত ১৫০
০৯ থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫	গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাট, নওগাঁ, রংপুর, সিরাজগঞ্জে ব্র্যাক ব্যাংকে এবং গ্রামীণ ব্যাংকে ডাকাতি	
১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৫	এনজিও (ব্র্যাক) অফিসে বোমা হামলা, রায়পুর, নওগাঁ	
২০০৩-২০০৫	বাংলাভাই দল কর্তৃক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত (জেএমবি), উত্তর বাংলা	নিহত ৩৫, আহত ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

১৭ আগস্ট ২০০৫	৬৩ জেলায় একই সাথে সিরিজ বোমা হামলা (মুন্সিগঞ্জ ছাড়া সব জেলা)	নিহত ৩, আহত কমপক্ষে ১০০
৩ অক্টোবর ২০০৫	৩টি আদালত ভবনে বোমা হামলা (চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম)	নিহত ২, আহত ৩৯
১৮ অক্টোবর ২০০৫	দ্রুত বিচার আইন ট্রাইব্যুনাল সিলেটে বোমা বিস্ফোরণ	আহত ১
১৪ নভেম্বর ২০০৫	বিচারকের উপর বোমা হামলা, ঝালকাঠি	নিহত ৩, আহত ৪
২৯ নভেম্বর ২০০৫	চট্টগ্রামের কোর্ট এরিয়ায় বোমা হামলা	নিহত ৯, আহত ৭৮
১ ডিসেম্বর ২০০৫	জেলা প্রশাসক অফিসে বোমা হামলা, গাজীপুর	নিহত ১, আহত ৫০
৮ ডিসেম্বর ২০০৫	উদীচী অফিসে বোমা বিস্ফোরণ, নেত্রকোনা	নিহত ৯,আহত ৫০
২৯ ডিসেম্বর ২০০৫	আইনজীবী ভবনে বোমা হামলা, গাজীপুর	নিহত ১০, আহত ২২০
২৯ ডিসেম্বর ২০০৫	পুলিশ বক্সে বোমা হামলা, চট্টগ্রাম	নিহত ৩, আগত ২৫
১৩ মার্চ ২০০৬	কুমিল্লার কালিয়াঝুরিতে বোমা বিস্ফোরণ	নিহত ৪, আহত ১০
২১ জুন ২০০৮	সুনামগঞ্জে আওয়ামী লীগের র‍্যালিতে বোমা হামলা	নিহত ১, আহত ৫১

[উৎস : আবুল বারকাত, *বাংলাদেশে মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির*, মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৮, পৃ.১৫৫-১৫৬; মো. আতিকুর রহমান, *বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা*, র‍্যাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী জার্নাল ২০০৮, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৬০-৬২]

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা গ্রন্থ

আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত), *আত্মপরিচয় ভাষা-আন্দোলন স্বাধীনতা*, চন্দ্রাবতী একাডেমি, ঢাকা, ২০১৫

——————*মুক্তির সংগ্রাম*, চন্দ্রাবতী একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪, (দ্বিতীয় সংস্করণ)

——————*নির্বাচিত প্রবন্ধ, (বাংলাদেশে ধর্ম, রাজনীতি ও রাষ্ট্র)*, অন্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০২

——————*ক্রান্তিকালের নেত্রী শেখ হাসিনা*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৭

আউয়াল মওলানা আবদুল, *জামাতের আসল চেহারা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩

আউয়াল মাওলানা আবদুল (সম্পাদিত), *মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

আজাদ মৌলানা আবুল কালাম, *ভারত স্বাধীন হল*, (পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ), (বাংলা অনুবাদঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়), ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ১৯৯৫

আজাদ প্রেমেন আড্ডি ও ইবনে, *বিভাগপূর্ব বাংলার রাজনীতি ও সমাজ*, (বাংলা অনুবাদ : আনোয়ারুল হক), মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৮

আলহেলাল বশীর, *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

আলহেলাল বশীর, *ভাষা-আন্দোলনের সেই মোহনায়*, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৩

আহমদ আবুল মনসুর, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ১৯৯৫

আহমদ সালাহ্উদ্দীন; সরকার মোনায়েম; মঞ্জুর নুরুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস [১৯৪৭-১৯৭১]*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১০

আহাদ অলি, *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে '৭৫*, [সংশোধিত ও বর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ], বাংলাদেশ কো- অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি., ঢাকা, ২০০৪

আউয়াল আব্দুল মওলানা (সম্পাদিত), মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, শিখা প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৯

ইকবাল মুহম্মদ জাফর, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, প্রতীতি, ঢাকা, ২০০৮

ইসলাম এম এস এম নাসিরুল, *বাংলাদেশের রাষ্ট্রনীতি*, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯২

ইসলাম রফিকুল, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৪, (পরিমার্জিত নবম সংস্করণ)

ইসলাম রফিকুল, *বাংলাদেশ : সামরিক শাসন ও গণতন্ত্রের সংকট*, ঢাকা, ১৯৯২

ইসলাম রফিকুল, *সামরিক জান্তার রাজনীতি*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯২

ইসলাম সিরাজুল (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-১*, বাংলাদেশের এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩

———— *বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-২*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১১, (দ্বিতীয় সংস্করণ)

———— *বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-৪*, বাংলাদেশের এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩

———— *বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-৪*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১১, (দ্বিতীয় সংস্করণ)

———— *বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-৫*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩

———— *বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-৮*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩

———— *বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-১১*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১১, (দ্বিতীয় সংস্করণ)

———— *বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-১৩*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০১১, (দ্বিতীয় সংস্করণ)

ইসলাম সৈয়দ আমীরুল ও বন্দ্যোপাধ্যায় কাজল (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তি: ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতার সংকট*, ঢাকা, ১৯৯৯

হাসানউজ্জামান, *বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের চেতনা ও মতাদর্শিক বিকাশ*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯১

হাসানউজ্জামান, *বাংলাদেশ : রাষ্ট্র ও সরকারের সামরিকীকরণ*, ঢাকা, ১৯৯১

উমর বদরুদ্দীন, *যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৫

———— *বাংলাদেশে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সমস্যা*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৬

———— *একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ভূমিকা*, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২

———— *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি, ১ম খণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭০

———— *স্বাক্ষাৎকার*, ঐতিহ্য, ঢাকা, ২০০১

———— একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের কমিউনিস্টদের ভূমিকা, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২

Dhaka University Institutional Repository

———— *বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার*, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৯

———— *শতাব্দীর শুরুতে বাংলাদেশের চিত্র*, ঢাকা, ২০০৬

———— *দ্বিতীয় আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশ*, বাংলাদেশ অনুভব প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৯

সা'দউল্লাহ, *ধর্ম, রাজনীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতা*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০০

কাদের রোজিনা, *ঢাকার সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০০৪,

চৌধুরী কবীর, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ও মুক্ত বুদ্ধির চর্চা*, রাডিক্যাল এশিয়া পাবলিকেশন্স, লন্ডন, ১৯৯২

চৌধুরী হাসানুজ্জামান, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমাজতত্ত্ব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০০

হক আবুল ফজল, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, অনন্যা, ঢাকা, ২০১০, (দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ)

চক্রবর্তী রথীন, *রাজনৈতিক আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট*, কলকাতা, ১৯৮৮

চক্রবর্তী রতন লাল, *ভাষা আন্দোলন : দলিলপত্র*, কল্যাণ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯১;

দাশগুপ্ত রানা (নির্বাহী সম্পাদক), *নির্যাতিত সংখ্যালঘু, বিপন্ন জাতি*, চট্টগ্রাম, ২০০২

পাটওয়ারী মো. এনায়েত উল্যা, *বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতির তিন শতক (১৯৭১-২০০০)*, অসডার পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৪

বারকাত আবুল, *বাংলাদেশে মৌলবাদ ও মৌলবাদী জঙ্গিতত্ত্বের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি (আগামী প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং কোং), ঢাকা-২০১৬

বারকাত আবুল, *বাংলাদেশে মৌলবাদ জঙ্গিবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতির অন্দর-বাহির*, মুক্তবুদ্ধি প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৮

———— *মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি বিচার-প্রসঙ্গে*, পাঠশালা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬

———— *বাংলাদেশে মৌলবাদের রাজনৈতিক অর্থনীতি*, একাত্তরের ঘাতক দালাল কমিটি, ঢাকা, ২০১৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)

বিশ্বাস সুকুমার, *বাংলাদেশে নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮

ভৌমিক নীম চন্দ্র, ধর বাসুদেব, *সাম্প্রদায়িক বৈষম্য কার স্বার্থে*, শাশ্বত প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯৮

মজিদ শিরীন, *শেখ মুজিব থেকে খালেদা জিয়া*, কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৩

মতিন আব্দুল, *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন*, মুক্তচিন্তা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৩

মতিন আব্দুল, *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন*, মুক্তচিন্তা প্রকাশনা, ঢাকা, ২০১৩

মনসুর মিনার (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের সমাজ রাজনীতি ও উন্নয়নঃ বিশিষ্ট জনের ভাবনা*, সাহিত্য বিলাস, ঢাকা, ২০১০

মামুন মুনতাসীর, *বাংলাদেশের উৎসব*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪

মামুন মুনতাসীর ও রায় জয়ন্ত কুমার, *বাংলাদেশে সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামঃ ১৯৪৭-১৯৯০*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৪

রফিক আহমদ, *ভাষা আন্দোলন*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১

মোহাম্মদ হাসান, বাংলাদেশঃ ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি, গ্রন্থমেলা, ঢাকা, ২০০৩

রশিদ হাসান গারদেজি ও জামিল (সম্পাদিত), *পাকিস্তান ধর্ম ও দ্বন্দ্বের রাজনীতি*, (বাংলা অনুবাদ : তানভীর মোকাম্মেল), দি ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১৯৮৬

রশিদ-হারুন-অর, *বাংলাদেশ রাজনীতি সরকার ও শাসনতান্ত্রিক উন্নয়ন ১৭৫৭-২০০০*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১০

———— *বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন বঙ্গবন্ধু থেকে শেখ হাসিনা*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১২

———— *বাঙালির মুক্তির সংগ্রাম ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু*, সুমি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ঢাকা, ১৯৯৬

———— *মূলধারার রাজনীতি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ১৯৪৯-২০১৬*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৬

রশীদ মোহাম্মদ আবদুর (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের রাজনীতি : যুদ্ধাপরাধী জামায়াত ও জঙ্গি প্রসঙ্গ*, প্রথম খণ্ড, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮

———— (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের রাজনীতি : যুদ্ধাপরাধী জামায়াত ও জঙ্গি প্রসঙ্গ*, দ্বিতীয় খণ্ড, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯

রহমান শেখ মুজিবুর, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৬ (ষষ্ঠ মুদ্রণ)

রহমান মো. মাহবুবর, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৭

রহমান-সাঈদ-উর, *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-১৯৮২)*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০১

রহমান-সাঈদ-উর, *পূর্ব বাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৮৩

Dhaka University Institutional Repository

রহমান হাসান হাফিজুর (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: ১ম খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২

রহমান হাসান হাফিজুর (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : ২য় খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২

রহমান হাসান হাফিজুর (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র : ৩য় খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮২

রহিম এম.এ., *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭-১৯৪৭*, ইষ্টার্ন প্রিন্টিং পাবলিশিং এন্ড প্যাকেজেস লি., ঢাকা, ১৯৭৬,

রেহমান তারেক শামসুর, (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের রাজনীতির ২৫ বছর, প্রথম খণ্ড*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮

রেহমান তারেক শামসুর, (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের রাজনীতির চার দশক, প্রথম খণ্ড*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৯

লেনিন নূহ-উল-আলম, *নির্বাচিত প্রবন্ধ*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০৯

———————— দুঃশাসনের চার বছর সংকট ও উত্তরণের পথ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ঢাকা, ২০০৬

সাঈদ আবু আল, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস [১৯৪৯-১৯৭১]*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩

সাহা পরেশ, *বাংলাদেশ : ষড়যন্ত্রের রাজনীতি (অখণ্ড)*, জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০০১

সায়েম আবু সাদাত মোহাম্মদ, *বঙ্গভবনে শেষ দিনগুলি*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৮ (বাংলা অনুবাদ: মশিউল আলম)

সিদ্দিক ফ. র. আল, *বাঙালির জয় বাঙালির ব্যর্থতা*, [*প্রথম খণ্ড*], পরমা, ঢাকা, ২০০০

সিদ্দিকী রেজোয়ান, *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭১)*, জ্ঞান বিতরনী, ঢাকা, ২০০২

সিংহ কঙ্কর, *রাষ্ট্র সাম্প্রদায়িকতা এবং সংখ্যালঘু সংকট*, ঢাকা, ১৯৯৯

হক আবুল কাসেম ফজলুল, *মুক্তিসংগ্রাম*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২, (চতুর্থ সংস্করণ)

হক আবুল ফজল, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, অনন্যা, ঢাকা ২০১০

———————— *বাংলাদেশের রাজনীতি: সংস্কৃতির স্বরূপ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৭

হক গাজীউল ও মুকুল এম আর আখতার (সম্পাদিত), *বাহান্নর ভাষা আন্দোলন*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৯১

Dhaka University Institutional Repository

হক মুহাম্মদ ইনাম-উল, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন [১৭০৭-১৯৪৭]*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯

হক মোজাম্মেল, *বৃটিশ-ভারতের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস (১৮৫৭-১৯৪৭)*, বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৭৬

হাননান মোহাম্মদ, *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস, ১৯৯০-১৯৯৯*, ঢাকা, ২০০০

হাসান মঈদুল, *মূলধারা'৭১*, ইউনির্ভাসিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০১৬

হাসান সোহরাব, *জঙ্গিবাদ ও যুদ্ধাপরাধ*, শ্রাবণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯

হামিদ এম.এ., *তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথা*, মিজান পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১১, (চতুর্থ সংস্করণ)

হালিম মো. আব্দুল, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি: বাংলাদেশ প্রসঙ্গ, (বৃটিশ শাসনব্যবস্থা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাসঙ্গিক বিষয়সহ)*, ঢাকা, ১৯৯৫

হাসানুজ্জামান আল মাসুদ, *বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনীতি ও গভর্ন্যান্স ১৯৭১-২০০৭*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০৯

হাসানুজ্জামান আল মাসুদ (সম্পাদিত), *বাংলাদেশে নির্বাচন*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮

হায়দার আবুল কাশেম ও মাহমুদ সোহেল, *বাংলাদেশের উন্নয়নের ইতিহাস: নওয়াব সলিমুল্লাহ থেকে খালেদা জিয়া*, প্যানোরমা পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৯

হোসেন আমজাদ, *বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দল*, পড়ুয়া, ঢাকা, ১৯৯৬

হোসেন সৈয়দ আনোয়ার, *বাংলাদেশের রাজনীতি*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩

———————— *বাংলাদেশ রাষ্ট্র, রাজনীতি, গণতন্ত্র ও সুশাসন*, একুশে বাংলা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৬

ইংরেজি গ্রন্থ

Ahmed Rafiuddin (ed.), *Religion, Nationalism and Politics in Bangladesh*, South Asian Publishers, New Delhi, 1990

Ahmed Kamruddin, *A Socio Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh*, Poineer Press, Dacca, 1975

Ahmed Imtiaz (ed.), *Terrorism in the 21st Century Perspectives from Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka, 2009, p. 81; Ali Riaz, 2010, *Ibid*

Ali Shaikh Maqsood, *From East Bengal to Bangladesh Dynamics and Perspectives*, The University Press Limited, Dhaka, 2017 (Second revised edition)

Bhuian Md. Monoar Kabir, *Polities and Development of the Jamaet-e-Islami Bangladesh*, AH Development Publishers House, Dhaka, 2006,

Chakravarty S.R., *Bangladesh : The Ninneteeu Saventy Nine Election*, South Asian Publisherse, New Delhi, 1988

Chouhdhury G.W., *The Last Days of United Pakistan*

Finer Samuel E., *The Man on Horseback : The Role of the Military in Politics,* Praeger, London, 1962

Franda Marcus, *Bangladesh : The First Decade*, New Delhi, 1982

Ghosh Shyamoli, *The Awami League 1947-1971*, Academic Publishers, Dhaka, 1990

Hasanuzzaman Al Masud, Role of Opposition in Bangladesh Politics, The University Press Limited, Dhaka, 2008

Hakim Mohammad A, *Bangladesh Polities-The Shahabuddin Interregaum*, University Press Limited, Dhaka, 1993

Huntington Samuel P., *Political Order in Changing Society*, London, 1968

Jahan Rounuq Bangladesh Politics: Problems and Issues, University Press Limited, Dacca, 1980

Khaliquzzaman Choudhury, *Pathway to Pakistan*, Longmans, London, 1961

Khan Shamsul I; Islam S. Aminul; Haque M. Imdadul, *Political Culture, Political Parties and the Democrati Transition in Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka, 2008

Khan Zillur R., *Martial Law to Martial Law : Leadership Crisis in Bangladesh*, The University Press Limited., Dhaka, 1984

Mannan Mohammad Seraj, *The Muslim Political Parties in Bengal 1936-1947*, Islamic Foundation Bangladesh, Dhaka, 1987

Moniruzzaman Talukder, *Radical Politics And The Emergence of Bangladesh*, Mowla Brothers, Dhaka, 2003

———— Politics and Security in Bangladesh, The University Press Limited, Dhaka, 1994

———— *Military Withdrawal From Politics : A Comparative Study*, Ballinger Pub. Com., Cambridge, Massachusetts, 1987

Malik Hafeez, *Moslem Nationalism in India and Pakistan*, Public Affairs Press. Washington. D.C., 1963

Mascarenhas Anthony, *Bangladesh : A legacy of Blood*, Hodder and Stoughton, London, 1986

Lifsehultz Lawrence, *Bangladesh : The Unfinished Revolution*, Zed Press, London, 1979

Dhaka University Institutional Repository

Riaz Ali, *Bangladesh A Political History since Independence,* I.B. Tauris & Co. Ltd., London, 2016

Riaz Ali (ed.), *Religion and Politics in South Asia*, Routledge, New York, 2010

Riaz Ali (ed.), *Routledge Handbook of Contemporary Bangladesh*, Routledge, New York, 2016

Sen Rangalal, *Political Elites in Bangladesh*, The University Press Limited, Dhaka, 1986

অপ্রকাশিত এম ফিল / পিএইচ ডি অভিসন্দর্ভ

বেগম শিউলী, *বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান : একটি পর্যালোচনা*, অপ্রকাশিত এম.ফিল. অভিসন্দর্ভ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯

রহমান শাহেদ ইকবাল মো. মাহবুব-উর, *বাংলাদেশের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি : সমস্যা ও সম্ভাবনা*, অপ্রকাশিত এম.ফিল অভিসর্ন্দভ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ২০০০

Shantonu Majumder *"Secularism and the Awami League, A Study of the Main Liberal Political Party in Bangladesh*, Inistitute of Commonwealth Studies, University of London, 2012

প্রবন্ধ/নিবন্ধ

আলী এ কে এম ইদ্রিস, "মুসলিম সমাজের উপর বঙ্গভঙ্গ রদের প্রভাব", ওয়াকিল আহমদ ও হাবিবা খাতুন (সম্পাদিত), *ইতিহাস*, (বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা), উনচল্লিশ বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র, ১৪১২, (বঙ্গভঙ্গ শতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা ২০০৬), বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ২০০৬

হক মুহাম্মদ ইনাম-উল, "বঙ্গভঙ্গ ১৯০৫: প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি", ওয়াকিল আহমদ ও হাবিবা খাতুন (সম্পাদিত), *ইতিহাস*, (বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা), উনচল্লিশ বর্ষ, প্রথম-তৃতীয় সংখ্যা, বৈশাখ-চৈত্র, ১৪১২, (বঙ্গভঙ্গ শতবর্ষ বিশেষ সংখ্যা ২০০৬), বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষদ, ঢাকা, ২০০৬

রহিম মো. আবদুর, "বাংলাদেশে নির্বাচনী সহিংসতা : একটি পর্যবেক্ষণমূলক বিশ্লেষণ", *সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকা*, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ডিসেম্বর, ঢাকা, ২০০৫

রহমান মো. আতিকুর, *বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ : কিছু প্রাসঙ্গিক কথা*, র‍্যাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী জার্নাল ২০০৮, ঢাকা, ২০০৮

Harun-or-Rashid, "Desecularisation and Rise of Political Islam in Bangladesh", *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh,* (Hum), Vol. 57(1), Dhaka, 2012

পত্র-পত্রিকা

সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঢাকা, ১৭ জানুয়ারি ১৯৮৬

দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ০৫ জানুয়ারি ১৯৮৮

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৪ জুন ১৯৯৬

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ জুন ১৯৯৬

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৬ জুন ১৯৯৬

দৈনিক সংবাদ, ১৬ জুন ১৯৯৬

দৈনিক ভোরের কাগজ, ১৩ জুন ১৯৯৬

দৈনিক সংবাদ, ২৩ জুন ১৯৯৬

দৈনিক সংবাদ, ১৫ জুলাই ১৯৯৬

দৈনিক সংবাদ, ২৩ অক্টোবর ২০০১

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ জানুয়ারি ২০০২

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০২

দৈনিক ইত্তেফাক, ১১মে ২০০২

দৈনিক ইত্তেফাক, ২ জুন ২০০২

দৈনিক জনকণ্ঠ, ১৩ জুন ২০০২

দৈনিক প্রথম আলো, ১৪ মার্চ ২০০৩

দৈনিক প্রথম আলো, ২৫ মার্চ ২০০২

সাপ্তাহিক মৃদুভাষণ, ১৭ জানুয়ারি ২০০৩

দৈনিক যুগান্তর, ২৪মে ২০০৩

দৈনিক যুগান্তর, ১ জুলাই ২০০৩

দৈনিক যুগান্তর, ১০ জুলাই ২০০৪

দৈনিক সংবাদ, ৫ মার্চ ২০০৫

দৈনিক যুগান্তর, ৮ মার্চ ২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

দৈনিক যুগান্তর, ১০ এপ্রিল ২০০৫

দৈনিক যুগান্তর, ১৮ আগস্ট ২০০৫

দৈনিক যুগান্তর, ২৩ আগস্ট, ২০০৫

দৈনিক যুগান্তর, ২৫ আগস্ট ২০০৫

দৈনিক প্রথম আলো, ৫ ডিসেম্বর ২০০৫

দৈনিক প্রথম আলো, ২ ডিসেম্বর ২০০৫

দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ মার্চ ২০০৬

দৈনিক যুগান্তর, ২৩ মার্চ ২০০৬

দৈনিক প্রথম আলো, ৪ মার্চ ২০০৭

দৈনিক সংবাদ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১১

দৈনিক আমাদের সময়, ৫ মার্চ ২০১৭

দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক সমকাল, দৈনিক সংবাদ পত্রিকার ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০১ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০০১ পর্যন্ত বিভিন্ন সংখ্যা

The Daily Bangladesh Observer, 8 september 2001

The Daily Star, 21 August 2005

The Daily Star, 3 March 2006

The Daily Telegraph, 26 December 2008

অন্যান্য

জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণী, ১০ মার্চ ১৯৮৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, (১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর তারিখে বাংলাদেশ গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত এবং ১৯৭২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে স্পীকার কর্তৃক প্রমাণীকৃত), ঢাকা, ১৯৭২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ১৯৯৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সংশোধিত), ঢাকা, ১৯৯৮